Dhaka University Institutional Repository

সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

গবেষক

মো: সাইফুল আলম

পিএইচ.ডি. গবেষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি: নং- ৬২ (পুন:)

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭

রেজি: নং- ২০৬

শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩

পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০২১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত **"সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয় নি।

মোঃ সাইফুল আলম

পিএইচ.ডি. গবেষক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ সাইফুল আলম, পিএইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পিএইচ.ডি. লাভের জন্য উপস্থাপিত **"সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। আমি এর পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয় নি। সুতরাং গবেষককে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদানের জন্য অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের কাছে প্রেরণের জন্য জমা নেওয়ার সুপারিশ করছি।

ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা-এর অশেষ মেহেরবানীতে **"সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। বিধি মুতাবেক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং মানবতার মহান শিক্ষক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে দরূদ ও সালাম পেশ করছি। যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি। নানামুখী ব্যস্ততা ও একাডেমিক সংশ্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। মানসম্পন্ন অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং শব্দ অলঙ্করণে তাঁর নিরলস আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও চিরঋণী। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। এছাড়া এই বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. আবূ জামাল মোঃ কুতুবুল ইসলাম নোমানী, অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ-এর প্রতি। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমার গবেষণাকর্মে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা করেছেন। গভীর শ্রদ্ধাভরে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মোঃ আতিয়ার রহমান সরদার (র.)-এর প্রতি, যাঁর কঠোর শাসন, পিতৃসম ভালোবাসা ও দু'আ সর্বদা আমাকে ঘিরে রাখতো এবং যাঁর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ছিল মূল্যবোধভিত্তিক জীবন গঠনে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে আমার জীবনের গতিপথ ও সীমানা নির্ধারণ করার জন্য। যিনি সত্য-মিথ্যার প্রভেদ তুলে ধরে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য ছিলেন একজন শিক্ষক, বন্ধু ও নেতার মতো অবিচল। যিনি সংসার নির্বাহ করার জন্য তাঁর সমগ্র জীবন নিরন্তন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। যাঁর শূন্যতা আমাকে আমার চলার পথের প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভূত করে এবং আমার পিপাসার্ত হৃদয়কে মরুভূমির শূন্যতায় বার বার আছড়ে ফেলে যেন মরুভূমির তপ্ত রৌদ্দে ছায়াহীন ও ঢালহীন এক আমি। দু'আ করি, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমি আবারো গভীর শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতা ছফুরুননেছা-এর প্রতি, যিনি এক স্বামীপরায়ণা গ্রামীণ নারী। যিনি সমগ্র জীবন আমার পিতার আদেশ ও অর্পিত দায়িত্ব বিনাবাক্যে প্রতিপালন করেছেন এবং সেই সাথে আমাদের এক ভাই ও পাঁচ বোনকে পরম মমতায় বড় করে তোলার প্রচেষ্টায় নিরন্তর মেহনত করেছেন। যাঁর মমত্বের গভীরতা এখনো বার্ধক্যকে হার মানায় এবং যিনি পিতার অবর্তমানে আমার অভিভাবক হয়ে আছেন। দু'আ করি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হায়াতে তাইয়্যিবা দান করুন। আমার জীবনে চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদের উভয়ের দিক-

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশনা ও দু'আ সর্বদা আমার চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিটি সাফল্য-ব্যর্থতায় শক্তি ও সাহস যোগায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে তাঁদের অফুরন্ত ত্যাগ, শাসন, ভালোবাসা ও নির্দেশনা আমাকে আজকের অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। আমি তাদের কাছে আবারও কৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. শামসুল আলম, চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রফিকুর রহমান আল মাদানী, চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-এর প্রতি। যাঁরা আমাকে পিতৃসুলভ নির্দেশনা ও গবেষণার সার্বিক ক্ষেত্র বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. মুহা. শের আলী, যুগ্ম সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং ড. আনোয়ার হোসাইন মোল্লা, অধ্যক্ষ, উত্তর বাড্ডা ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা-এর প্রতি, যাঁরা আমাকে সবসময় সাহস ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. মোঃ ফিরদাউস হোসাইন এর প্রতি যিনি গবেষণার বিষয় নির্ধারণে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জনাব মুহাম্মাদ জাফরুল্লাহ এর প্রতি যিনি আমাকে হাদীসের সঠিক টেক্সট ও রেফারেন্স করতে অসামান্য সহযোগিতা করছেন এবং এক্ষেত্রে আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. রাফিয়া সুলতানা, ড. জনয়নব এম সিদ্দিকুর রহমান এর প্রতি। এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রফেসর এম মানছুরুর রহমান, ড. মুহা. মাহবুবুল আলম, জনাব মুহা. আবূ সাঈদ খান, জনাব সাদিক মুহাম্মাদ ইয়াকুব-এর প্রতি, যারা আমাকে বিভিন্ন সময় উৎসাহ দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ থাকতে চাই আমার জীবনসঙ্গিনী মুর্শিদা নার্গিস-এর প্রতি, যার ঐকান্তিক সহযোগিতায় আমি গবেষণাকর্মটিকে সম্পন্ন করতে পেরেছি। আর আমার প্রাণপ্রিয় দুটি সন্তান আব্দুল্লাহ সাইফ জামি' ও ওয়াসিয়া সাইফ ওয়াফা'র প্রতি আমার হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম আদর ও ভালোবাসা প্রদান করছি। যারা আমার গবেষণা কর্মের কাজে কোনোরূপ বাধা সৃষ্টি করেনি বরং গবেষণার কাজ করার ক্ষেত্রে সর্বদা তাদের অধিকার ত্যাগ করেছে অবলীলায়। এছাড়াও আমার আদরের পাঁচ বোনসহ সকল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আমার কল্যাণে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে নিরন্তন দু'আ করে চলেছে। আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখিত দেশি-বিদেশি লেখকের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে সেসব লেখকের নাম ও তাদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবু এখানে আরও একবার তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাছাড়াও লেখার পরিধি বেড়ে যাওয়ায় যাদের নাম এখানে উল্লেখ নেই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে না পারার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং ঐ সকল শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আমার হৃদয়োচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মোঃ সাইফুল আলম
পিএইচ. ডি. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

(আ.) = ‘আলাহিস সালাম

(রা.) = রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু

(র.) = রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি

ইং = ইংরেজি

বাং = বাংলা

হি. = হিজরী

খ্রি. = খ্রিস্টাব্দ

বি. দ্র. = বিশেষ দ্রষ্টব্য

ড. = ডক্টর

তা.বি. = তারিখ বিহীন

পৃ. = পৃষ্ঠা

অনু: = অনুবাদ

ইফাবা = ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তা.পা. = তাওহীদ পাবলিকেশন্স

বা.ই.সে. = বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

জ. = জন্ম

মৃ. = মৃত্যু

P. = Page

Op. cit = Operac-citrae

Ed = Edition/Editor/Edited

JASB = Journal of Asiatic Society of Bangladesh

ibid = (ibidem) in the same place; from the same source

N.d. = Not date

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র-

ভূমিকা	:	০৮-১০ পৃ.
প্রথম অধ্যায়	: বাংলাদেশ পরিচিতি এবং সুবিধাবঞ্চিতদের পরিচয়	১১-৪৩ পৃ.
দ্বিতীয় অধ্যায়	: ইসলামের পরিচয়	৪৪-৬৮ পৃ.
তৃতীয় অধ্যায়	: কুর'আন ও হাদীসের আলোকে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার	৬৯-১৪৯ পৃ.
চতুর্থ অধ্যায়	: বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম	১৫০-২২৭ পৃ.
পঞ্চম অধ্যায়	: পর্যালোচনা ও সুবিধাবঞ্চিতদের পুনর্বাসনে প্রস্তাবনা	২২৮-২৮২ পৃ.
উপসংহার	:	২৮৩-২৮৫ পৃ.
গ্রন্থপঞ্জি	:	২৮৬-৩০০ পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা মানবজাতির সকল সময়ের সকল সভ্যতায় এবং সকল জনপদে কখনো বেশি বা কম মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশও এই ধারাবাহিকতার বাইরে ছিল না। ইতিহাসে দেখা যায়, পাল শাসনামল থেকে মূলত এদেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা কমতে শুরু করে। কিন্তু সেন আমলে তা আবার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তৎপরবর্তী মুসলিম শাসনকালে এসে এদের অধিকার সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনামলে এদেশে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর এ অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু মুসলমানদের শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই এদেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা আবার দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশপূর্ব মুসলিম শাসনামল থেকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাকাত, ওয়াক্ফ, দান ও অনুদানসহ বিভিন্ন আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা হতো। এছাড়াও ব্রিটিশ আমল থেকে কিছু খ্রিস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান ও মুসলিম ওয়াক্ফ ট্রাস্ট বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানবকল্যাণে কাজ করতো। যার ধারাবাহিকতায় এখনো এদেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অনেক দেশি-বিদেশি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। পরবর্তীতে ব্রিটিশরাজ থেকে স্বাধীন হয়ে পাকিস্তানের গোড়াপত্তন হয়। পাকিস্তান শাসনামলেও রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব-পাকিস্তানের যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উত্থান হয়। যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসের ফলে যুদ্ধবিধস্ত দেশ হিসেবে স্বাধীনতা-উত্তর এদেশে পাঁচ ভাগের চার ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করায় ১৯৭৪ সালে দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। এরপর থেকে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগে দারিদ্র্য থেকে মানুষদেরকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও দারিদ্র্যবেষ্টিত জনগোষ্ঠী নিজেরাই দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বের হওয়ার ব্রত নিয়ে নিরলসভাবে কাজ শুরু করে। এ সমস্ত কার্যক্রমের ফলে আস্তে আস্তে দেশের দারিদ্র্য কিছুটা হলেও কমতে থাকে। আর এই কাজকে ত্বরান্বিত করতে দেশি-বিদেশি সংস্থাসমূহ অব্যাহতভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এরপরও বিভিন্ন দুর্যোগে সে ধারা কখনো কখনো ব্যাহত হচ্ছে। তথাপি সামগ্রিক দারিদ্র্য খুবই ধীরগতিতে কমে চলেছে।

বর্তমান দশকে (২০১১-২০২০) ধারাবাহিকভাবে দেশের সুবিধাবঞ্চিত জন্যগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার বার্ষিক হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

অল্প কিছু প্রতিষ্ঠান যাকাতভিত্তিক সনাতন ও নিজস্ব পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল চতুর্মুখী সেবা ও এদেশের মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা কিছুটা কমলেও বর্তমানে সরকারি হিসাব অনুযায়ী তাদের পরিমাণ প্রায় দুই কোটিরও বেশি। বেসরকারি হিসাবে নিশ্চয়ই সংখ্যাটি আরও বড় হবে। সুবিধাবঞ্চিত এ সকল জনগোষ্ঠী এই দেশ, সমাজ ও সভ্যতার অংশ। তাদের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়ন ব্যতীত কোনোভাবেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, কেন এই বিশাল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না। কেন বস্তিতে এই মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। কেন দ্বীপ অঞ্চল, চরাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাদের জীবনমানের কেন কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। কেন এ সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী অভাবের গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে এবং অপুষ্টিতে, রোগে শোকে, অবহেলা ও অনাদরে পতিত হচ্ছে। কেন পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী এই সভ্যতায় দেশের সামগ্রিক আর্থিক খাতের প্রবৃদ্ধি হলেও এ সকল মানুষের জীবনমানে তেমন কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না? কেন এখনো অভাবের তাড়নায় পিতামাতা তাদের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করছে? কেন তাদের কোনো অধিকার নেই, নিরাপত্তা নেই? কেন কেবল দুঃখ-কষ্টই তাদের প্রতিদিনের সঙ্গী, যা মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশে একেবারে অগ্রহণযোগ্য? অথচ সরকারি, বেসরকারি ও বিদেশি সংস্থাসহ সকলের এত কর্মতৎপরতা, কর্মপরিকল্পনা, প্রয়োগ ও ব্যয় সত্ত্বেও এ বিশাল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মানবিক মৌলিক চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে তেমন কোনো যুগান্তকারী ও কল্যাণময় পরিবর্তন আনতে পারছে না। বিভিন্নমুখী এত কার্যক্রম পরিচালনা সত্ত্বেও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হতে হচ্ছে। ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বলা যায়, **প্রথমত:** মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ও বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার আলোকে গৃহীত কোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। **দ্বিতীয়ত:** ব্যক্তিভেদে প্রয়োজন, চাহিদা ও সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এসব সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণগুলো উদঘাটন করার জন্য যথার্থ গবেষণা হয়নি এবং সে আলোকে ব্যক্তিভেদে কর্মসূচিও নির্ধারণ করা হয়নি। যে কারণে সাধারণত যে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয় তা খুব বেশি ফলপ্রসূ হয় না। অন্যদিকে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে শুধু আর্থিক সহায়তা হলেই হয় না বরং আর্থিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই মর্যাদাপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। এজন্য সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কারণ একমাত্র তিনিই সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য তাদের অধিকারসমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাই ইসলামী জীবনদর্শনের মৌলিক শিক্ষা অনুযায়ী সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকারসমূহ সুবিধাবঞ্চিতদের

Dhaka University Institutional Repository

মাঝে নির্মোহভাবে ইসলামী ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে প্রদান করলেই কেবল তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এজন্য অত্র অভিসন্দর্ভে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত কার্যক্রমের সাথে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ও সমাজব্যবস্থায় সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য রক্ষিত সুযোগ-সুবিধা, অধিকার, সামাজিক সম্মান ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক এর উপর বিশ্লেষণধর্মী তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ইসলামের আলোকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি বাস্তবধর্মী ও কল্যাণমুখী রূপরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে।

পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অত্র অভিসন্দর্ভটি প্রণনয়ন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে শিরোনাম 'বাংলাদেশ পরিচিতি এবং সুবিধাবঞ্চিতদের পরিচয়' এবং এ শিরোনামের অধীনে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, জনসংখ্যা, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, ভূপ্রকৃতি, বন, প্রাণি, প্রশাসন, আইন ও বিচার, শিক্ষা ও কৃষি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আরো সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সুবিধাবঞ্চিতদের পরিচয়, দারিদ্র্য ও বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিতদের পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'ইসলামের পরিচয়' এবং এ শিরোনামের অধীনে ইসলামের অর্থ, সংজ্ঞা, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, ইসলামের মৌলিক উৎসসমূহ এবং ইসলামের ভিত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'কুর'আন ও হাদীসের আলোকে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার' এবং এর অধীনে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে মানবজাতির সৃষ্টির ইতিহাস ও তাদের পর্যায়ক্রমিক সভ্যতার বিকাশ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অধিকার, যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা, যাকাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও এই অধ্যায়ে সুবিধাবঞ্চিতদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তাদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা, সুবিধাবঞ্চিত এতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করা ও তাদের ন্যায়বিচারের অধিকার নিশ্চিত করা, সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবেশী ও আত্মীয়ের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের জ্ঞানার্জনের অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম' এবং এর অধীনে বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকারে কাজ করে যাওয়া বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচয় ও কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'পর্যালোচনা ও সুবিধাবঞ্চিতদের পুনর্বাসনে প্রস্তাবনা' এবং এ শিরোনামের অধীনে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতার নিরিখে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাত ব্যাংকের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে, যেখানে যাকাত ব্যাংকের পরিচয়, কর্মসূচি, অর্গানোগ্রাম, কার্যক্রম এবং সামগ্রিক অবস্থার বিবেচনায় ব্যক্তি ও সমষ্টিভেদে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশ পরিচিতি এবং সুবিধাবঞ্চিতদের পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশ পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের পরিচয়

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিতদের অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশ পরিচিতি

দক্ষিণ এশিয়ার একটি অন্যতম দেশ বাংলাদেশ। এর রাষ্ট্রীয় নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'।[১] জনবহুল এই দেশটি বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টিতে এক অনন্য নজির স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। এখানে সব ধর্মের লোক সামাজিক সম্প্রীতিতে মিলেমিশে বাস করে। বাংলাদেশ নদীবিধৌত দেশ এবং পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এখানে পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে এবং কুয়াকাটা ও সুন্দরবনের কটকায় আরো দু'টি সমুদ্র সৈকত রয়েছে। এছাড়া মোংলা ও চট্টগ্রামে দু'টি বৃহৎ সমুদ্রবন্দর রয়েছে। ঢাকা, চাঁদপুর, খুলনা, বরিশাল, বাঘাবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, ভৈরব ও আশুগঞ্জে রয়েছে বৃহৎ নদীবন্দর। আরও আছে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট) এবং আটটি আভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কক্সবাজার, যশোর, সৈয়দপুর, বরিশাল ও রাজশাহী)। বাংলাদেশের মানুষ কষ্ট সহিষ্ণু, পরিশ্রমী এবং অতিথিপরায়ণ। এদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক অফুরন্ত লীলাভূমি। রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ। নিম্নে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিচয় সংক্ষপে আলোচনা করা হলো-

- **ভৌগোলিক অবস্থান**

বাংলাদেশের আয়তন ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৫৫৯৮ বর্গমাইল। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম প্রদেশ, পূর্বে ভারতের আসাম প্রদেশ, ত্রিপুরা রাজ্য ও মিয়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[২] বাংলাদেশ ২০°- ৩৪ থেকে ২৬°- ৩৮ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮°- ০১ থেকে ৯২°- ৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।[৩] বাংলাদেশের উত্তরে জলপাইগুড়ি ও আসাম, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশ দক্ষিণ দিকের বঙ্গোপসাগর ছাড়া তিন দিকে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। এদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতশৃঙ্গ, আসাম, উত্তর-পূর্ব কোণঘেঁষে রয়েছে মিয়ানমারের কিয়দাংশ। ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থানে বাংলাদেশের সীমারেখা স্থল ভাগ ও সমুদ্র উপকূলসহ মোট ৩১৬১ মাইল। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমান্তের অধিকাংশই নদী বা পর্বত দ্বারা বেষ্টিত হলেও কোনো প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত নয়।[৪] অন্যদিকে বাংলাদেশকে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত করেছে বঙ্গোপসাগর। যেখানে মৎস্য

---

১ আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, ঢাকা-২০১১, পৃ. ২

২ সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, অধ্যাপিকা বেগম ফিরোজা ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০১৪, পৃ. ১৯

৩ অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৭, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৮, পৃ. xvii

৪ মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল*, ঢাকা-১৯৯৪, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ ও সামুদ্রিক সম্পদে পরিপূর্ণ। আন্তর্জাতিক আইনানুসারে বাংলাদেশের মালিকানায় সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।[৫]

- **প্রাকৃতিক ভূগোল**

ভূপ্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। তা যথাক্রমে পার্বত্য অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল এবং নিম্ন গাঙ্গেও অববাহিকা অঞ্চল। ময়মনসিংহ জেলার গারো পাহাড়, সিলেটের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়, চট্টগ্রামের হুমাই, পার্বত্য চট্টগ্রামের পুরো পাহাড়িয়া অঞ্চলসহ অন্যান্য পাহাড়িয়া এলাকা এ পার্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত। সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা এদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চল। দেশের দক্ষিণ সীমান্তে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত বিধায় তীরবর্তী সকল জেলাই হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চল। ছোট বড় অনেকগুলো দ্বীপ এ অঞ্চলে অবস্থিত। ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, বোয়ালখালী, মহেশখালী, নিঝুম দ্বীপ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে কিছু নিম্নভূমি ও সমভূমি এবং পৃথিবী বিখ্যাত সুন্দরবন ও এ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। দেশের উত্তর পশ্চিমের জেলাগুলোর অধিকাংশ স্থান সমভূমি। হিমালয় অনীত পলল দ্বারাই এ অঞ্চল গঠিত। তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া প্রভৃতি নদীবাহিত পলি জমা হয়ে এ ঢালু ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এ অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্রায় ছোট বড় ৩১০টি নদী রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হলো– পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, করতোয়া, কর্ণফুলী, সন্ধ্যা, আত্রাই, গড়াই, মধুমতি, রূপসা, তিতাসসহ প্রভৃতি।[৬]

- **জনসংখ্যা, সমাজ ও সংস্কৃতি**

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। ২০১৬ সালের জনজরিপ অনুযায়ী পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ এদেশে প্রায় ১৬,০৮,০০,০০০ (১৬ কোটি ৮ লাখ) জনসংখ্যা রয়েছে।[৭] রিপোর্ট অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার মধ্যে নারী ও পুরুষের হার যথাক্রমে ৮০.৪৩ ও ৭৯.১৬

---

[৫] Bangladesh Bureau of Statistics, *Statistical Pocketbook of Bangladesh 2017*, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka,, Dhaka-2018, P. 7

[৬] ibid, P. 9

[৭] ibid, P. 3

Dhaka University Institutional Repository

শতাংশ।[৮] এদেশে ভাষাভিত্তিক জাতিগত জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার, বাঙালি ৯৮ শতাংশ এবং পাহাড়ি ও অন্যান্য জনগোষ্ঠী ২ শতাংশ। এ সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে বিহারী, চাকমা, মারমা, সাওতাল, গারো, ম্রো, ত্রিপুরা, মণিপুরী, খুমি ইত্যাদি। এছাড়াও হিজড়া সম্প্রদায় এদেশের প্রান্তিক একটি সম্প্রদায়। তার খুবই ক্ষুদ্র ও দরিদ্র একটি জনগোষ্ঠী। আর এদেশে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীও একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী, যারা এদেশে আবহমানকাল থেকে বসবাস করে আসছে। এদের মধ্যে বেদে জনগোষ্ঠী একটি যাযাবর জনগোষ্ঠী, যারা কতকগুলো পরিবার একসাথে একটি দল হয়ে বসবাস করে। তারা একজন সরদারের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে যাযাবর জীবনযাপন করে। ধর্মভিত্তিক জাতিগত জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি। এদের আনুপাতিক হার, প্রায় ৮৮.৮ শতাংশ মুসলিম।[৯] অবশিষ্ট ৯.২ শতাংশ হিন্দু, ০.৬% বৌদ্ধ এবং ০.৪ শতাংশ খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মমালম্বী।

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা মূলত পরিবারকেন্দ্রিক। আবহমানকাল থেকে এদেশের পরিবারগুলো ছিল একান্নবর্তী, কিন্তু বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার বিকাশে এবং বিভিন্ন আগ্রাসনে সেই পরিবার প্রথা ভেঙে পড়ছে। আর এর প্রভাব পড়ছে মানুষের মনোজগত, সমাজ ও সংস্কৃতি উপর। যার কুপ্রভাব দিন দিন অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত হচ্ছে। এখান থেকে উত্তরণের জন্য এদেশে আবহমানকাল থেকে মানবিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত পরিবারভিত্তিক যে সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, তা মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতির শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। আড়াই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এদেশের সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে।[১০] এখানে অতিবাহিত হয়েছে অনেক প্রসিদ্ধ রাজা, বাদশা, সম্রাজ্য ও রাজ্যব্যবস্থা। তার ধারাবাহিকতায় এদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিভিন্ন সংস্কৃতি (শিল্পকলা, সাহিত্য, স্থাপত্যকলাসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিটি ধারা) অনেক বেশি সমুজ্জল হয়ে আছে।[১১] হাজার বছরের রাজনৈতিক প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ,

---

[৮] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Final Report on Household Income and Expenditure Survey 2016,* Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka-2019, P. xxi

[৯] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Statistical Pocketbook of Bangladesh 2013*, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka-2014, P. 03

[১০] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Statistical Year Book Bangladesh 2018*, (38th Edition), Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka-2019, P. XXV

[১১] Bangladesh Bureau of Statistics, *Statistical Pocketbook of Bangladesh 2017*, ibid, P. 4

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী এবং সবশেষ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এ দেশের সমাজব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে প্রভাবিত করেছে।[১২]

- **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট**

আজকের এই বাংলাদেশ হাজার বছরের পথপরিক্রমায় বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে অনেক ত্যাগ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলে এসেছে।[১৩] মনে করা হয়, খ্রিস্টের জন্মের দু'হাজার বছর আগে আর্যরা ইরান অথবা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে আসতে শুরু করে। পরবর্তীতে নিজেদের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তায় অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে পদানত করে তারা ভারতে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায়, আর্যদের আগমনের বহু পূর্বেই একটি অতি প্রাচীন বাঙালি নগরসভ্যতা বিদ্যমান ছিল। ঐতিহাসিকভাবে মনে করা হয়, এই অঞ্চলে মানবসভ্যতার গোড়াপত্তন হয় হযরত নূহ (আ.)-এর চতুর্থ বংশধর 'বং'-এর সম্প্রদায়ের মাধ্যমে।[১৪] অন্য এক তথ্যে 'বং' ছিলেন হযরত নূহ (আ.)-এর সপ্তম স্তরের পুরুষ।[১৫] যার নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম পরবর্তীতে বাংলা হয়।[১৬] তখন প্রচীন বাংলার মানুষ তামা, লোহাসহ বিভিন্ন ধাতু ব্যবহার করত। এই নগরসভ্যতা ছিল সুপরিকল্পিত এবং প্রকৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত। এছাড়াও পশ্চিম বাংলায় দশ হাজার বছর আগেকার প্রাপ্ত যুদ্ধাস্ত্রসমূহ প্রমাণ করে যে, প্রাচীন বাঙালি একটি বীরের জাতি ছিল। যদিও তারা কখনো ভিনদেশে আগ্রাসন চালায় নি। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ হাজার বছর থেকে ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত এদেশ বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের দ্বারা শাসিত হতো।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলায় শশাঙ্ক নামে এক রাজা ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তখনকার রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মতি নিয়ে গোপাল নামক এক রাজা এই বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পাল বংশের এবং তাঁর দ্বারাই বাংলায় পাল শাসনের গোড়াপত্তন। এ সময় বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট উন্নত ও সমৃদ্ধপূর্ণ ছিল। ফলে তখনকার সময়ে বাংলা ছিল মোটামুটি অভাবমুক্ত এবং এখানকার প্রজারা অনেক শান্তিতে বসবাস করতো। বাংলায় পাল রাজাদের রাজত্ব দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এরপর পাল রাজাদের হটিয়ে সেন

---

[১২] সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ৩য় খণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ১

[১৩] আসাদ বিন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা-২০০১, পৃ. ১৩

[১৪] আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০০২, পৃ. ২৫

[১৫] আসাদ বিন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[১৬] আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

বংশ বাংলার রাজত্ব দখল করে।[১৭] আর সেন রাজাদের আমলে এদেশের প্রজারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নির্যাতিত হয়। সেন রাজারা এদেশে রাজত্ব করেছিল ১০৬ বছর।[১৮]

সুপ্রাচীন যুগে বাংলাদেশ নামক কোনো ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল না। এই দেশটি তখন বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, যার সমষ্টিই হলো বাংলা বা বঙ্গ। ধারণা করা হয়, এর ব্যাপ্তি ছিল ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত। এই জনপদগুলোর মধ্যে বঙ্গ, পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ, সমতট, হারিকেল, বঙ্গাল ও বরেন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করে রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন।[১৯] বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা আক্রমণ করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার মধ্য দিয়ে এদেশে রাজনৈতিকভাবে ইসলামের সূচনা হয়।[২০] পরবর্তী সময়ে এদেশে শত শত বছরব্যাপী মুসলিম শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সে সময় এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকার মতো ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র।[২১] তখনকার সময়ে রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থব্যবস্থায় ইসলামের মৌলিক উপাদন বিদ্যমান থাকায় বাংলা বিশ্বের দরবারে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। এর ধারাবাহিকতায় বাংলা বিভিন্ন সময় দিল্লির সুলতানদের অধীনে শাসিত হয়েছে। আবার কিছু স্বাধীন শাসকও বাংলাকে মুঘলদের থেকে মুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। উক্ত সময়ের পথপক্রিমায় বহু শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেছেন।[২২] সেই সময় বাংলা অঞ্চলে পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্যক্ষমতা পরিচালনা করেন বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম ঈসা খাঁ। তিনি দিল্লির সম্রাটদের বশ্যতা স্বীকার করেন নি বরং তিনি মুঘলদের বিরোধিতা করেছেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধও করেছেন। এজন্য তিনি বারো ভূঁইয়াদের অন্যতম নেতা হতে পেরেছিলেন।[২৩] এখানে উল্লেখ্য, এদেশে অনেক পূর্ব থেকেই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দা'ঈদের আগমন ঘটে, তাঁরা এখানে ইসলামের দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেন। মুসলিম শাসন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় পরবর্তীতে এখানে ধর্ম প্রচারকদের আরো বেশি ধর্ম প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং মানুষ দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[২৪]

---

[১৭] অধ্যাপক কে. আলী, *বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*, আলী পাবলিকেশন্স, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ৪-৫

[১৮] আবুল আসাদ, *একশ' বছরের রাজনীতি*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ৭ম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা-২০১৯, পৃ. ৯

[১৯] অধ্যাপক কে. আলী, *বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

[২০] আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

[২১] আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৮৫

[২২] অধ্যাপক কে. আলী, *বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

[২৩] শামসুদ্দোহা চৌধুরী, *ঈসা খা'র সোনারগাঁও*, সুবর্ণ গ্রাম প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ২৪

[২৪] অধ্যাপক কে. আলী, *বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর (১২০৬-১৫২৬) শাসনের পর সুলতানি শাসনের অবসান হয়। ১৫২৬ সালে সুলতান ইব্রাহীম লোদী পানিপথে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের কাছে পরাজয় বরণ করেন। এই জয়ের মধ্য দিয়ে বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সম্রাট মুঘল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর মধ্যে সম্রাট আকবর তাঁর ক্ষমতা আরোহণের সময়কে স্মরণীয় করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের ৯৬৩ বছর পরে হিজরী সনের হিসাবের সঙ্গে মিল রেখে ইংরেজি ১৫৫৬ সাল থেকে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন।[২৫] এভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে খুবই রাজকীয়ভাবে। মুঘল আমলে বাংলা ছিল সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ। এজন্য দ্বিতীয় মুঘল সম্রাট হুমায়ন বাংলাকে 'জান্নাতাবাদ' বা স্বর্গরাজ্য বলে অভিহিত করেন। আর সম্রাট আওরঙ্গজেবও বাংলাকে জাতির স্বর্গ বলে উল্লেখ করতেন। সেই সময় সরকারি নথিপত্রে বাংলাকে 'ভারতের স্বর্গ' বলে সর্বদা চিত্রায়িত করা হতো।[২৬] উল্লেখিত সময়ে বাংলা রাজ্যের আয়ের উৎস ছিল প্রধানত জমির খাজনা।[২৭] এজন্য সম্রাট আওরঙ্গজেব বিশ্বস্ত হিসেবে ১৭০০ খ্রি. শেষ দিকে মুর্শিদ কুলী খাঁকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ঢাকা তখন বাংলার রাজধানী। এরপর ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ১৭১৭ খ্রি. তাকে বাংলার সুবেদার নিয়োগ বাংলার জন্য এক নতুন যুগের সূচনা করে। তিনি আমৃত্যু (১৭২৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত) উক্ত পদে আসীন ছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতা, কর্মকুশলতা ও দক্ষতা তাঁকে বাংলার অন্য সুবেদারদের থেকে আলাদা করেছে। মূলত তাঁর সময় থেকেই বাংলায় দিল্লির হস্তক্ষেপ ও প্রাধান্য বন্ধ হয়ে যায়।[২৮] তাঁর নেতৃত্বে বাংলা সম্পদশালী হয়ে ঈর্ষাণীয় সমৃদ্ধি অর্জন করে। পরবর্তী নবাবদের সময়েও তা অব্যাহত থাকে এবং তা পলাশি যুদ্ধ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[২৯]

এরপর ধারাবাহিক ঘটনা প্রবাহের ধারায় আলীবর্দী খাঁ বাংলার তৎকালীন নবাব সরফরাজ খাঁকে ১৭৪০ সালের ১০ এপ্রিল গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন।[৩০] এভাবে ক্ষমতা রক্ষা ও পালাবদলের ধারায় আলিবর্দী খাঁ ১৭৫৬ সালের মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর নিজের কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজুদদৌলাকে বাংলার নবাব নিযুক্ত করেন। নবাব সিরাজুদদৌলা ১৭৫৬ সালের ১০

---

[২৫] মুহাম্মাদ আবূ তালিব, *বাংলা সনের জন্মকথা*, বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৬

[২৬] সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, দ্বিতীয় খণ্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ২৯

[২৭] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক্-পলাশী বাংলা*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা-১৯৮২, পৃ. ৬৮

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯

[২৯] সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, গ্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৩০] সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক্-পলাশী বাংলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

এপ্রিল সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩১] ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে তিনি চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হন। ফলে ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার সকল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন এবং যুদ্ধ পরবর্তীতে তিনি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে তাঁকে বন্দী করে হত্যা করা হয়। নবাবের এই পরাজয়ে যদিও মীর জাফর আলী খাঁ নবাব হিসেবে ক্ষমতায় বসেছিলেন তথাপি ব্রিটিশরাই প্রকৃত অর্থে বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ করে।[৩২] যা পরবর্তীতে পুরো ভারতবর্ষকে তাদের করায়ত্ত করার পথ সুগম করে দেয়। এভাবে ব্রিটিশরা বিভিন্ন কূটকৌশলে পুরো ভারতবর্ষ দখল করে এবং দীর্ঘ প্রায় দুইশ' বছর শাসন করে। ব্রিটিশ সরকারের শাসন ও শোষণের ফলে বাঙালি সমাজ জীবনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্রিটিশরা এদেশে তাদের শাসন পরিচালনার জন্য এবং অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠনের সুবিধার জন্য প্রচলিত শিক্ষার পরিবর্তে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠমো চালু করে। ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো চালু হওয়ার ফলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এদেশের মুসলিম সমাজ।[৩৩] মুসলিম সমাজ শত শত বছর ধরে এদেশের শাসন ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে অভিজাত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইংরেজরা ক্ষমতা গ্রহণের ফলে মুসলিমরা ক্ষমতা হারানোর সাথে সাথে তাদের সর্বস্ব হারাল। যাদের একদিন দরিদ্র অবস্থায় উপণিত হওয়া অসম্ভব ছিল তারা ভিখারীতে পরিণত হয়।[৩৪] ইংরেজরা এদেশে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলে তারা সবকিছুতেই পিছিয়ে পড়ে। আর একটি শ্রেণি ইংরেজি শিক্ষিত হয়ে ইংরেজ সরকারের কাছাকাছি থেকে শোষণ ও লুণ্ঠন করে সম্পদশালী হয়ে অভিজাত হয়ে উঠে।

ব্রিটিশ শাসনামলে সবকিছু কলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে উঠলে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হয়, বিশেষত এখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠী সকল দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ইংরেজদের রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার্থে ও পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর ঐকান্তিক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল (পূর্ব বাংলা ও আসাম) নিয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ নাম দিয়ে বঙ্গভঙ্গ করে।[৩৫] কিন্তু বঙ্গভঙ্গকে কলকাতার হিন্দু অভিজাত শ্রেণি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে নি। তারা শুরু থেকেই

---

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৩২] অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস (মূঘল যুগ: ১৫২৬-১৮৫৭)*, অধুনা প্রকাশ, ঢাকা-২০০৬, পৃ. ৩৬৪

[৩৩] গোলাপ হালদার, *বাঙালি সংস্কৃতির রূপ*, মুক্তধারা ২১৯১, ঢাকা-২০১১, পৃ. ৬৮

[৩৪] আবুল আসাদ, *একশ' বছরের রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৩৫] Sayed Sajjad Husain, *Civilization and Society*, Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) (2nd Print), Dhaka-2002, P.164

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা শুরু করে। যার নেতৃত্বে ছিলেন মতিলাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ।[৩৬] কলকাতার হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতার মূল কারণ হলো, পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী ইংরেজ শাসন আমলে শিক্ষাসহ সমাজের মূল ধারা থেকে যেভাবে পিছিয়ে পড়েছিল তা থেকে তারা যেন উঠে আসতে না পারে সেজন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।[৩৭] বঙ্গভঙ্গের পর মুসলিমরা রাজনৈতিক অবস্থান তৈরির জন্য এবং কংগ্রেসের বিমাতাসুলভ আচরণে তাদের দাবি-দাওয়া রাজনৈতিকভাবে আদায়ের জন্য ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করে।[৩৮] অন্যদিকে কলকাতায় হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়।[৩৯] এই বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রদই পরবর্তীতে ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতি-রাষ্ট্র গঠনের বীজ অঙ্কুরিত করে।[৪০]

বঙ্গভঙ্গ রদ হলে এদেশের মুসলিমরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে থাকে এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দাবি জানিয়ে আসছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কলকাতার হিন্দুরা সর্বাত্মক বিরোধিতা শুরু করে, আর তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এজন্য তিনি অনেক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, কিন্তু তা সফল হয় নি। এসব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে পূর্ব বাংলার মানুষের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি মুসলিম জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের একটি বিশেষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে।[৪১] ঐতিহাসিকভাবে এই দেশ মুসলিমদের হওয়ায় এদেশের মানুষ বারবারই তাদের চেতনার উৎস হিসেবে ইসলামকে মূলমন্ত্র হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে।[৪২] কারণ এদেশের মানুষ শত শত বছর থেকেই মূলত ইসলামী আদর্শের ভাবধারায় নিজেদেরকে লালন করে আসছিল।[৪৩] এজন্য মুসলিমরা তাদের নিজেদের জন্য একটি পৃথক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে জোর আন্দোলন করে।[৪৪] অবশেষে অনেক ত্যাগ ও আন্দোলনের মুখে

---

৩৬ আসাদুজ্জামান আসাদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৪, পৃ. ৬

৩৭ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তুর্য প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৩, পৃ. ৪২৮

৩৮ মাহমুদ নূরুল হুদা, *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কাছ থেকে দেখা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৩০

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৪০ মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, *পলাশী থেকে বাংলাদেশ*, সিঁড়ি প্রকাশন, ঢাকা-২০১১, পৃ. ১৪৭

৪১ শিরীন হাসান ওসমানী, *বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ*, রূপান্তর: আখ্তার-উল্-আলম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ৭৫

৪২ মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার (সম্পাদক), *আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ঢাকা-২০০১, পৃ. ৫৭

৪৩ শিরীন হাসান ওসমানী, *বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

৪৪ মুহাম্মাদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ২০০

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৪ আগস্ট লর্ড মাউন্ট ব্যাটন পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঘোষণা করেন।[৪৫]

পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে ১৯৪৭ সালে ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তমুদ্দুন মজলিশ নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। সেই বছর অক্টোবর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হলের এক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।[৪৬] এরই মধ্যে এদেশের মানুষের নিজস্ব রাজনৈতিক প্লাটফর্ম করার জন্য ১৯৪৮ সালে ২৩ জুন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৭] বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে ১৪৪ ধারা অমান্য করে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ তাতে অতর্কিত গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে সালাম, বরকতসহ বেশ কয়েক জন শাহাদাত বরণ করেন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এদেশে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। তখন থেকেই জাতীয়ভাবে প্রতি বছর শহীদদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি 'ভাষা দিবস' পালন শুরু হয়।[৪৮] এভাবে একের পর এক ঘটনা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিতকে দুর্বল করে দেয় এবং দুই প্রদেশের মানুষের মাঝে মনস্তাত্ত্বিকভাবে আস্থাহীনতা তৈরি হয়। এর মাঝে ১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলার নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষিত হলেও প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।[৪৯] নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টির সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়।[৫০] উক্ত নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। আইনসভায় ৩০৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন পেয়ে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে।[৫১] এই বিজয়ের পর আওয়ামী মুসলিম লীগ মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা থেকে বের হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে দলের নাম পরিবর্তন করে 'আওয়ামী লীগ' করে। যা এই উপমহাদেশের মুসলিম রাজনৈতিক দর্শনে এক বিরাট পরিবর্তন।[৫২]

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানের রাজনীতি রাজনৈতিক মেরুকরণ, অচলাবস্থা, অস্থিরতা ও আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান

---

৪৫ মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, *পলাশী থেকে বাংলাদেশ*, সিঁড়ি প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০১২, পৃ. ২৫৭

৪৬ মোঃ কামরুল হোদা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উৎস অনুসন্ধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০১২, পৃ. ২

৪৭ আসাদুজ্জামান আসাদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৪৮ এস. এম. খাবীরুজ্জামান, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পালক পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ১২-১৩

৪৯ মোঃ কামরুল হোদা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উৎস অনুসন্ধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৫০ আসাদুজ্জামান আসাদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৫১ মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, *পলাশী থেকে বাংলাদেশ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

৫২ আসাদুজ্জামান আসাদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

লাহোরে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারিতে ৬ দফা উপস্থাপন করেন।[৫৩] এরপর ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করে ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বিচারকার্য শুরু করে।[৫৪] পরবর্তীতে তিনি এই রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা থেকে মুক্তি পান। এসব ঘটনাপ্রবাহে ছাত্ররা 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ডাকসুতে এক সংবাদ সম্মেলন করে ১১ দফা প্রকাশ করে।[৫৫] যা গণ-আন্দোলনকে বেগবান করতে সহায়তা করেছে। এদেশে অনেক গণ-আন্দোলন হয়েছে তবে ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনকেই একমাত্র গণ-অভ্যুত্থানরূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান হয়েছে।[৫৬] এই গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইউব খান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং নির্বাচনের ঘোষণা দেন।[৫৭] এরপর ১৯৭০ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাঝে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই দু'টি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যথাক্রমে ১৫৩টি আসনের মধ্যে ১৫১টি এবং ২৭৯টি আসনের মধ্যে ২৬৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[৫৮]

এভাবে বিভিন্ন ঘটনার ধারাবাহিকতায় রাজনৈতিক উত্থান-পতনে পাকিস্তান এক মহা সংকটে উপনীত হয়। নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা না দিয়ে টালবাহানা করতে থাকে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার। এরকম অবস্থায় আলোচনা ও আন্দোলন উভয় পথেই আওয়ামী লীগ তার রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাতে থাকে এবং শেখ মুজিব ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের জনসমাবেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। যা পরবর্তীতে এদেশের মানুষের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল।[৫৯] এই ভাষণের পরে সরকার ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে এবং আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় সরকার বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। আর ২৫ মার্চ তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাতে ঢাকায় অপারেশন সার্চলাইট নামে নিরস্ত্র জনগণের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে বাঙালিদের হত্যা করতে থাকে।[৬০] এই অবস্থায় তৎকালীন পাকিস্তান

---

[৫৩] আনু মুহাম্মাদ, *বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত প্রশ্ন*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৪, পৃ. ২৭

[৫৪] মোঃ কামরুল হোদা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উৎস অনুসন্ধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৫৫] এস. এম. খাবীরুজ্জামান, *উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৫৬] মুনতাসীর মামুন, মো: মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা-২০১৭, পৃ. ১৪৬

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

[৫৮] এস. এম. খাবীরুজ্জামান, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯

[৫৯] আসাদুজ্জামান আসাদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[৬০] এস. এম. খাবীরুজ্জামান, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

সেনাবাহিনীর মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে বিদ্রোহ করেন এবং একটু সংগঠিত হয়ে ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করে যুদ্ধের ডাক দেন।[৬১] রক্তক্ষয়ী এ স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।[৬২] আর এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় ভারতীয় সহযোগিতায় দীর্ঘ নয় মাস সক্রিয় স্বাধীনতা যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ও সম্মানের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে। এদিন রেসকোর্স ময়াদানে আনুষ্ঠানিকভাবে জগজিৎ সিং আরোরা (লেঃ জেনারেল ও অফিসার কমান্ডিং ইন চীফ, ইন্ডিয়ান এন্ড বাংলাদেশ ফোর্সেস ইন দ্য ইস্টার্ন থিয়েটার) এর কাছে আত্মসমর্পন করেন আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী (লেঃ জেনারেল, মার্শাল ল প্রশাসক, জোন বি এবং কমান্ডর, ইস্টার্ন কমান্ড, পাকিস্তান।)[৬৩] আর এই আত্মসমর্পনের মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানের একই ভৌগোলিক সীমানায় সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।[৬৪]

- **বন ও প্রাণি**

বাংলাদেশে বনের আয়তন প্রায় ১৯৭১০ স্কয়ার কিলোমিটার।[৬৫] এখানে সমগ্র ভূভাগের আয়তনের মোট ২১.০৪ ভাগ বন। এই বনের হিসাবের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সকল বন ও ব্যক্তিমালিকানাধীন বাগান, চা ও রাবার বাগান অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরবন পৃথিবীর বিখ্যাত বন। যাকে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সুন্দরবন পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি। এখানে প্রচুর পরিমাণ হরিণ, বানর, হরেক প্রজাতির মাছ, কুমির, বিভিন্ন সাপসহ বহু প্রাণির বসবাস। এখানে প্রচুর পরিমাণে গোলপাতা, সুন্দরীসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ পাওয়া যায়। সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণ মধু পাওয়া যায়। সিলেট বিভাগ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহে প্রচুর পরিমাণ বন রয়েছে। সেখানে শাল, সেগুনসহ বিভিন্ন গাছ পাওয়া যায়। সেখানে হাতিসহ বিভিন্ন প্রজাতির অনেক প্রাণিও রয়েছে।[৬৬] এছাড়া এদেশে বহু প্রজাতির পশু, পাখি ও অন্যান্য প্রাণি দেখা যায়।

---

[৬১] মেজর জেনারেল কে. এম. সফিউল্লাহ্ বীর উত্তম, *মুক্তযুদ্ধে বাংলাদশে*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৫, পৃ. ৬০

[৬২] আনু মুহাম্মাদ, *বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সম্রাজ্যবাদ ও ভারত প্রশ্ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৬৩] মেজর জেনারেল কে. এম. সফিউল্লাহ্ বীর উত্তম, *মুক্তযুদ্ধে বাংলাদশে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

[৬৪] ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ২৩

[৬৫] Bangladesh Bureau of Statistics, *Monthly Statistical Bulletin-Bangladesh*, August 2019, Dhaka-2019. P. ix

[৬৬] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Statistical Year Book Bangladesh 2018*, ibid, P. XXI

- **প্রশাসন, আইন ও বিচার**

বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্র পদ্ধতির একটি দেশ। এখানে রাষ্ট্রের প্রধান হলেন, রাষ্ট্রপতি এবং সরকারের প্রধান হলেন, প্রধানমন্ত্রী। এদেশের সংসদের জন্য ৩০০ আসনে সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত হতে হয়, আর বিশেষ ৫০টি আসন রয়েছে মহিলাদের জন্য বরাদ্দকৃত। সর্বমোট বাংলাদেশের সংসদ সদস্য ৩৫০ জন। এখান থেকে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয়। এছাড়াও এদেশের নিয়মানুযায়ী স্থানীয় সরকারব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে প্রান্তিক পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ রয়েছে। শহরগুলোতে দুই ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে, প্রথমত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন। স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় সকল প্রতিনিধিকেও জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতে হয়। আর নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংসদে আইন প্রণয়ন করে। দেশের সুপ্রিম কোর্ট উক্ত আইনের অভিভাবক ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চয়তার অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। দেশের বিচারব্যবস্থায় দুই স্তরবিশিষ্ট বিচারব্যবস্থা রয়েছে। একটি নিম্ন আদালত ও অন্যটি উচ্চ আদালত। নিম্ন আদালত জেলা আদালত আর উচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে দুটি বিভাগ, একটি উচ্চ আদালত ও অপরটি আপীল বিভাগ।[৬৭]

- **শিক্ষা**

প্রতিটি দেশেই একটি শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কয়েকটি ধারায় বিভক্ত। যেমন, একটি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা, একটি মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা (আলিয়া ও কওমি), একটি কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা ও একটি ব্রিটিশ করিকুলাম শিক্ষাব্যবস্থা। এদেশের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় কয়েকটি শিক্ষা স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা- প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর।[৬৮] দেশের শিক্ষার পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। ২০১৮ সালের তথ্য মতে, বর্তমানে এদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৩৪১৪৭টি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬৬৩টি, বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ২০৪৬৫টি, পলিটেকনিক কলেজ বেসরকারি ৩৮৭টি, সরকারি ৫২টি, সাধারণ কলেজ ৪৪৯৫টি, মাদরাসা সরকারি ৩টি, বেসরকারি ৯২৯১টি, মেডিকেল কলেজ বেসরকারি ৭৪টি, সরকারি ৩৭টি এবং

[৬৭] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Statistical Year Book Bangladesh 2018,* P. XXIII

[৬৮] ibid, P. XXV

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেসরকারি ১০৩টি ও সরকারি ৪৩টি।[৬৯] ২০১৭ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল ৯৭.৯৭ শতাংশ। ২০১৮ সালে এই পরিসংখ্যান ৯৭.৮৫ শতাংশ। গত অর্থবছরে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সরকার ২২৪৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে।[৭০]

- **কৃষি**

আবহমানকাল থেকে কৃষি এদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি এবং জীবন-জীবিকার প্রধান মাধ্যম। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অপরিসীম। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে ১৮টি দপ্তর/সংস্থা এবং ০২টি ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের হাজার হাজার বছর ধরে সভ্যতা বিকাশে কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর কৃষির উপর নির্ভর করে এদেশ সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। যে কারণে বাংলাদেশকে সর্বদা বহিঃশক্তির দ্বারা বিভিন্নমুখী আক্রান্তের শিকার হতে হয়।

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ এর পেছনে শতাধিক বছরের ঘটনা প্রবাহ রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং তা মোকাবিলায় গঠিত দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। উক্ত কমিশনের সুপারিশে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয় এবং তৎপরবর্তী সময়ে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষিকে উন্নতর পর্যায়ে নেয়ার জন্য একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) ১০০০ একর জমি নিয়ে একটি কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করে খামারটিকে কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারে কৃষি গবেষণার জন্য একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি কলেজ থেকে পাস করা গ্রাজুয়েটগণ সর্বপ্রথম কৃষি বিভাগে যোগদান করলে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বেড়ে যায় এবং তখন থেকেই মূলত কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। ১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে Bangladesh Agriculture

---

[৬৯] Bangladesh Bureau of Statistics, *Statistical Pocket Book 2018,* Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, P. 6

[৭০] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০২০, পৃ. ১৬৩

Development Corporation (BADC), ১৯৬২ সালে Agriculture Information Service (AIS) সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসলভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু তাতে ভালো ফল না হওয়ায় ১৯৮২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত 'প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন' পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[৭১] বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষি খাত মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ১০.৯৮ শতাংশ অবদান রাখে এবং এই খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট কর্মসংস্থান হয়েছে ৪০.৬ শতাংশ।[৭২]

বাংলাদেশে যে সকল ফসল উৎপন্ন হয় তার উৎপাদন সুচক উর্ধ্বমুখী। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চাল ৩৭৩.৬৩৬ লাখ মেট্রিক টন, গম ১১.৪৮৪ লাখ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ৪৬.৯৯৩ লাখ মেট্রিক টন, মোট ৪৩২.১১৩ লাখ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। এ সময়ে শাকসবজি ১৭২.৪৭২ লাখ মেট্রিক টন, আলু ১০৯.৪৯৪ লাখ মেট্রিক টন, ডালজাতীয় ফসল ৯.৩৭৫ লাখ মেট্রিক টন, তেলজাতীয় ফসল ১০.৬৪২ লাখ মেট্রিক টন এবং মসলাজাতীয় ফসল ৩৭.৬৫৪ লাখ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে সবজি উৎপাদনে ৩য়, ধান উৎপাদনে ৪র্থ, আম উৎপাদনে ৭ম, আলু উৎপাদনে ৮ম এবং পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম স্থান অর্জন করেছে। Bangladesh Agriculture Development Corporation (BADC) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কৃষির ৩টি মুখ্য উপকরণ মানসম্পন্ন বীজ, সুষম সার ও সেচ সুবিধা সঠিক সময়ে সুলভ মূল্যে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং দেশের কৃষির উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির অপরিহার্যতা প্রমাণ করতে সচেষ্টা রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে Bangladesh Agriculture Development Corporation (BADC) কর্তৃক ২৪টি প্রকল্প ও ২০টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৭২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। সংশোধিত Annul Development Programme (ADP)-তে

[৭১] কৃষি মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৯, পৃ. ২৮

[৭২] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Statistical Year Book Bangladesh 2018,* ibid, P. XXV

অন্তর্ভুক্ত ৭২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ১৮০৬.৮৯ কোটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অর্থ ব্যয় হয়েছে ১৭৭৫.৭৮ কোটি টাকা, যা মোট সংশোধিত Annul Development Programme (ADP) বরাদ্দের ৯৮.৩০ শতাংশ, এর মধ্যে সরকারি খাতে ব্যয় হয়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ৯৫.২৬ শতাংশ।[৭৩] আর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৬০০০ কোটি টাকা।[৭৪]

- **অর্থনীতি**

একটি রাষ্ট্রের অর্থনেতিক অবস্থা হলো উক্ত রাষ্ট্রের মূল। যে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি যত মজবুত সেই রাষ্ট্র তত বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ। অর্থের সংস্থান, অর্থের যোগান, অর্থের প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সামাজিক নিরাপত্তা, ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সেই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থান নির্ণয় করা হয়। এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সময়ের সাথে সাথে সুদৃঢ় হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৩০,৭৫১.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। যা মোট বাজেটের ১২.২৮ শতাংশ ও মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ২.৩০ শতাংশ।[৭৫] আর ২০১৮-২০১৯ যা ছিল ৬৭,১৭৬.৪৭ কোটি টাকা।[৭৬] ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায়ে খানা (এক বা একাধিক ব্যক্তি যারা এক পাকে ও একসাথে খাওয়া-দাওয়া করে ও একসাথে বসবাস করে)[৭৭] এর মাসিক আয় ছিল ৭,২০৩ টাকা, ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে গড়ে মাসিক ব্যয় অনুমিত হয়েছিল ১১,২০০ টাকা।[৭৮] ১৯৯১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৪.২ শতাংশ এবং ২০১৭ সালে হয়েছে ১৮.৮ শতাংশ।[৭৯] ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ এবং ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশ।[৮০] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট

---

[৭৩] কৃষি মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[৭৪] অর্থ মন্ত্রণালয়, *অগ্রযাত্রার দশ বছর ২০০৯-২০১৮*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৮, পৃ. ১৮

[৭৫] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৬, পৃ. ১৯৩

[৭৬] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[৭৭] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Census of Slum Areas and Flouting Population 2014*, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka-2015, P. 17

[৭৮] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[৭৯] worldbank.org/en/country/Bangladesh, ১২.১২.২০১৯

[৮০] abd.org/country/Bangladesh/main, ১২.১২.২০১৯

দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.৬৫ শতাংশ, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২৮ শতাংশ। মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১৬১০ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৫২ মার্কিন ডলারে দাড়িয়েছে।[৮১]

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ২৩.৬১ শতাংশ, যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ছিল মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ২৫.৩৩ শতাংশ। একইভাবে, রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে মোট জাতীয় সঞ্চয় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ২৯.৬৪ শতাংশ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২৮.০৭ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ৩১.৪৭ শতাংশ, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে যা ছিল মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ৩০.৫১ শতাংশ।[৮২] অন্যদিকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৩.৯৩ শতাংশ। যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ছিল মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ২২.৮৩ শতাংশ। একইভাবে, রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্য ঘাটতি হচ্ছে। ফলে মোট জাতীয় সঞ্চয় গত অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ২৭.৪২ শতাংশ থেকে কিছুট বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৪১ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ৩১.৫৬ শতাংশ, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে যা ছিল মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ৩১.৩০ শতাংশ। এর মধ্যে উভয় বিনিয়োগ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ৮.১৭ এবং ২৩.৪০ শতাংশ।[৮৩]

মূল্যস্ফীতি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির পরিমিত অবস্থান, জোরালো আমদানি প্রবৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রয়েছে এবং একই সাথে বিনিয়োগ কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতা নিরসনে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

---

[৮১] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৯, পৃ. ১

[৮২] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৮৩] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক চাহিদার তেজীভাব থেকে সৃষ্ট দেশীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি, একইসাথে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে শস্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধে মূল্যস্ফীতি দেশীয় অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে রেখেছে। মূলত খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ায় বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৩ শতাংশ। জুন ২০১৭ এর গড় ছিল ৫.৪৪ শতাংশ। তবে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রথমার্ধে খাদ্য উৎপাদন উপকরণাদি, মূলধন যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণ সম্পর্কিত আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি প্রবৃদ্ধি পরিমিত আছে। ফলে নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ঘটে।[৮৪] অন্যদিকে ২০১৮ মার্চ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত গড় মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে ৫.৪৪ শতাংশ।[৮৫]

রাজস্ব খাত

- **রাজস্ব আহরণ**

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক। এ সময়ে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫৯,৪৫৩ কোটি টাকা, যা মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ১১.৫৯ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ২২৫,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি-এর ১০.০৫ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৭,৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি-এর ০.৩৪ শতাংশ) এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ২৬,৯৫৩ কোটি টাকা (জিডিপি-এর ১.২০ শতাংশ)।[৮৬] আর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১৬,৫৯৯ কোটি টাকা, যা জিডিপি-এর ১২ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ২৮০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি-এর ১১.০৪ শতাংশ), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৯৬০০ কোটি টাকা (জিডিপি-এর ০.৩৮ শতাংশ) এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ২৭,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি-এর ১.০৬ শতাংশ)।[৮৭]

- **সরকারি ব্যয়**

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৭১,৪৯৫ কোটি টাকা। যা জিডিপি'র ১৬.৬০ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং

[৮৪] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
[৮৫] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
[৮৬] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
[৮৭] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ২২৩,১৪৪ কোটি টাকা (জিডিপি-এর ৯.৯৭ শতাংশ) এবং ১৪৮,৩৮১ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ৬.৬৩ শতাংশ। Integrated Budget and Accounting System (IBAS)-এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১১২,৪০০ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় ৩৩,৮৪৫ কোটি টাকা।[৮৮] আর ২০১৮-২০১৯ বাজেট অনুযায়ী মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪৪২,৫৪১ কেটি টাকা। যা জিডিপি-এর ১৭.৪৫ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালনা ব্যয় যথাক্রমে ২৬৬৯২৬ কোটি টাকা (জিডিপি-এর ১০.৫২ শতাংশ), খাদ্য খাতে ঋণ, অগ্রিম ও উন্নয়ন ব্যয় যথাক্রমে ২,৮২১,৮৮৪ ও ১৭৩,৪৪৯ কোটি টাকা, যা জিডিপি-এর ৬.৫৮ শতাংশ।[৮৯]

- **পুঁজি বাজার**

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৭ সালের জুন মাসের ৫৬৩টি থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে ৫৬৮টিতে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৯,৪৭১.২৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.৩৩ শতাংশ। এই সংখ্যা ২০১৭ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত ১১৬,৫৫১.০৮ কোটি টাকার তুলনায় ২.৫১ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৮০,১০০.১০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৬.৯৯ শতাংশ)। যা ৬.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৪০৪,৪৩৮.৯১ কোটি টাকা (জিডিপি-এর ১৮.০৭ শতাংশ)। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৭ সালের জুন মাসের ৩০৩টি থেকে বেড়ে ২০১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩০৮টিতে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ৬৩০৯৩.৪৮ কোটি টাকা, যা জুন ৩০, ২০১৭ এর ৬০,৬৫৭.২০ কোটি টাকার তুলনায় ৪.০২ শতাংশ বেশি। জুন ৩০, ২০১৭ পর্যন্ত বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩১৯,৩২৪.২৯ কোটি টাকা, যা ৭.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ট্রেডিং শেষে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৪,৫৬০.০৫ কোটি টাকায়।[৯০]

---

[৮৮] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪

[৮৯] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৯০] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

২০১৮ সালের জুন মাসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ৫৭২টি থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ৫৮০টিতে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৪,৬৩৪.৫৩ কোটি টাকা, যা জিডিপি-এর ৫.৩৩ শতাংশ। এই সংখ্যা জুন ২০১৮ তুলনায় ২.১৯ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৮৪,৭৩৪.৭৭ কোটি টাকা (জিডিপি-এর ১৬.৯৯ শতাংশ), যা ৭.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৪০১,৫৭৩.৭৭ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৮ সালের জুন মাসের ৩১২টি বেড়ে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩২৩টিতে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ৬৮,২১৪.১৩ কোটি টাকা, যা জুন, ২০১৮ এর তুলনায় ৪.২৯ শতাংশ বেশি।[৯১]

বৈদেশিক খাত

- **রপ্তানি**

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জুলাই ২০১৭ থেকে মার্চ ২০১৮ সময়ে মোট রপ্তানি আয় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৪৫১.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আর বাংলাদেশ যেসব দেশে পণ্য রপ্তানি করে তার মধ্যে প্রধান প্রধান দেশ হিসেবে যথাক্রমে শীর্ষে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এরপর জার্মানি ও যুক্তরাজ্য।[৯২] ২০১৮-২০১৯ সালে জুলাই থেকে মার্চ সময়ে মোট রপ্তানি ১২.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৯০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়।[৯৩]

- **আমদানি**

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ৩৮,৭১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬.২ শতাংশ বেশি। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমদানি ব্যয় বাবদ মোট ৩০,৬৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। আর আমদানি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেসব দেশ থেকে আমদানি করে তার মধ্যে প্রধান প্রধান দেশ চীন, মালয়েশিয়া ও ভারত।[৯৪]

---

[৯১] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
[৯২] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
[৯৩] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
[৯৪] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ৪০,৮৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৬৩ শতাংশ বেশি।[৯৫]

- **বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স**

বিদেশে কর্মরতদের প্রেরিত অর্থ দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে এদেশের জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬.৯২ লাখ এবং এ সময়ে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ছিল ১২০৮৮.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিট্যান্সের বেশিরভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে শতকরা ৪৮ ভাগ রেমিট্যান্স এসেছে। এর মধ্যে শীর্ষ রয়েছে সৌদি আরব, এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্র।[৯৬] ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫.০৮ লাখ এবং ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০১৯ সালের মার্চ পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ছিল ১১৮৬৮.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা ২০১৭-২০১৮ বছরের তুলনায় ১০.৩০ শতাংশ বেশি।[৯৭]

- **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ**

বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্য ঋণাত্মক থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ৯ মে ২০১৮ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৯৮] জুন ২০১৮-তে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর এপ্রিল ২০১৯ এ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৯৯]

উল্লিখিত তথ্য বিশ্লেষণে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা আবশ্যক। বর্তমানে বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম মানুষ রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও অভাবী জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরন্তন প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হচেছ।[১০০] বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৬৭.৬ শতাংশই কর্মক্ষম।[১০১] এ কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে যদি প্রশিক্ষণ দিয়ে আরো গতিশীল করা যায় তবে কাঙ্ক্ষিত মানবসম্পদে পরিণত হবে।

---

[৯৫] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
[৯৬] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
[৯৭] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
[৯৮] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
[৯৯] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
[১০০] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
[১০১] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের পরিচয়

সুবিধাবঞ্চিত শব্দটির ব্যবহার পূর্বে ছিল না। এই শব্দটি মূলত দারিদ্র্যের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে সকল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিমজ্জিত তারাই মূলত সুবিধাবঞ্চিত। যারা অবহেলিত, যাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক মান সামাজিক সাধারণ অবস্থান থেকে নিম্নমুখী এবং যারা এরকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তারাই মূলত সুবিধাবঞ্চিত। খাদ্যশক্তি গ্রহণ (Food Energy Intake-FCI) এবং প্রত্যক্ষ ক্যালরি (Direct Calory Intake-DCI) পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে জরিপ পরিচালনা করা হয় মানুষের জীবনমানের অবস্থান পরিমাপের জন্য। দৈনিক জনপ্রতি ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে পূর্ণ দারিদ্র্য (Absolute Poverty) এবং ১৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণকে চরম দারিদ্র্য (Hard Core Poverty) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১০২] এক কথায় দারিদ্র্যের অবস্থা বিবেচনা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। **এক.** সাধারণ দরিদ্র শ্রেণি ও **দুই,** চরম দরিদ্র বা হতদরিদ্র। আর এই হতদরিদ্র বা চরম দরিদ্রকেই মূলত সুবিধাবঞ্চিত হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়। বিশেষত যাদের থাকার কোনো ভালো বাসস্থান নেই, আহারের জন্য নিরাপদ খাদ্যের ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসার জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ যারা মানবিক মৌলিক চাহিদা প্রাপ্ত থেকে বঞ্চিত তারাই সুবিধাবঞ্চিত। যদিও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বলতে সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, না শুধু চরম বা প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, না উভয়দেরকেই করা হবে তার সঠিক কোনো প্যারামিটার নেই। তবে সুবিধাবঞ্চিত বলতে চরম দরিদ্র বা হতদরিদ্রদেরকে যে বুঝায় এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। আরো নিশ্চিত করে বলা যায়, সুবিধাবঞ্চিত বলতে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী, ছিন্নমূল, দুর্দশাগ্রস্ত, গৃহহীন, ভূমিহীন ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকেই বুঝায়।

জাতিসংঘ দারিদ্র্য নির্ণয়ের জন্য প্রধানত: ০৮টি সূচক নির্ধারণ করেছে। সেগুলো হলো-

১. খাদ্য
২. নিরাপদ পানীয়
৩. স্বাস্থ্য
৪. আশ্রয়
৫. শিক্ষা
৬. তথ্য
৭. কর্মের সুবিধা[১০৩]

---

[১০২] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, পৃ. ১৭৭

[১০৩] Dr. David Gordon, *Indicators of Poverty & Hunger,* United Nations Head Quarters, New York-2005, P. 5

- **অভিধানিক অর্থে দরিদ্রের সংজ্ঞা**

দরিদ্র শব্দটি বাংলা ভাষার একটি বিশেষ্য বাচক শব্দ। দরিদ্র অর্থ– অভাবগ্রস্ত, গরিব, দুর্গত ইত্যাদি। এর বিশেষণ বাচক শব্দ হলো দারিদ্র্য। দারিদ্র্য শব্দের অভিধানিক অর্থ- নির্ধনতা, অভাব, দৈন্য, দীনতা, দরিদ্র অবস্থা, অনটন, অর্থকষ্ট, সম্বলহীনতা, অপ্রাচুর্য, দুরবস্থা ইত্যাদি।[১০৪]

দারিদ্র্য শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো- poverty, penury, destitution, indigence, distress, want lack, deprivation, privation, neediness, pauperism, scantiness, insufficiency, meagerness, inadequacy, sparseness, shortage, dearth ইত্যাদি।[১০৫]

- **পারিভাষিক অর্থে দরিদ্রের সংজ্ঞা**

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞ দারিদ্র্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াকুব আল ফায়রূয আবাদী'র মতে, "দারিদ্র্য হলো ধনাঢ্যতার বিপরীত। আর তার পরিমাণ হলো, কোনো ব্যক্তির নিকট সেই পরিমাণ সম্পদ না থাকা, যা তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট।"[১০৬] ড. ইব্রাহীম আনীস ও তাঁর সহযোগীগণের মতে, "দরিদ্র ঐ ব্যক্তি, যার কাছে সামান্য খাদ্যসামগ্রী ছাড়া তেমন কোনো সম্পদ নেই।"[১০৭] এ বিষয়ে লুয়াইস মা'লূফ বলেন, "দরিদ্র হলো ধনীর বিপরীত। আর তা হলো, কোনো ব্যক্তিকে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া অথবা তার নিকট এমন কিছু নেই, যা তার প্রয়োজন পূরণ করবে।"[১০৮] দারিদ্র্যের সংজ্ঞায় ইব্ন মানযুর বলেন, "ফকীর সেই ব্যক্তি, যার কাছে খাবারের বন্দোবস্ত রয়েছে; আর মিসকীন সেই ব্যক্তি, যার কাছে কিছুই নেই।"[১০৯] এ বিষয়ে আব্দুর রহমান আলজাযায়রী বলেন, "ফকীর সেই ব্যক্তি, যার নিকট নিসাবের চেয়ে কম সম্পদ রয়েছে;

---

[১০৪] ডক্টর মুহমামদ এনামুল হক ও সহযোগীবৃন্দ, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, দশম পুনর্মুদ্রণ-২০০৯, পৃ. ৬০০, ৬০৭ ও ৬২৫; শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৭, পৃ. ৩৩২, ৩৩৫ ও ৩৪৫

[১০৫] A.T. Dev, *Students Favorite Dictionary*, New Modern Art Press, Dhaka, New Addition- 2000, P. 602

[১০৬] মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াকুব আল ফায়রূয আবাদী, *আল কামূস আল মুহীত*, ১ম খণ্ড, দার আল ফিক্‌র, বৈরুত-১৯৮৯, পৃ. ৫৮৮

[১০৭] ড. ইব্রাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল মু'জাম আল ওয়াসীত*, মুজাম্মা আল লুগাহ আল 'আরাবিয়্যাহ, বৈরুত-১৯৭২, পৃ. ৬৯৭

[১০৮] লুয়াইস মা'লূফ, *আল মুনইজদ ফী আল লুগাহ ওয়াল আ'লাম*, দার আল মাশ্‌রিক, ৩৩শ সংস্করণ, বৈরুত-১৯৯২, পৃ. ৫৯০

[১০৯] মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাররাম আল মিসরী ইবনে মানুযুর, *লিসান আল 'আরাব*, ৫ম খণ্ড, দার সাদির, বৈরুত-১৯৯৬, পৃ. ৬০

অথবা নিসাব[১১০] পরিমাণ সম্পদের মালিক, কিন্তু তা তার প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট নয়। আর মিসকীন সেই ব্যক্তি, যার নিকট কিছুই নেই, যাকে খাদ্যের জন্য কিংবা পোশাকের জন্য হাত পাততে হয়।"[১১১] Hasnat Abdul Hye, এর মতে "Poverty refers to forms of economic, social and psychological deprivation occurring among people lacking sufficient ownership, control or access to resources to maintain or provide individual, or collective minimum levels of living."[১১২] ড. অমর্ত্য সেন দারিদ্র্য সম্পর্কে বলেন, Poverty is, of course, a matter of deprivation. The recent shift in focus especially in the sociological literature- from absolute to relative deprivation has provided a useful framework of analysis. But relative deprivation is essentially incomplete as an approach to poverty, and supplements the earlier approach of absolute dispossession.[১১৩]

এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছে, যেমন বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্যের সংজ্ঞায় বলেছে, "Those who live on $1.90 a day or less."[১১৪] জাতিসংঘ দারিদ্র্যে সংজ্ঞায় বলেছে, "Fundamentally, poverty is a denial of choices and opportunities, a violation of human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society. It means not having enough to feed and cloth a family, not having a school or clinic to go to, not having the land on which to grow one's food or a job to earn one's living, not having access to credit. It means insecurity, powerlessness and exclusion of individuals, households and communities. It means susceptibility to violence, and it often implies living on marginal or fragile environments, without access

---

১১০ النصاب : এর অর্থ"الأصل والمرجع " মূল বা প্রত্যাবর্তন স্থল। কিন্তু যখন এর দ্বারা (مال النصاب) মালের নিসাব উদ্দেশ্য হয় তখন এর অর্থ হবে (القدر الذي علده تجب الزكاة عليه) মালের ঐ পরিমাণ যা কোনো ব্যক্তির নিকট থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ হয়।

১১১ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল জাযায়রী, *আল ফিক্হ 'আলা আল মাযাহিব আল আরবা'আহ, ১ম খণ্ড*, দার আর রাইয়্যান, বৈরুত-১৯৯১, পৃ. ৯৮৬

১১২ Hasnat Abdul Hye, *Below the line: Rural Poverty in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka-1996, P. 4

১১৩ Amartya Sen, *Poverty and Famines*, Oxford University Press, 17th impression, New-York-2011, P. 22

১১৪ https://www.worldbank.org/en/understanding-poverty, ২৮.০৮.২০২০

to clean water or sanitation."[১১৫] জাতিসংঘের সাবেক সভাপতি জনাব Robert McNamara দারিদ্র্যের সংজ্ঞায় বলেছেন, "It is a condition so limited by malnutrition, illiteracy, disease, squalid surroundings, high infant mortality, and low life expectancy as to be beneath any reasonable definition of human decency." জাতিসংঘ দারিদ্র্যের সংজ্ঞায় আরো বলেছে, "Poverty entails more than the lack of income and productive resources to ensure sustainable livelihoods. Its manifestations include hunger and malnutrition, limited access to education and other basic services, social discrimination and exclusion, as well as the lack of participation in decision-making."[১১৬]

এছাড়াও ক্যামব্রীজ অনলাইন অভিধানে দারিদ্র্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "The amount of income a person or family needs in order to maintain an acceptable standard of living, and below which they are considered poor."[১১৭] উকিপিডিয়াতে দারিদ্র্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "Poverty is not having enough material possessions or income for a person's needs. Poverty may include social, economic, and political elements. Absolute poverty is the complete lack of the means necessary to meet basic personal needs, such as food, clothing, and shelter. The threshold at which absolute poverty is defined is always about the same, independent of the person's permanent location or era. On the other hand, relative poverty occurs when a person cannot meet a minimum level of living standards, compared to others in the same time and place."[১১৮]

Investopedia-তে দারিদ্র্যের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "Poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essentials for a minimum standard of living. Poverty means that the income level from employment is so low that basic

[১১৫] UN statement, June-1998; signed by the Head of all UN Agencies
[১১৬] https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/, ২৭.০৮.২০২০
[১১৭] https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/poverty-line, ২৮.০৮.২০২০
[১১৮] https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty#cite_note-webster-2, ২৮.০৮.২০২০

human needs can't be met. Poverty-stricken people and families might go without proper housing, clean water, healthy food, and medical attention. Each nation may have its own threshold that determines how many of its people are living in poverty.[১১৯]

দারিদ্র্যের সংজ্ঞায় আরো বলা হয়েছে, "Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to see a doctor. Poverty is not having access to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear for the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom."[১২০] বাংলাপিডিয়াতে দারিদ্র্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "দারিদ্র্য এমন অর্থনৈতিক অবস্থা, যখন একজন মানুষ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবন ধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করার সক্ষমতা হারায়।"[১২১]

[১১৯] https://www.investopedia.com/terms/p/poverty.asp, ২৭.০৮.২০২০
[১২০] https://www.compassion.com/poverty/what-is-poverty.htm, ২৭.০৮.২০২০
[১২১] www.banglapedia.org, ২৭.০৫.২০২০

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিতদের অবস্থান

জনসংখ্যার ঘনত্বে বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রথম সারির দেশ। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্বের সাথে সাথে দারিদ্র্যের ঘনত্বও অনেক বেশি। এজন্য বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির পুরোপুরি পরিসংখ্যান বের করা অত্যন্ত কঠিন। এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান প্রতিনিয়ত এবং দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আবার দারিদ্র্যের মানদণ্ড ও সূচক সকলের নিকট এক রকম নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা বিভিন্ন মানদণ্ডে দারিদ্র্য নিরূপণ করেছেন। তাই সময়ের ব্যবধানে যেমন দারিদ্র্যের অবস্থান পরিবর্তন হয়, তেমন জরিপ মূল্যায়নকারী ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্থার মানদণ্ডের ভিন্নতার কারণেও দারিদ্র্যের প্রকৃত অবস্থা ও পরিসংখ্যানের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

এদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হাজার বছরের ইতিহাসে একই ধারাবাহিকতায় ছিল না। একদা বাংলা ছিল সবথেকে সমৃদ্ধ এক জনপদ। তখন এদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিমাণ ছিল খুবই নগন্য। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে দারিদ্র্যের পরিমাণ বেড়েছে, কখনো কমেছে। মূলত ব্রিটিশ শাসন আমল থেকেই এদেশে শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিমাণ বেড়েছে। এরপর পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সে ধারা আরো গতি পায়। কিন্তু পুরো পাকিস্তান আমলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের অবস্থা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় কিছুটা ভালো ছিল। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণে এদেশ অর্থনৈতিকভাবে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তখনই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিমাণ বেড়ে সর্বোচ্চ হয়। তখন এদেশের হতদরিদ্র ছিল ৮০ শতাংশ। পরবর্তীতে এদেশের মানুষের নিজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দারিদ্র্যের হার আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় দারিদ্র্যের হার কমতে কমতে ১৯৯১ সালে ৫৬.৭ শতাংশে দাঁড়ায়।[১২২] এরপর এই হার ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকে যেমন, ২০০০ সালের তথ্য অনুযায়ী ৪৮.৯ শতাংশ, এর মধ্যে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৪.৩ শতাংশ।[১২৩] ২০০৫ সালের তথ্য অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০ শতাংশ এবং ২০০৯ সালে ছিল ৪০ শতাংশ।[১২৪] ২০০৭-২০০৮ সালের প্রকাশিত জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-এর মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক অনুযায়ী মানুষের জীবনধারণের গুণগত মান বিবেচনায় বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে ১৪০তম।[১২৫] ২০১৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল প্রায় ৩১.৫ শতাংশ মানুষ।[১২৬] এর মধ্যে চরম দারিদ্র্য ছিল ১৭.৬%।[১২৭]

---

১২২ অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

১২৩ Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Final Report on Household Income and Expenditure Survey 2016,* ibid, P. 56

১২৪ অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৯*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০০০, পৃ. ২১

১২৫ UNDP, HDI -2007-2008

১২৬ অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৫, পৃ. ২০৭

১২৭ অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫*, প্রাগুক্ত, পৃ. xvii

২০১৬-২০১৭ সালের Household Income and Expenditure Survey (HIES), অনুযায়ী প্রথমবারের মতো জেলাভিত্তিক দারিদ্র্যের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২৪.৩ শতাংশ (মোটামুটি চার ভাগের এক ভাগ) মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে, আর এর মধ্যে ১২.৯ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র্য।[১২৮] ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত খুব দ্রুতই দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে, কিন্তু নিকট বর্তমান সময়ে অর্থাৎ ২০১৭-২০১৮ সালে এর ধারা কিছুটা কমে এসেছে। শহর এলাকাগুলোতে সে সময় দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২১.৩ শতাংশ হতে ১৮.৯ শতাংশ, অন্যদিকে গ্রাম এলাকাগুলোতে ৩৫.২ শতাংশ থেকে ২৬.৪ শতাংশ।[১২৯] সরকারি পরিসংখ্যা অনুযায়ী দারিদ্র্যের ধারা ধারাবাহিকভাবে কমে চলেছে। ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ২১.৮ শতাংশ।[১৩০] ২০১৯ সালে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্য ১০.৫ শতাংশ।[১৩১] দারিদ্র্য হ্রাসের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে আশা করা যায়।[১৩২]

এ সকল দরিদ্র তথা সুবিধাবঞ্চিত মানুষ মূলত রাজধানীসহ বড় বড় শহরের ফুটপাতে, বড় রাস্তার পাশে, রেললাইনের পাশে এবং ভেড়িবাঁধ সংলগ্ন রাস্তায়, বিভিন্ন পার্কে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় বসবাস করে। তারা ছোট ছোট টিন শেড, আধা পাকা পরিত্যক্ত ঘরসহ পলিথিন ও চটের বস্তা দিয়ে নির্মিত ঝুপড়ি, টং, টং ছইসহ বাঁশের মাচার উপর বেড়া দিয়ে নির্মিত ঘরে অত্যন্ত অমানবিক পরিবেশে বসবাস করে। এখানে পর্যাপ্ত আলো, পানি ও বাতাসের অভাব, পর্যাপ্ত টয়লেটের অভাব, সুস্থ পরিবেশের অভাব, চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় পথের অভাব রয়েছে।[১৩৩] ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত বস্তি শুমারির শেষ রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাপ্ত বস্তির সংখ্যা ১৩,৯৩৫টি পক্ষান্তরে ১৯৯৭ সালে এ সংখ্যা ছিল ২,৯৯১টি। বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোক গণনা ২০১৪-তে গণনাকৃত বস্তি খানার[১৩৪] সংখ্যা ৫৯৪,৮৬১টি। যেগুলোর মধ্যে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বস্তি খানার সংখ্যা ৪৩১,৭৫৬টি, পৌর এলাকায় ১৩০,১৪৫টি এবং অন্যান্য শহর এলাকায় এর সংখ্যা ৩২,৯৬০টি। এর মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ১,৬৩৯টি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ১,৭৫৫টি, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে

---

[১২৮] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Final Report on Household Income and Expenditure Survey 2016,* ibid, P. 56

[১২৯] Md. Abdul Hamid Miah, *Islamic Microfinance,* Principal Publishers Ltd. Dhaka-2018, P. 42

[১৩০] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[১৩১] www.bbs.gov.bd, ২০.১২.২০১৯

[১৩২] Md. Abdul Hamid Miah, *Islamic Microfinance,* ibid. P. 44

[১৩৩] Bangladesh Bureau of Statistics(BBS), *Preliminary Report On Census of Slum Areas and Flouting Population 2014,* Statistics and Informatics Division(SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka-2015, P. 6

[১৩৪] এক বা একাধিক ব্যক্তি যারা এক পাকে ও একসাথে খাওয়া-দাওয়া করে এবং একসাথে বসবাস করে তাদের সমন্বয়ে খানা গঠিত হয়।

বস্তি রয়েছে ২,২১৬টি, খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ১,১৩৪টি, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে ১০৪টি, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে ৮২টি, গাজীপুর সিটিতে ১,২৮৫টি ও রংপুর সিটিতে ৪৯টিতে মোট ৯,১১৩টি বস্তি রয়েছে। এছাড়াও সকল পৌর এলাকায় ৩,৩৫৭টি এবং অন্যান্য শহর এলাকায় ১,৪৬৫টি বস্তি রয়েছে। মোট বস্তির সংখ্যা ১৩৯৩৫টি।[১৩৫] এ সকল বস্তিতে সর্বমোট বস্তিবাসীর সংখ্যা ২,২৩২,১১৪ জন। যার মধ্যে ১,১৪৩,৩৩৭ জন পুরুষ, ১,০৮৬,৩৩৭ জন মহিলা।[১৩৬] অন্যদিকে ডেমক্রেসি ওয়াচ এর ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী, ঢাকায় বস্তির সংখ্যা প্রায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) এবং সেখানে বস্তিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪,০০০,০০০ (৪০ লাখ)।[১৩৭] অন্য এক জরিপে ঢাকা শহরে বস্তির সংখ্যা প্রায় ৪,০০০ (চার হাজার) এবং বস্তিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩,৫০০,০০০ (৩৫ লাখ)।[১৩৮] 'বস্তিবাসী সুরক্ষা কমিটি', 'বাংলাদেশ বস্তিবাসী ইউনিয়ন', 'এনডিবাস' ও 'এনবাস'-এর হিসাব মতে, এদেশে বস্তিবাসীর সংখ্যা ৪০ লাখ।[১৩৯] বস্তিতে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা বসবাস করে, তন্মধ্যে ৯২.৬৬ শতাংশ মুসলিম, ৬.৭৩ শতাংশ হিন্দু, ০.৩২ শতাংশ খ্রিস্টান, ০.২২ শতাংশ বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ধর্ম পালনকারীর সংখ্যা ০.০৮ শতাংশ।[১৪০] বস্তিতে বসাবাসকারী মানুষের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৩৩.২৬ শতাংশ।[১৪১] এখানে বসবাসরত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৭২.৯৬ শতাংশ সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, ২২.৩৬ শতাংশ অন্যান্য শিক্ষায়/কারিগরি/বৃত্তিমূলক, ২.৮৫ শতাংশ ধর্মীয় শিক্ষায় এবং ১.৮২ শতাংশ জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষিত রয়েছে।[১৪২]

বস্তিবাসীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী রয়েছে, যাদের মধ্যে সমাজের কিছু বিশেষ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীও বিদ্যমান। যারা মানবিক মৌলিক সকল চাহিদা থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত। এ সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে, হিজড়া জনগোষ্ঠী রয়েছে প্রায় ১১ হাজার,[১৪৩] যারা বস্তিতেও বসবাস করে আবার এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। এছাড়াও বাংলাদেশে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীও রয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এদের সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ ৯০ হাজার জন।[১৪৪] এ সকল অনগ্রসর বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এবং সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে অনেকেই দারিদ্র্যের নির্মম থাবায়

---

১৩৫ Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Census of Slum Areas and Flouting Population 2014*, ibid, P. 22

১৩৬ ibid, P. 32

১৩৭ দৈনিক প্রথম আলো (স্বপ্ন নিয়ে), ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১৩, পৃ. ৩

১৩৮ দৈনিক আমার দেশ, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১৪, পৃ. ৩

১৩৯ http://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/460866.details, ২০.০৬.২০১৬

১৪০ Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Census of Slum Areas and Flouting Population 2014*, ibid, P. 37

১৪১ ibid, P. 39

১৪২ ibid, P. 41

১৪৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯*, প্রকাশনায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-২০১৯, পৃ. ৩৪

১৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

নিজেদেরকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করেছে। যদিও এদেশের ভিক্ষুকদের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবুও ২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ১০ হাজার ভিক্ষুক রয়েছে এবং বর্তমানে সেই সংখ্যা আরো অনেক বেড়ে গেছে। আর পুরো দেশে এ সংখ্যা আরো কয়েক গুণ বেশি বলে ধারণা করা হয়।

এছাড়াও এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ এত অসহায় ও নিঃস্ব যে, বস্তিতে বসবাস করার সামর্থ্যও তাদের নেই। এজন্য তারা খোলা আকাশের নিচে উন্মুক্ত স্থানে বসাবাস করে, এদেরকে ভাসমান মানুষ বলা হয়। তারা অত্যন্ত কমমূল্যে তাদের শ্রম বিক্রি করে থাকে। ভাসমান লোক হলো ভবঘুরে প্রকৃতির ছিন্নমূল লোক, যাদের কোনো স্থায়ী আবাসন নেই এবং যাদেরকে সাধারণত রাস্তা-ঘাট, রেল স্টেশন, লঞ্চঘাট, বাস স্টপেজ, হাট-বাজার, মাজার, সরকারি-বেসরকারি ভবনের সিঁড়ির নিচে ও খোলা জায়গায় প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করতে দেখা যায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ভাসমান লোকগণনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোক গণনা ২০১৪ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এদেশে ১৬,৬২১ জন ভাসমান লোক রয়েছে। যাদের মধ্যে ১২,৫০৯ জন পুরুষ, ৪০৭৮ জন মহিলা এবং ৩৪ জন হিজড়া।[১৪৫] তারা অর্থ ও সুযোগের অভাবে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এসব লোক তাদের জীবন ধারণের জন্য রস্তাঘাটে ও ময়লার স্তূপে পরিত্যক্ত জিনিসপত্র কুড়ায়, রিকসা ও ঠেলাগাড়ি চালায়। আর বিভিন্ন যানবাহনে চালক, হেলপার, কুলি, মজুর ও বিভিন্ন শ্রমিক হিসেবে কাজ করে।[১৪৬] এছাড়াও এদের মধ্যে কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তিসহ প্রভৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত কাজে নিয়োজিত হয় এবং কেউ কেউ মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

বস্তিবাসী ও ভাসমান মানুষের মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু। যারা সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও পথশিশু নামে পরিচিতি। শিশুরাই একটি জাতির ভবিষ্যৎ। এই সুবিধাবঞ্চিত শিশু মানবসভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে বিরাট অন্তরায়। দেশের সার্বিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক নিরাপত্তার আশ্রয়ে সামগ্রিকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিমাণ কমলেও বস্তিবাসী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুর পরিমাণ বাড়ছে। এই সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ মূলত বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র পিতামাতার অবহেলা, বাবা-মায়ের বহুবিবাহ, বাবা-মায়ের মৃত্যু, সৎ বাবা ও সৎ মায়ের দ্বারা নির্যাতন, ভূমিহীন, আশ্রয় না থাকা, পরিবারের অভাব, অপ্রতুল সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা, শিশু পাচার এবং পালিয়ে আসা ইত্যাদি। ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩৩ মিলিয়ন শিশু দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে।[১৪৭] অন্যদিকে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৫

---

[১৪৫] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Census of Slum Areas and Flouting Population 2014*, ibid, P. xxxii

[১৪৬] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Census of Slum Areas and Flouting Population 2014*, ibid, P. xxx

[১৪৭] https://www.unicef.org/media/media_51925.html, ২৮.০৮.২০২০

উদ্বোধনকালে এদেশে সুবিধাবঞ্চিত শিশুর পরিমাণ প্রায় ৩৪,০০,০০০ (৩৪ লাখ) উল্লেখ করেছেন।[১৪৮] অন্য এক হিসাবে ২০০৩ সালে বাংলাদেশে শিশু শ্রমিক ছিল ৩.২ মিলিয়ন।[১৪৯] শিশু শ্রমের দিক থেকে বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।[১৫০] এ সকল শিশুদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ পোশাক কারখানায়, ২৪ শতাংশ বিভিন্ন দোকানে ও ৯ শতাংশ সরাসরি ভিক্ষার সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে ৯ শতাংশ শিশু শারীরিক নির্যাতনের শিকার, ১২ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে।[১৫১]

সুবিধাবঞ্চিত এ সকল জনগোষ্ঠীর শহরে আসার কারণ উৎঘাটন করতে পরিচালিত জরিপের রিপোর্ট অনুযায়ী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে কাজের সন্ধানে ৫০.৯৬ শতাংশ, দারিদ্র্যের কারণে ২৮.৭৬ শতাংশ, নদীভাঙনে ৭.০৪ শতাংশ, নিরাপত্তাহীনতা/বিতাড়িত ২.১৫ শতাংশ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ০.৮৪ শতাংশ, তালাকপ্রাপ্ত/বিবাহবিচ্ছেদ ০.৮২ শতাংশ এবং অন্যান্য কারণে ৯.৪১ শতাংশ। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে কাজের খোঁজে সর্বোচ্চ ৫৯.৬৬ শতাংশ, দারিদ্র্যে ২৭.৫৩ শতাংশ, নদীভাঙনে ৫.৮৬ শতাংশ, অন্যান্য ৪.৪৩ শতাংশ, বাকি কারণের মধ্যে ১ শতাংশেরও কম। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে কাজের খোঁজে সর্বোচ্চ ৫০.৩৬ শতাংশ, দারিদ্র্যে ২৭.৯৪ শতাংশ, নদীভাঙনে ৮.৯৬ শতাংশ, অন্যান্য কারণে ৭.৫৮ শতাংশ, নিরাপত্তাহীনতার কারণে ৩.৭১ শতাংশ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে কাজের খোঁজে সর্বোচ্চ ৫৮.২৭ শতাংশ, দারিদ্র্যে ২৫.৫১ শতাংশ, নদীভাঙনে ৬.২৭ শতাংশ, অন্যান্য কারণে ৬.৪৬ শতাংশ। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কাজের খোঁজে সর্বোচ্চ ৫০.৯৯ শতাংশ, দারিদ্র্যে ৩৫.৫৫ শতাংশ, নদীভাঙনে ২.১৮ শতাংশ, অন্যান্য কারণে ৮.০১ শতাংশ বস্তিতে বাস করে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে দারিদ্র্যের কারণে ২৭.৩২ শতাংশ, চাকরির খোঁজে ও অন্যান্য কারণে ১৫.৩৬ শতাংশ, নদীভাঙনে ১০.৯৩ শতাংশ, নিরাপত্তাহীনতার কারণে ১০.০০ শতাংশ শহরে এসে বস্তিতে ও খোলা আকাশের নিচে ভাসমান অবস্থায় বসবাস করে।[১৫২] জাতীয়ভাবে এ সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫০.৯৬ শতাংশ কাজের খোঁজে, ২৮.৭৬ শতাংশ দারিদ্র্যের কারণে, ৭.০৪ শতাংশ নদীভাঙনে, ২.১৫ শতাংশ নিরাপত্তাহীনতা বা বিতাড়িত হয়ে এবং ০.৮৪ শতাংশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এসেছে।[১৫৩]

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা বা তাদের পরিচয় জানতে উপরিউক্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২৪.৩ শতাংশ দরিদ্র, আর হতদরিদ্র ১২.৯ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে

---

[১৪৮] দৈনিক প্রথম আলো, অক্টোবর ১২, ২০১৫, পৃ. ২০

[১৪৯] দৈনিক জনকণ্ঠ, ফেব্রুয়ারি ০২, ২০১৫, পৃ. ২০

[১৫০] প্রাগুক্ত

[১৫১] দৈনিক নয়া দিগন্ত, মে ২৩, ২০১৪, পৃ. ১৬

[১৫২] Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Census of Slum Areas and Flouting Population 2014*, ibid, P. 75

[১৫৩] ibid, P. xxxi

বসবাস করে। আর একই সময়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অবস্থান করে প্রায় ২ কোটির উপর মানুষ; যাদেরকে চরম দরিদ্র বা হতদরিদ্র বলা হয়। আর ২০১৯ সালের তথ্যমতে, দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে দরিদ্র ২০.৫ শতাংশ ও হতদরিদ্র ১০.৫ শতাংশ। অর্থাৎ সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ মানুষ, আর চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৬৯ লাখের মতো, যা একটি রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বড় বাধা। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঠিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উপযোগী তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধনমুখী কার্যক্রম নেই। যে কারণে তারা দারিদ্র্যের বলয় থেকে বের হতে পারে না। উপরিউক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বর্তমানে যারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে তারাই মূলত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামের পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামের পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামের মৌলিক উৎস

প্রথম অনুচ্ছেদঃ পবিত্র আল কুর'আন

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামের ভিত্তি

প্রথম অনুচ্ছেদঃ কালেমা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ সালাত (নামায)

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ যাকাত

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ সাওম (রোযা)

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ হজ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলাম-এর পরিচয়

ইসলাম (إسلام) 'আরবি শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ (الإطاعة و الانقياد) অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা। পারিভাষিক অর্থে 'আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই হলো ইসলাম।'[১৫৪] এই আত্মসমর্পণের অর্থ হলো, নিজের সকল সত্তাকে আল্লাহ্র সামনে অবনত চিত্তে সপে দেয়া। ইসলামের মৌলিকত্বই হচ্ছে সর্বশক্তিমান ও একক সত্তা আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা।[১৫৫] এই বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহ্র অনুগত হওয়া, তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা; বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবনযাপন করার নামই হচ্ছে ইসলাম।[১৫৬] ইসলামের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র কাছে প্রকৃত অর্থে সমর্পিত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা এবং অনুগত হওয়া।

ইসলাম শব্দটি পবিত্র কুর'আনে প্রায় আটটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে ইসলামের কিছু প্রামাণ্য সংজ্ঞা দেয়া হলো। 'তাহযিবুল লুগাহ' গ্রন্থকার বলেছেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তা গ্রহণ করাই ইসলাম।"[১৫৭] 'আল ইসলামু উসূলুহু ওয়া মাবাদিউহু' নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার বলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশসমূহ প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেগুলোর অনুসরণ করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করাই ইসলাম।"[১৫৮] Mohammad Rafi-ud-Din ইসলাম সম্পর্কে তাঁর 'The Manifesto of Islam' বইতে বলেছেন, "Islam is the name of an ideology that has been taught by the Prophets from carliest known times."[১৫৯] আল্লামা জুরজানী বলেছেন, "ইসলাম হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে বশ্যতা স্বীকার করা।"[১৬০] ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, "ইসলাম হলো আল্লাহ্ তা'আলার আদেশসমূহের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা ও আনুগত্য পোষণ করা।"[১৬১] Kenneth

---

১৫৪ সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৮৮, পৃ. ৫১৪

১৫৫ ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ্, *দি ইমারজেন্স অব ইসলাম*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা-২০১২, পৃ. ১৫

১৫৬ সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৩৩

১৫৭ আবু মানসুর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ, *তাহযিবুল লুগাহ*, ১২তম খণ্ড, দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত-২০০১, পৃ. ৩১৩

১৫৮ মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন সালিহ, *আল ইসলামু উসূলুহু ওয়া মাবাদিউহু*, ২য় খণ্ড, ওযারাতিশ শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাতি ওয়াল আওক্বাফি ওয়াদ দা'ওয়াতি ওয়াল ইরশাদ, সৌদী 'আরব-১৪২১ হি., পৃ. ১০৫

১৫৯ Mohammad Rafi-ud-Din, *The Manifesto of Islam*, Islamic Book Service, 1st Edition, New Dellhi-1993, P. 1

১৬০ আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল জুরজানী, *কিতাবুত তা'রিফাত*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-১৯৮৩, পৃ. ২৩

১৬১ মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুর রহমান আল খামীস, *উসূলুদ দীন 'ঈনদা আবু হানীফা*, দারুস সামা'ঈ, সৌদী আরব-তা.বি., পৃ. ৪৩৫

W. Morgan সম্পাদিত 'Islam the Straight Path' বইতে ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Peaceful submission to the will of God without resistance."[১৬২] মু'জামু লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ আল মা'আছিরাহ নামক গ্রন্থে এসেছে, "ইসলাম হচ্ছে ঐশী ধর্ম, যা আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লমের নিকট প্রেরণ করেছেন, তা দৃঢ়ভাবে অন্তরে বিশ্বাস করার সাথে সাথে মুখে স্বীকৃতি দেয়া।"[১৬৩]

ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে পৃথিবীর মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইসলামকে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা একটি জীবনপদ্ধতি বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ ইসলাম একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন, যা সমস্যাসংকুল অন্ধকারাচ্ছন্ন এই পৃথিবীতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম।[১৬৪] মানবজীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চলমান ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতিক সব দিক ও বিভাগই ইসলামের আওতাভুক্ত।[১৬৫] তাই যারা ইসলামকে তাদের জীবনে চলার পথের পাথেয় হিসেবে পরিপালন করবে তারা মুসলিম বলে বিবেচিত হবে।[১৬৬]

ইসলাম মৌল দর্শনভিত্তিক একটি জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের জীবনকে পরিশীলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য সর্বোত্তম একটি ব্যবস্থা। যে জীবনব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগ ছাড়া মনুষ্য সমাজে প্রকৃত অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এটি এমন এক জীবনব্যবস্থা, যার মধ্যে বিশ্বজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ থাকার কারণে এটি মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান প্রদান করে।[১৬৭] আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে পছন্দনীয় একটি ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানবজাতির জন্য নির্ধারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "ইসলামই আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত জীবনবিধান।"[১৬৮] আর এই জীবনবিধানের আলোকে জীবন গড়লে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম কল্যাণ লাভ করা যায়। কারণ ইসলাম কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোত্র, রাষ্ট্র বা জাতির জন্য নয় বরং তা সকল সময়ের সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রয়োজন। এখানে কোনো ব্যক্তির পরিচয়, গায়ের রং,

---

[১৬২] Edited by Kenneth W. Morgan, *Islam the Straight Path,* Motilal Banarsidass, Delhi-1958, P. 3

[১৬৩] ড. আহমদ মুখতার, *মু'জামু লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ আল মা'আছিরাহ*, ২য় খণ্ড, 'আলিমুল কুতুব, বৈরুত-২০০৮, পৃ. ১১০০

[১৬৪] Maulana Muhammad 'Ali, *The Religion of Islam A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles and Practices of Islam,* The Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam, Lahore-1973, P. 3

[১৬৫] জেড. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা -১৯৯৮, পৃ. ৬৪

[১৬৬] Maulana Muhammad 'Ali, *The Religion of Islam A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles and Practices of Islam,* ibid, P. 1

[১৬৭] ibid, P. 9

[১৬৮] আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ১৯

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পদের অবস্থান– কোনো কিছুকেই বিবেচনায় না এনে কেবল মানবতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে সকল জাতিকে একত্রিত করা হয়েছে।[১৬৯] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত।"[১৭০]

আল্লাহ্র কাছে শর্তহীনভাবে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য করতে হবে। সেই আনুগত্য অবশ্যই ব্যক্তিগত, ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে হতে হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধান পরিপূর্ণ না মেনে কেবল কোনো একটি বা গুটিকতক বিধান মেনে চলার কোনো সুযোগ নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অনুগত থাকবে আর কিছু ক্ষেত্রে শয়তানের আনুগত্য করবে তা কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তা অবশ্যই ইসলাম নয়। আর যদি আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে শয়তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। যে শাস্তি মানুষ তার কল্পনা শক্তি দিয়েও অনুমান করতে পারবে না। তাই আল্লাহ্র ইচ্ছাশক্তির নিকট প্রশ্নাতীতভাবে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। আর এই পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ বা আত্মসমর্পণ করাই হচ্ছে ইসলাম।[১৭১] তাই সঠিকভাবে ইসলাম পালন করতে হলে আল্লাহ্র আদেশের প্রতি সর্বোত্তম ত্যাগে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। এই ত্যাগ এমন পর্যায়ের হতে হবে যে, প্রয়োজনে নিজের প্রিয় সকল সম্পদ, নিজের জীবন এমনকি প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকেও আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবানী করতে কুণ্ঠিত হওয়া যাবে না। এটাই হবে আল্লাহ্র প্রতি প্রকৃত আনুগত্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "বলুন! আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে, তাঁর কোনো শরীক নেই, আর আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলমান।"[১৭২] আর মুসলিমের কাজ হলো আল্লাহ্ তা'আলা যে হুকুম করেছেন তা অবনতচিত্তে পালন করা, যেগুলো নিষেধ করেছেন তা করা থেকে বিনা বাক্যে বিরত থাকা এবং তাঁর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনো হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, সালাত কায়িম করবে ও যাকাত দিবে, এটিই যথার্থ সত্য ও সঠিক দীন।"[১৭৩]

আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম দিয়েছেন মানবজাতির সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ও বিকাশ হওয়ায় এর পরিচয় তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দিতে সক্ষম হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে

---

[১৬৯] Maulana Muhammad 'Ali, *The Religion of Islam A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles and Practices of Islam*, ibid, P. 9

[১৭০] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ২১৩

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

[১৭১] Hammudah 'Abd al 'Ati, *Islam in Focus*, AL-FALAH FOUNDATION For Translation, Publication & Distribution, n.d., P. 20

[১৭২] আল কুর'আন, সূরা আল আন'আম: ১৬২-১৬৩

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

[১৭৩] আল কুর'আন, সূরা আল বাইয়্যিনা: ৫

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

বলেন, "ইসলাম হল, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা পালন করা এবং সামর্থ্য থাকলে বায়তুল্লাহ্তে গিয়ে হজ আদায় করা।"[১৭৪]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা মানবজাতির নিকট ইসলামের পুর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অবতীর্ণ করা ওহীর মাধ্যমে। এর মাধ্যমে মানুষ সব গোমরাহী থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ্র দাসত্ব ও আনুগত্য করতে পারে। ইসলাম মানবজাতির কল্যাণের জন্য আল্লাহ্র মনোনীত ও নির্দেশিত ধর্ম এবং জীবনদর্শন। তাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এতদসত্ত্বেও যারা আল্লাহ্র এই প্রেরিত ধর্মকে অস্বীকার করে অন্য কোনো ধর্ম বা জীবনদর্শনকে গ্রহণ করে ও অনুসরণ করে তাদের জন্য রয়েছে চরম ক্ষতিকর পরিণাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুকে পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করবে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১৭৫] আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন কোন ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা জাতিগত স্বার্থ লাভের কারণে ইসলামের নাম দিয়ে নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন বিষয় ইসলাম বলে প্রচার করে অনেক সরল ঈমানদারদের ঈমানকে কলুষিত করে আর তাদের নিজেদের ঈমানকেও ধ্বংস করে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, "হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ্র মধ্যে নতুন কিছু করে তা গ্রহণযোগ্য নয়, তা বাতিল।"[১৭৬] অন্য হাদীসেও বার বার ইসলাম অনুসরণের বাধ্যবাধকতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সবাই জান্নাতে যাবে সে ব্যক্তি ব্যতীত যে অস্বীকার করবে। প্রশ্ন করা হয়! কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যে আমাকে অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে সে অস্বীকার করবে।"[১৭৭]

ইসলাম মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। কারণ এতে রয়েছে ব্যক্তি জীবন শোধন ও গঠনের নির্দেশনা এবং মনুষত্ব বিকাশের উপাদান। রয়েছে টেকসই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের

---

[১৭৪] আবুল হুসাইন বিন আল হাজ্জাজ মুসলিম, *আস্ সহীহ*, ১ম খণ্ড, বাব মা'আরিফাতুল ঈমান ওয়াল ইসলাম ওয়াল ক্বদর, দারু ইহয়াইত তুরাস আল 'আরাবী, বৈরুত-১৪২২ হি., পৃ. ৩৬

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتُقيم الصلاة، وتُؤتِي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعتَ إليه سبيلًا.

[১৭৫] আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ৮৫

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

[১৭৬] ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, কিতাব আল আকদিয়াহ, বাবু নাকদুল আহকামিল বাতিলাহ ওয়া রাদ্দু মুহাদ্দিসাত, মাকতাবাতুর রুশদি, রিয়াদ-২০০১, পৃ. ৪৪৮

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

[১৭৭] মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৯ম খণ্ড, বাব আল ইকতিদায়ি বিসুন্নাতি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দারু তুওকীন নাজাত, বৈরুত-১৪২২ হি., পৃ. ৯২

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قالوا يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى).

নিশ্চয়তা। আরো আছে অর্থনৈতিক সমস্যার সঠিক সমাধান এবং উন্নত রাজনৈতিক জীবনের নিশ্চয়তা। মোটকথা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে জীবন-যাপনের জন্য একজন মানুষের যে নিয়মনীতি প্রয়োজন তার সবকিছুই ইসলামে বিদ্যমান। এমনকি অনাগত যুগের ও মানুষের নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান দিতেও সক্ষম ইসলাম। তাই ইসলাম হচ্ছে একটি সত্য, সরল ও সহজ কল্যাণকর জীবনদর্শন বা একটি পথ। এ পথেই মানুষের যাবতীয় কল্যাণ রয়েছে। এখানে রয়েছে ধনী, দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষের নিজ নিজ অবস্থানের মর্যদাপূর্ণ অধিকার। যদি কেউ এই জীবন পথকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করতে পারে তবে তার জন্য এটি পালন করা যেমন সহজ, তেমনি এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করাও অত্যন্ত সহজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "আর এ পথই আমার সরল পথ। অতএব, এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।"[১৭৮] আর ইসলামের পরিচয় সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "ইসলাম হলো, তোমার হৃদয় যা আল্লাহ্র প্রতি সমর্পিত হবে এবং মুসলমানগণ তোমার জিহ্বা ও হাত হতে নিরাপদ থাকবে।"[১৭৯] সুতরাং সর্বদা প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলতে হবে। কোনোভাই তা অমান্য করা যাবে না। যদি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলা যায় তবে সকল স্তরে মানুষের স্ব স্ব অবস্থানে তাদের অধিকার সংরক্ষিত হবে। কোনো ভাবেই কারো অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না, বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে সমাজের অবহেলিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে সামর্থ্যবান সকলেই সচেষ্ট হবে।

---

[১৭৮] আল কুর'আন, সূরা আল আন'আম: ১৫৩

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

[১৭৯] আবু নায়ীম আহমদ ইব্ন আব্দুল্লাহ, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দারুল ওয়াতানি লিন নাশর, রিয়াদ-১৯৯৮, পৃ. ৩০৭৪

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تسلم قلبك ويسلم المسلمون من لسانك ويدك

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামের মৌলিক উৎস

ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরিত এক দীন, এক জীবনব্যবস্থা। ইসলাম ভিন্ন আর কোনো জীবনব্যবস্থা মানবজাতির কল্যাণের জন্য সার্বিক সমাধান দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ ইসলামের মধ্যেই মানব জাতির সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। ইসলামই সমাজে ধনী-দরিদ্রের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে কল্যাণময় সমাধান প্রদান করে। এজন্য ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবে বিবেচিত করা ঠিক হবে না বরং এটি মানবসমস্যার সমাধানের একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর তাই ইসলামকেই কেবল সর্বক্ষেত্রে মান্য করা উচিত। কারণ ইসলামের মৌলিক উৎস হচ্ছে, পবিত্র কুর'আন (যা মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন) এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্সমূহ (যা তিনি বলেছেন, করেছেন এবং কেউ কোনো কিছু করলে তার অনুমোদন দিয়েছেন)। এ দু'টি ছাড়া আর কোনো কিছুই ইসলামের মৌলিক উৎস নয়। ইসলামের মৌলিক উৎস হিসেবে আল কুর'আন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ নির্ধারণ করে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বিদায় হজের ভাষণে বলেন, "আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন এ দুটিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার সুন্নাহ্।"[১৮০] তাঁর এ ঘোষণায় ইসলামের মৌলিক উৎস হিসেবে এ দু'টি উৎসকেই নির্দেশ করে। এজন্য এ দু'টি উৎসকেই কেবল ইসলামের মৌলিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত ঘোষণাটিকে দালিলিক সত্যায়ন করে বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[১৮১]

প্রথম অনুচ্ছেদঃ পবিত্র আল কুর'আন

কুর'আন (قُرْآنٌ) আরবি শব্দ। এর অর্থ পাঠ্য বা পঠন। কুর'আন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পঠিত আসমানি কিতাব সেজন্য একে কুর'আন বলা হয়।[১৮২] ইমাম শাফি'ঈ (রহ.)-এর মতে, আল-কুর'আন শব্দটি কুর'আন মাজীদের নাম (المعرف) এটি (مشتق) (ধাতু থেকে উৎপন্ন) বা (مهموز) নয়।[১৮৩]

---

[১৮০] আবু 'আব্দুল্লাহ আল হাকিম আন নিশাপুরী, *আল মুসতাদরাক আস সাহীহাইন*, ১ম খণ্ড, বাব ফা আম্মা হাদিছু আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমাইর, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-১৪১১ হি., পৃ. ১৭৬

قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

[১৮১] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ৩

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

[১৮২] ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০১৯, পৃ. ৪২১

[১৮৩] ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *'উলূমু'ল-কুর'আন*, প্রথম খণ্ড, আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া (তৃতীয় মুদ্রণ), ঢাকা-২০০৮, পৃ. ৮

কুর'আন শব্দের বিশ্লেষণ করে ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহ.) লিখেছেন, (قرء) ধাতু থেকে কুর'আন শব্দটির উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ- একত্র করা, জমা করা। আল্লামা যারকানী (রহ.) লিখেছেন, (قرآن) শব্দটি আসলে (قراءة) শব্দের মতোই 'পাঠ করা'র অর্থে মূলধাতুর অন্তর্গত একটি রূপ।[১৮৪] আল্লামা যারকানী (রহ.) তারপর লিখেন, 'আরবি ব্যাকরণের মূলনীতি অনুসারে শব্দের মূল ধাতুর রূপ অনেক সময় কর্মবাচক বিশেষ্যের অর্থ প্রদান করে। এই অর্থেই পবিত্র এই গ্রন্থের জন্য কুর'আন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ অনুযায়ী কুর'আন শব্দের অর্থ দাঁড়ায় পঠিত গ্রন্থ।'[১৮৫]

পবিত্র কুর'আন ইসলামের মৌলিক প্রধান ও প্রথম উৎস, যা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন।[১৮৬] এই কিতাব আল্লাহ্ তা'আলা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "বরং এটা মহান কুর'আন, লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত।"[১৮৭] যা পর্যায়ক্রমে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যার শুভ সূচনা হয়েছিল নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হেরা গুহায় সর্বপ্রথম আয়াত নাযিলের মাধ্যমে।[১৮৮] এ কুর'আনের মধ্যে রয়েছে মানবজাতির সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক অবস্থান এবং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মৌলিক বিবরণ। এর ধারাবাহিকতায় সময়ের প্রয়োজনে ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ ২৩ বছরব্যাপী পবিত্র কুর'আন নাযিল হয়। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থে রয়েছে মানুষের জন্য আকীদা-বিশ্বাস, হুকুম-আহকাম, মু'আমালাত-আদবসহ সব বিষয়ের মূলনীতি। যা মানুষ ভালোভাবে জেনে তা মানার মাধ্যমে তার চলার পথ নির্ভেজাল করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের সৃষ্টি ও তার পরিচয়, সমগ্র বিশ্বজগতের প্রয়োজনীয় বিবরণ, মানুষের পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশের কথা, রয়েছে আখিরাতের পুরস্কার ও আযাবের কথা এবং সর্বোপরি, আল্লাহ্র পরিচয়। যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্কে ইবাদাত করার আদেশ, উপদেশ ও নিষেধসহ প্রয়োজনীয় সকল কিছুর সঠিক নির্দেশনা। আর কুর'আনের মধ্যে রয়েছে মানবজীবনকে পরিশীলিত ও পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও অধ্যাদেশ।[১৮৯] যা মানবজাতির জন্য এক অপরিবর্তিত রূপরেখা। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আন মূলত মানুষকে পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ করেছেন।

কুর'আন মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার একমাত্র মাধ্যম। আর এ কুর'আন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত, যা সঠিক পথের সন্ধান দেয় এবং তাতে

---

১৮৪ মুফতি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, দারুল কিতাব, ঢাকা-২০০০, পৃ. ২৫

১৮৫ প্রাগুক্ত

১৮৬ ড. মুহাম্মাদ রফীকুর রহমান মাদানী, *ইসলামী আকীদাহ তাওহীদ শির্ক বিদ'আত*, সবুজপত্র পাবলিকেশন, ঢাকা-২০১৮, পৃ. ৪৫

১৮৭ আল কুর'আন, সূরা আল বুরুজ: ২১-২২

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ - فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

১৮৮ Maulana Muhammad 'Ali, ibid, P. 21

১৮৯ ibid, P. 15

আছে নিশ্চিত মহা কল্যাণ, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "এ কিতাবটি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।"[১৯০] এ কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রদানের জন্য অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। যার মাধ্যমে মানুষ প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে থেকে অন্যের অধিকার প্রদান করতে পারে। কারণ এসব কিছুই পরিপালন করাই হলো আল্লাহ্র ইবাদাত করা। আল্লাহ্ এ কুর'আন নাযিল করেছেন মানুষকে বুঝানোর জন্য, যাতে মানুষ তা ভালোভাবে বুঝে আল্লাহ্র ইবাদাত করতে পারে। তাই তো আল্লাহ্ তৎকালীন আরববাসীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, "আমি কুর'আন আরবি ভাষায় নাযিল করেছি, যাতে তোমরা একে ভালোভাবে বুঝতে পারো।"[১৯১] এ কুর'আন ভালোভাবে বুঝে বাস্তবায়ন করতে পারলে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র আলোকিত হয়ে যাবে, যেখানে মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর আমরা নাযিল করি কুর'আন, যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত, কিন্তু তা জালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"[১৯২]

কুর'আন এমন একটি নিখুঁত ও নির্ভেজাল কিতাব, যা লক্ষ-কোটি বার চেষ্টা করেও একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কারো পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, "বলুন, যদি মানব ও জিন একত্রিত হয়ে এই কুর'আনের অনুরূপ রচনা করে নিয়ে আসার চেষ্টা করে এবং এ কাজে তারা পরস্পরের সহযোগীও হয়, তবু তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।"[১৯৩] আর কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ লক্ষ-কোটি বার চেষ্টা করেও এই কিতাবে কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ নিজেই এই কিতাব সংরক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, "এতে বাতিল অনুপ্রবেশের কোনো সুযোগ নেই, না সামনের দিক থেকে, না পেছনের দিক থেকে, এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহ্র পক্ষ হতে অবতীর্ণ।"[১৯৪]

নির্ভেজাল এ কিতাবটি মানুষের প্রতি এজন্য নাযিল করা হয়েছে, যাতে মানুষ তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে নিজেদের মধ্যে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং ন্যায়বিচার করতে হলে কুর'আন অনুযায়ী করতে হবে। কারণ কুর'আন ন্যায়বিচার করার একক মানদণ্ড, কুর'আন ছাড়া অন্য কিছুই সঠিকভাবে মানুষের মাঝে

---

[১৯০] আল কুর'আন, সূরা আস সাজদাহ: ২

تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

[১৯১] আল কুর'আন, সূরা ইউছুফ: ২

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

[১৯২] আল কুর'আন, সূরা বনী ইসরাঈল: ৮২

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

[১৯৩] আল কুর'আন, সূরা বনী ইসরাইল: ৮৮

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

[১৯৪] আল কুর'আন, সূরা হা-মীম আস সাজদাহ: ৪২

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতি এ সত্য কিতাব নাযিল করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী ও সেগুলোর বিষয়বস্তুর সংরক্ষক, কাজেই তুমি আল্লাহ্র নাযিল করা আইন অনুযায়ী লোকদের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা কর।"[১৯৫]

কুর'আন মানুষকে সোজা ও সত্য ন্যায়ের পথে ডাকে, যে পথে মানবজাতির জন্য শুধু কল্যাণই রয়েছে আর রয়েছে হিদায়াত। অন্যদিকে যারা এ কুর'আনের সঠিক ও সরল পথকে পাশ কাটিয়ে অথবা অস্বীকার করে নিজেদের মনগড়া মতো চলবে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন সতর্কবার্তা, উপদেশ ও সর্বোপরি কঠিন শাস্তি। তাই আল্লাহ্ বলেন, "আসলে এ কুর'আন এমন পথ দেখায়, যা একেবারেই সোজা, যারা একে নিয়ে ভালো কাজ করতে থাকে তাদেরকে সে সুখবর দেয় এ মর্মে যে, তাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে।"[১৯৬] আল কুর'আন মানুষের হিদায়াতের জন্য একটি সতর্কবাণী, পথনির্দেশক ও উপদেশ বাণী সম্বলিত একটি কিতাব। সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "এটি মানবজাতির জন্য একটি সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ।"[১৯৭] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন, "কত বরকতময় তিনি! যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে করে তা বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হয়।"[১৯৮] এভাবে কুর'আনের মাধ্যমে সতর্ক হয়ে কুর'আন অনুযায়ী আল্লাহ্র ইবাদাত করতে হবে। কারণ কুর'আন মানবজাতির সকল কিছু নিয়ে আলোচনা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আমি তোমাদের নিকট এমন এক কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে রয়েছে তোমাদেরই সকল আলোচনা, তবুও তোমরা কি বুঝবে না?"[১৯৯]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্

ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্।[২০০] সুন্নাহ (سنة) রীতি, নিয়ম, পথ ইত্যাদি। পরিভাষায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেসব কথা ও কাজকর্মের বিবরণ এবং কার্যকলাপের অনুমোদন যা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, তাকে সুন্নাহ্ বলা হয়।[২০১] পরিভাষায় হাদীস শব্দটিও সুন্নাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাদীস-এর

---

[১৯৫] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ৪৮
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ

[১৯৬] আল কুর'আন, সূরা বনী ইসরাঈল: ৯
إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

[১৯৭] আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ১৩৮
هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

[১৯৮] আল কুর'আন, সূরা আল ফোরকান: ১
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

[১৯৯] আল কুর'আন, সূরা আল আম্বিয়া: ১০
لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

[২০০] Maulana Muhammad 'Ali, ibid, P. 50

[২০১] ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭০

অভিধানিক অর্থ নতুন কথা বা বস্তু। এর বিপরীত শব্দ কাদীম তথা পুরাতন। হাদীস শব্দের আরেক অর্থ কথা বা বাণী। পরিভাষায়, হাদীস বলতে বুঝায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, মৌন সম্মতি এবং তাঁর গুণ, এমনকি সর্বাবস্থায় তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড এর অন্তর্ভুক্ত।[২০২] ইমাম রাগিব ইস্পাহানী হাদীস শব্দের বিশ্লেষণে বলেন, "হাদীস আর হুদুস বলতে বুঝায়, কোনো একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা, তা কোনো মৌলিক বা অমৌলিক জিনিস হোক না কেন। আর মানুষের নিকট শ্রবণেন্দ্রীয় বা ওহীর সূত্রে নিদ্রায় বা জাগরণে যে কোনো কথা পৌঁছায়, তাকেই হাদীস বলা হয়।" অন্যখানে তাঁর মতে, "উচ্চতর জগৎ হতে কোন ব্যক্তির মধ্যে যা কিছু আবির্ভাব হয় তাই হাদীস।"[২০৩]

অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ হাদীস ও সুন্নাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য করেন না। তবে উভয়ের মধ্যে কেউ কেউ পার্থক্য করেন এভাবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মসমূহ সামগ্রিকভাবে দুই প্রকার। এক. যেগুলোর অনুসরণ বৈধ; দুই. যেগুলোর অনুসরণ নিষেধ। অনুসরণ নিষেধ বলতে- যে কাজের অনুকরণ করতে স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তা তিনি করে থাকলেও কাজটি তাঁর সাথে নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এ ধরনের কাজের অনুসরণ উম্মতের জন্য বৈধ নয়। যেমন- নয় (০৯) জন স্ত্রীকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ রাখা, খচ্চরেরর উপর আরোহন করে তাওয়াফ করা, অনবরত রোযা রাখা। অতএব, হাদীস শব্দ রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, মৌন সম্মতি, অনুকরণ বৈধ ও অনুকরণ নিষিদ্ধ সব ধরনের কাজ অন্তর্ভুক্ত করে। আর সুন্নত শব্দটি শুধু অনুকরণ বৈধ বা আমলযোগ্য কাজগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং প্রতিটি সুন্নত হাদীস বটে; কিন্তু প্রতিটি হাদীস সুন্নত নয়। উভয়ের আম-খাস মুতলাক সম্বন্ধ। প্রতিটি হাদীস আমলযোগ্য নয়। আর সুন্নত শুধু আমলযোগ্য কাজগুলোকেই বলে।[২০৪]

আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে মানবজাতিকে হিদায়াতের জন্য বিভিন্ন জাতিতে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তার ধারাবাহিকতায় হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বের সব মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করে মানবজাতির শিক্ষক হিসেবে নির্ধারণ করে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন, "আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই

---

[২০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮৩

[২০৩] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, খায়রুন প্রকাশনী, (১৫ প্রকাশ) ঢাকা-২০১২, পৃ. ২০

[২০৪] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইদ্‌রীছ কাছেমী, কাশফুল বারী শরহুল বুখারী, ১ম খণ্ড, (বাংলা অনুবাদ-সম্পাদনা পরিষদ), ইদ্‌রীছিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ঢাকা-১২১৬, পৃ. ৮৬-৮৭

নিপতিত ছিল।"[২০৫] আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করে তাঁর উপর পবিত্র কুর'আন নাযিল করেন, যা মানবজাতির হিদায়াতের একমাত্র পাথেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "হে মুহাম্মাদ! এটি একটি কিতাব, তোমার প্রতি এটি নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসো পরাক্রান্ত প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে, তাঁরই পথের দিকে।"[২০৬]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রেরিত ইসলামকে পৃথিবীতে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুর'আন প্রদান করার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ দিয়েছেন। যা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরিত পরোক্ষ ওহী। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ওহীগুলোকে মানুষের মাঝে প্রচার করার কথা বলেছেন, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর। যদি তা না কর তবে তুমি আল্লাহ্র বার্তা প্রচার করলে না।"[২০৭] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন, "হে নবী! যখন তুমি তাদের সামনে কোনো নিদর্শন (অর্থাৎ মু'জিযা) না নিয়ে যাও তখন তারা বলে, তুমি নিজের জন্য কোনো নিদর্শন বেছে নাওনি কেন? তাদের বলে দাও, আমি তো কেবল সেই ওহীরই আনুগত্য করি, যা আমার রব আমার কাছে পাঠান। এটি তো অন্তরদৃষ্টির আলো তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এবং হিদায়াত ও রহমত তাদের জন্য, যারা এর প্রতি আস্থা স্থাপন করে।"[২০৮] পরিত্র কুর'আন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সরাসরি ওহী আর রাসূলের সুন্নাহ্ হলো আল্লাহ্ কর্তৃক পরোক্ষ ওহী। সবগুলোই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী। কুর'আনের ব্যাখ্যা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্। এ প্রসঙ্গে রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমাকে পবিত্র কুর'আন ও তার সাথে তার অনুরূপ একটি বিষয় দেয়া হয়েছে।"[২০৯] এজন্য সুন্নাহ্কে কখনো খাটো করে বা গুরুত্বহীন করে দেখার অবকাশ নেই বরং সুন্নাহ্কে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে পরিপালন করার চেষ্টা করতে হবে। এই সুন্নাহ্ দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে

---

[২০৫] আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ১৬৪
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

[২০৬] আল কুর'আন, সূরা ইব্রাহীম: ১
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

[২০৭] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ৬৭
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ

[২০৮] আল কুর'আন, সূরা আল আ'রাফ: ২০৩
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

[২০৯] আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আমর আল আযদী, *আস্ সুনান*, ৪র্থ খণ্ড, আউলু কিতাবিস সুন্নাহ, বাবুন ফী লুযূমিস সুন্নাহ্, আল মাকতাবাতু আসরিয়্যাহ, বৈরুত, তা.বি., পৃ. ২০০
قَالَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم : " أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ"

বলেন, "আর আমি তোমাকে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি।"[২১০] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি।"[২১১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর সুন্নাহ্সমূহ সাহাবায়ে কিরাম (রা.) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজেদের মধ্যে বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন। তৎপরবর্তী সময়ের ধারাবাহিকতায় তাবেয়ী এবং তাবে-তাবেয়ীগণও সে ধারা অব্যাহত রাখেন। যার ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্সমূহ কালের বিবর্তনে হারিয়ে যায় নি বরং তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অক্ষুণ্ন রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্সমূহ যাতে কালের বিবর্তনে হারিয়ে না যায় এজন্য তাঁর সুন্নাহ্সমূহ খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্গুলোর বিশুদ্ধতার জন্য বর্ণনাকরীদের থেকে তাঁর পর্যন্ত সনদের ধারাবাহিকতার বাধ্যবাধকতা রক্ষা করা হয়েছে এবং বর্ণনাকারীদের সকল চারিত্রিক বিশ্বস্ততার বিষয়ে যথেষ্ট সর্তকতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাছাই করা হয়েছে। অতঃপর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মানোত্তীর্ণ বর্ণনাকরীদের বর্ণনানুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, অনুমোদন ও গুণাবলীসমূহ তৎপরবর্তী মানুষের হিদায়াতের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যা কালের প্রবহমান ধারার পরিবর্তনেও নিজের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখে সময়ের ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যৎ মানুষদেরকে কল্যাণ ও মুক্তির পথে চলতে পাথেয় হিসেবে কাল থেকে কালান্তরে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই সর্বাস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্সমূহ ইসলামের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে নির্ধারিত হয়ে আছে, যা পবিত্র আল কুর'আন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। এজন্য পৃথিবীতে আল্লাহ্র আদেশ মান্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হওয়ার জন্য পবিত্র কুর'আন এবং সুন্নাহ এর অনুসরণ করে জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে হবে। কারণ এ দু'টির সমন্বিত রূপই হলো ইসলাম।

---

[২১০] আল কুর'আন, সূরা আল আম্বিয়া: ১০৭

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

[২১১] আল কুর'আন, সূরা সাবা: ২৮

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামের ভিত্তি

আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির কল্যাণের জন্য দিয়েছেন ইসলাম। এটি পাঁচটি স্তম্ভ বা বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা পালন করার মাধ্যমে একজন মানুষ পৃথিবীতে ও আখিরাতে মুসলিম হিসেবে পরিগণিত হয়। সেগুলো হলো: কালেমা, সালাত, যাকাত, সাওম এবং হজ। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস,

> *ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। ১) কালেমা (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান), ২) সালাত কায়িম করা, ৩) যাকাত দেয়া, ৪) হজ করা এবং ৫) রামাদন এর সিয়াম পালন করা।"*[২১২]

প্রথম অনুচ্ছেদঃ কালেমা

ইসলামের প্রথম ভিত্তি হলো কালেমা তথা (لاإله إلا الله محمد رسول الله)। কালেমা একজন মানুষের ইসলামে প্রবেশের প্রথম একমাত্র পথ। যা ছাড়া কোনোভাবেই একজন মানুষ মুসলিম হতে পারে না।[২১৩] কালেমাই হলো ঈমানের একমাত্র শর্ত। আর ঈমান হচ্ছে সকল আমলের মূল। আর আমলের মাধ্যমেই মুসলিমের সামগ্রিক পরিচয় ফুটে উঠে।[২১৪] ইসলামী জীবনদর্শনের প্রথম ভিত্তি হলো ঈমান। ঈমান হলো পূর্ণাঙ্গ এবং সামগ্রিক জীবনদর্শন। তাই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতবাদ রয়েছে।[২১৫]

(إيمان) আরবি শব্দমূল আলিফ, মীম, নূন (أ-م-ن)। আম্ন ও আমানাহ শব্দদ্বয় একই ধাতু থেকে উৎপন্ন। অর্থ-দৃঢ় বিশ্বাস। আমন হলো 'খাওফ' বা ভীতির বিপরীত এবং আমানাহ (বিশ্বস্ততা) খিয়ানত (আসাধুতা)-এর বিপরীত। আম্ন শব্দমূলের-এর মাসদার হিসেবে ঈমান শব্দ দ্বারা নিরাপত্তা বিধান করা কিংবা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং যাওয়ালুল-খাওফ বা ভয়

---

[২১২] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ১ম খণ্ড, কিতাবুল ঈমান, বাব আল ঈমান ওয়া কাওলিন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুনিয়াল ইসলাম 'আলা খামস্, দারু ইবন কাছীর, বৈরুত-১৯৮৭, পৃ. ১২

عن ابن عمر رضي الله عنه قال. قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ".

[২১৩] মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নো'মানী (রহ.), *ইসলাম কি ও কেন*, মাকতাবাতুল আশরাফ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা-২০০৮, পৃ. ২০

[২১৪] Afzalur Rahman, *Islam Ideology and the Way of Life*, (The Muslim School Trust London, First Published, London-1980), Publishid in Malaysia by A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, n.d., P. 4

[২১৫] জেড. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

দূর করাও হয়।[২১৬] আম্‌ন শব্দমূলটি পবিত্র কুর'আনে বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্যতম। সেখানে ঈমান অর্থ কখনো আমল, কখনো বিশ্বাসের সারমর্ম বা সারবস্তু, কখনো একত্রে উভয় অর্থ প্রকাশ করে। ইমাম রাগিব ইস্পাহানি (রহ.)-এর মতে, "ইযআনুন-নাফস লিল-হাক্ক আলা সাবীলিত-তাসদীক" অর্থাৎ "আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে কোনো ব্যক্তির সত্যের স্বীকৃতি প্রদান এবং এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে ঈমান বলে।"[২১৭]

কালেমার মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেকে পরিপূর্ণ সমর্পণ করে মুসলিম বলে পরিচিতি লাভ করে।[২১৮] কিন্তু যারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে মনে করে অথচ তারা পরিপূর্ণ আনুগত্য সহকারে আমল করে না তারা প্রকৃত মুসলিম বলে বিবেচিত হয় না।[২১৯] মূলত কালেমা একটি শপথ ও অঙ্গীকার। তাই কালেমাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে এবং মুখে স্বীকৃতি দিয়ে একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়। কালেমাতে প্রথমেই 'লা ইলাহ (لاإله)' বলে দুনিয়ার সকল ভ্রান্ত মাবুদকে অস্বীকার করা হয়েছে, অতঃপর বলা হয়েছে, 'ইল্লাল্লাহ (إلا الله)' অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত। অর্থাৎ কালেমাতে প্রথমেই পৃথিবীর সকল ইলাহকে অস্বীকার করে শুধু আল্লাহ্‌কে ইলাহ হিসেবে মেনে নেয়ার শপথ করা হয়েছে। যেমন, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে, ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য হিসেবে, প্রভু হিসেবে, রিযিকদাতা হিসেবে, তাকদীর অর্থাৎ ভাগ্য নির্ধারণকারী হিসেবে। সর্বোপরি, সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান মালিক বা রব হিসেবে তাঁকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব মালিক বা রবকে অস্বীকার করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল মেনে নেয়া হয়েছে। যদি এর কোনো ব্যত্যয় কেউ করে তাহলে তার কোনো ঈমান থাকবে না বরং সে কুফরীর মধ্যে নিপতিত হবে। এই কালেমার মাধ্যমে সকল ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে দুনিয়ার মানবসৃষ্ট সকল সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তাদেরকে বলো, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করছো, যার কোনো ক্ষমতা নেই তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার? আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[২২০] অন্যত্র আল্লাহ্ আরো বলেন, "বলো, সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারাধীন, আসমান ও যমীনের বাদশাহীর মালিক তিনিই, তারই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।"[২২১] আরো বলা হয়েছে, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাদশাহীর

---

[২১৬] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৭২৯

[২১৭] ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

[২১৮] Afzalur Rahman, *Islam Ideology and the Way of Life*, ibid, P. 1

[২১৯] ibid, P. 1

[২২০] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ৭৬

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

[২২১] আল কুর'আন, সূরা আয যুমার: ৪৩-৪৪

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ্, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, আল্লাহ্ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"[২২২]

কালেমা, (لاإله إلا الله محمد رسول الله) যার অর্থ হলো "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল।" এই অঙ্গীকারটি এমন যে, আমৃত্যু এই শপথের উপর অটুট থাকতে হবে, কোনো অবস্থাতেই এই অঙ্গীকারের বিন্দু পরিমাণ ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। এই কালেমাতে দু'টি অংশ অন্তর্ভুক্ত; একটি অংশ হলো (لاإله إلا الله)-এর উপর সাক্ষ্য প্রদান করা। এখানে আল্লাহ্র একত্ববাদের উপর ঘোষণা করা হয়েছে "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো সত্য মা'বুদ নেই"। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের আল্লাহ্ এক ও একক, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি দয়াবান ও করুণাময়।"[২২৩] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "নিঃসন্দেহে এটা নির্ভুল সত্য বিবরণ, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তিনি তো পরম পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২২৪] কালেমার মৌলিক দাবি হচ্ছে, এক আল্লাহ্ এবং তিনি সকল কিছুর অধিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক দুনিয়া এবং আখিরাতে, কিন্তু যারা একথা মানবে না তারা কখনো ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকতে পারবে না এবং তারা ইসলামে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ বলেন, "এক ইলাহ্ই তোমাদের আল্লাহ্, কিন্তু যারা আখিরাতে ঈমান আনে না তাদের অন্তর অস্বীকারকারী এবং তারা অহংকারী।"[২২৫]

আরেক অংশ হলো (محمد رسول الله) মানবকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্র রাসূল হিসেবে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়ে সর্বাস্থায় তাঁকে অনুসরণ করা। তাঁর সব বলা কথা, প্রদানকৃত নির্দেশ ও কাজকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। তিনি যা আদেশ ও নিষেধ করেন তা বিনা বাক্যে প্রতিপালন করা। কারণ তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তাঁকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াত তাদের নিকট পড়ে শোনান, তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং কিতাব ও হিকমাহ তাদেরকে শিক্ষা দেন এবং এমন সব কথা শুনান, যা তারা জানতো না।"[২২৬] অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আল্লাহ্ তোমার ওপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন, এমন

---

[২২২] আল কুর'আন, সূরা আল ফাত্হ: ১৪
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

[২২৩] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ১৬৩
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

[২২৪] আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ৬২
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

[২২৫] আল কুর'আন, সূরা আন নাহ্ল: ২২
إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ

[২২৬] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ১৫১
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

সব বিষয় তোমাকে শিখিয়েছেন, যা তোমার জানা ছিল না এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অনেক বেশি।"[২২৭] তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল ও আল্লাহ্‌র বান্দা– এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তিনি যে সত্য নবী এবং তাঁর উপর যে ওহী নাযিল হয় সে ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যারা তা করবে না তাদের জন্য রয়েছে খুবই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাই এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা ঈমান আনেনি এমন কাফেরদের জন্য আমি দাউ দাউ করে জ্বালা অগ্নিকুণ্ডলী তৈরি করে রেখেছি।"[২২৮]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ সালাত (নামায)

(صلوة) সালাত আরবি শব্দ। এর অভিধানিক অর্থ হলো দু'আ করা, কারো দিকে মুখ করা, অগ্রসর হওয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দয়া করা, দরূদ পাঠ করা, রহমত, ইসতিগফার ইত্যাদি। শরী'আতের পরিভাষায়, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত বিশেষ একটি 'ইবাদাত যা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত বিধি-বিধান মুতাবিক রুকু-সিজদা সহকারে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করা হয়, তাকে সালাত বলা হয়।[২২৯] সালাত শব্দটি (ص-ل-و) অথবা (ص-ل-ي) শব্দমূল থেকে গঠিত। এর আভিধানিক অর্থ দু'আ, ইসতিগফার, তাসবীহ, রহমত, অনুগ্রহ, ক্ষমা, দয়া ও করুণা কামনা ইত্যাদি। ইসলামী বিশ্বকোষে আছে- সালাত শব্দটি কুর'আনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৩০] দু'আ অর্থে- "তুমি তাদেরকে দু'আ করবে। তোমার দু'আ তাদের জন্য চিত্তস্বস্তিকর।"[২৩১] অনুগ্রহ করা অর্থে- "আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ; তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"[২৩২] রহমত বা করুণা অর্থে- "এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে করুণা বর্ষিত হয়।"[২৩৩] উপাসনালয় অর্থে- "বিধস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সংসার বিরাগীদের গীর্জা, ইহুদীদের সিনাগ ও মসজিদসমূহ।"[২৩৪]

---

[২২৭] আল কুর'আন,সূরা আন নিসা: ১১৩
وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

[২২৮] আল কুর'আন, সূরা আল ফাত্হ: ১৩
وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا

[২২৯] ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৪

[২৩০] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৪শ খণ্ড (২য় ভাগ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৯, পৃ. ১১২

[২৩১] আল কুর'আন, সূরা তাওবা: ১০৩
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

[২৩২] আল কুর'আন, সূরা আল আহযাব: ৫৬
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

[২৩৩] আল কুর'আন, সূরা বাকারাহ: ১৫৭
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

[২৩৪] আল কুর'আন, সূরা আল হজ: ৪০
لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ

ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী (রহ.) বলেন, "সালাত হলো বিশেষ ইবাদাত যা মৌখিকভাবে দু'আ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।"[২৩৫] ইব্ন মানযুর আল-ইফরীফী (রহ.) বলেন, "সালাত শব্দের অর্থ দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।" এছাড়াও শব্দটি (التعظيم) 'সম্মান করা' বা (التبرك) 'বরকত পাওয়া' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। পরিভাষায়, "সালাত বলতে নিয়াত সহকারে নির্দিষ্ট শর্তানুযায়ী এমন কিছু কথা ও কাজের সমষ্টিকে বুঝায় যা তাকবীরের মাধ্যমে শুরু করা হয় এবং সালাম দ্বারা শেষ করা হয়।" সায়্যিদ শরীফ আল-জুরযানী (রহ.) বলেন, "শরী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট রুকন ও যিকিরসমূহকে বিশেষ পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করাকে সালাত বলা হয়।" তাই বলা যায়, ঈমান আনার পরে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ওয়াক্তে নির্দিষ্ট কিছু রুকন, শর্ত, ওয়াজিব পালনের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে যে ইবাদাত করা বান্দার উপর অবশ্যই পালনীয়, তাই সালাত।[২৩৬]

ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে সালাত (নামায) হলো দ্বিতীয় রুকন। এটি একটি ফরয[২৩৭] ইবাদাত। যে ব্যক্তি কালেমা মুখে পাঠ করে অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে সে মুসলিম হিসেবে পরিগণিত হয়। এরপর তার উপর সালাত আবশ্যিক হয়ে যায়। আমৃত্যু তাকে এই সালাত আদায় করে যেতে হবে। সালাত এমন একটি ইবাদাত যার মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহ্র সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র সামনে অবনত চিত্তে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করে। সালাত আদায়ের সময় বান্দা সব অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্র বড়ত্ব, মহত্ত্বের সামনে নিজেকে সঁপে দিয়ে তাঁর মহান দরবারে মাথা নত করে। সালাত আদায়ের জন্য প্রতিটি মুসলিমকে পাক-পবিত্র হতে হয়। সালাত আদায়ের স্থানটিও পাক-পবিত্র হতে হয়। এক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল কিছু হতে মুক্ত থেকে শুধু আল্লাহ্র নিকট নিজেকে সমর্পণ করে ধীরচিত্তে কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতে হয়। এভাবে বিনয় সহকারে সালাত আদায়ের ফলে সালাত আদায়কারীর অন্তর আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট হয়। সালাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"[২৩৮]

---

[২৩৫] ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৫

[২৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৬

[২৩৭] ফরয (فرض) ইসলামী শরী'আতের একটি বিশেষ পরিভাষা, শব্দটি বিভিন্নরূপে এবং বিভিন্ন অর্থে কুর'আনে ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ নির্ধারণ করা, বাধ্যতামূলক করে দেয়া, অনুমান করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় যা করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা অবশ্য করণীয় এবং যা করতে অস্বীকার করলে কাফির বলে পরিগণিত হয় এবং যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। আর অন্যদিকে তা পালনকারীদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। ইসলামী বিধান মতে, ফরয দুই প্রকার: ফারদু'ল-'আইন ও ফারদু'ল-কিফায়া। প্রথম ফরয শরী'আতের কোনো উযর ছাড়া সকল নারী-পুরুষের আদায় করা বাধ্যতামূলক, কোনোভাবেই তা থেকে বিরত থাকা যাবে না। যে সালাত, যাকাত, রোযা, হজ প্রভৃতি ইবাদাত। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন ফরয যা সকল মুসলমানদের করণীয়, কিন্তু ন্যূনপক্ষে কয়েকজন সম্পন্ন করলেই সকলের পক্ষ হতে তা আদায় হয়ে যায় এবং সকলেই এর দায়মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ তা পালন না করলে সকলকেই দায়ী থাকতে হবে এবং সকলকেই গুনাহগার হতে হবে। যেমন, জানাযার সালাত, জিহাদ ইত্যাদি। (সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৬৭১)

[২৩৮] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ: ৪৩

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ যাকাত

যাকাত আরবি শব্দ। (ز-ك-و) মূল ধাতু থেকে গঠিত। এর অভিধানিক অর্থ হলো- প্রবৃদ্ধি, বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, কোনো বস্তু পরিচ্ছন্ন করা, প্রশংসা ইত্যাদি। (زكوة) মূল ধাতু থেকে গঠিত, অর্থ-বর্ধিত হওয়া, পরিশুদ্ধ করা বা হওয়া। অতএব, যাকাত অর্থ পরিবৃদ্ধি, পরিশুদ্ধি, কোনো জিনিসের উত্তম অংশ।[২৩৯] যাকাতের শাব্দিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "অভিধানিক অর্থে যাকাত হলো- বৃদ্ধি পাওয়া বা বর্ধিত হওয়া; আর এ থেকেই বলা হয় 'যাকা আযযার'উ' (ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে), যখন তা বেড়ে উঠে, আর যাকাতকে যাকাত নামকরণের কারণ হচ্ছে তা একাধারে দুনিয়ায় সম্পদ বৃদ্ধি ও আখিরাতেও সাওয়াব বৃদ্ধি করে।"[২৪০] কুর'আনে শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কোনো নির্দিষ্ট মালের নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ যদি পূর্ণ এক বছর থাকে সে সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলে।[২৪১]

যাকাতের ব্যাপারে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, ড. ওয়াহ্বাহ আয্ যুহায়লী বলেন, "যাকাত ইসলামের বাধ্যতামূলক একটি শরী'আ বিধান, যা আদায় করা ধনীদের উপর ওয়াজিব। সম্পত্তিশালীদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্র যাকাত আদায় করার অধিকার সংরক্ষণ করে। কেননা, যাকাত কোনো ঐচ্ছিক দান নয়, আবার তা দরিদ্রদের প্রতি কোনো করুণাও নয় বরং তা তাদের ধর্মীয় ও আইনসিদ্ধ ন্যায্য অধিকার এবং তা অবশ্যই বাধ্যতামূলক।"[২৪২] আব্দুর রহমান আল জাযাইরী যাকাতের সংজ্ঞায় বলেন, "নির্দিষ্ট শর্তাবলীর ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সম্পদ তার হকদারের মালিকানায় ন্যস্ত করা। আর এর অর্থ- নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকদের উপর ফরয হলো তারা তাদের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ দরিদ্র ও অনুরূপ যাকাতের হকদারদেরকে মালিকানাসহ প্রদান করবে।"[২৪৩] 'ফাতহু আল-কাদীর' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "প্রত্যেক স্বাধীন, সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের উপর যাকাত ফরয, যদি তিনি নিসাবের পূর্ণ মালিক হন এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়।"[২৪৪] 'ফিক্‌হ আসসুন্নাহ' গ্রন্থে যাকাতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "যাকাত হলো সেই সম্পদ, যা মানুষ আল্লাহ্‌র অধিকার হিসেবে দরিদ্রদেরকে প্রদান করে থাকে।"[২৪৫] 'আল হিদায়াহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে- "প্রত্যেক স্বাধীন, সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী ও প্রাপ্ত

---

২৩৯ ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯

২৪০ শামসুদ্দীন আবূ বাকার আস সারুখসী, *আল মাবসূত*, ৩য় খণ্ড, দার আল ফিকর, বৈরুত-২০০০, পৃ. ১৮৬

২৪১ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৬, পৃ. ৪৭৫

২৪২ ড. ওয়াহ্‌বাহ আয যুহায়লী, *আল ফিক্‌হ আল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, দার আল ফিক্‌র, দামেশক, ১৯৮৪, পৃ. ৩৮৪

২৪৩ আব্দুর রহমান আল জাযায়রী, *আল ফিকহু*, ১ম খণ্ড, *'আলা আল মাযাহিব আল আরবা'আহ*, তা.বি., পৃ. ৯৪৪

২৪৪ আহমাদ বিন ইবরাহীম আলমুসাল্লী, *ফাতহুল কাদীর*, ৩য় খণ্ড, দারুর রাশাদ, বৈরুত-১৯৯০, পৃ. ৪৬০

২৪৫ আস সাইয়্যিদ আস সাবিক, *ফিক্‌হ আস সুন্নাহ*, দার আর রাইয়্যান লিত্তুরাছ, কায়রো, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃ. ৩৯৭

বয়স্ক মুসলিমের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে, যদি এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কেউ নিসাবের পূর্ণ মালিক হন, এবং এর উপরই (মুসলিম) উম্মাহর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[২৪৬] 'আলমাবসূত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "যাকাত নির্ধারিত ফরয, যা আল্লাহ্‌র নির্দেশে ওয়াজিব হয়েছে, আর এটা আল কুর'আনে ঈমানের তৃতীয় (স্তম্ভ) এবং এটা দীনের পাঁচটি মূল ভিত্তির অন্যতম।"[২৪৭] 'ফিক্‌হ আস-সুন্নাহ্' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "যাকাত অন্যতম একটি ফরয, যার উপর উম্মাহ্‌র ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটা ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে, এটাকে দীনের আবশ্যক বিষয় হিসেবে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, যদি কেউ এটার আবশ্যকতা অস্বীকার করে, তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে।"[২৪৮] Islamic Economics: Theory and Practice গ্রন্থে আব্দুল মান্নান বলেন, "The modern Muslim States must mobilize their domestic resources through Zakat for finding various development programs in the education, health, labour and social welfare seector."[২৪৯] ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এর মতে, "সম্পদশালীর সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ও অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করা। যেহেতু যাকাত প্রদানের ফলে যাকাত দাতার অন্তর সঞ্চয়ের অতি লোভ থেকে পবিত্র হয়, তার সম্পদ দরিদ্রের পাওনা অধিকার থেকে পবিত্র হয়, উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বরকতের ফলে তা বৃদ্ধি পায়, সেহেতু মহান আল্লাহ্ একে যাকাত নাম দিয়েছেন।"[২৫০] বাংলা একাডেমির অভিধানে যাকাতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী প্রতিবছর সঞ্চিত সম্পদের মোট মূল্যের আড়াই শতাংশ হারে দরিদ্রকে অবশ্য প্রদেয় অর্থ।"[২৫১]

মৌলিক ইবাদাতের মধ্যে যাকাত হলো একটি আর্থিক ইবাদাত। এটি ইসলামের তৃতীয় রুকন। যাকাত নামাযের মতোই একটি ফরয ইবাদাত। সালাত ও যাকাত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নিসাব পরিমাণ সম্পদশালী মুসলিম ব্যক্তির ওপর যাকাত আদায় করা ফরয। আর নিসাব পরিমাণ সম্পদশালী বলতে কোনো মুসলিমের পূর্ণ এক বছর তার ও তার পরিবারের যাবতীয় ব্যয় বহন করার পর সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সমপরিমাণ অর্থ তাঁর মালিকানায় অতিরিক্ত থাকলে উক্ত সম্পদ বা অর্থের উপর শতকরা ২.৫ শতাংশ ভাগ করে যাকাত দিতে হবে। উক্ত যাকাত আল্লাহ্ নির্দেশিত ৮টি খাতে প্রদান করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

> *"এই সাদকা (যাকাত) নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো ফকীরদের জন্য, মিসকীনদের জন্য, সাদাকা আদায় ও বণ্টনকারীদের জন্য, এবং তাদের জন্য যাদের মন আকৃষ্ট*

---

[২৪৬] আলী ইব্‌ন আবু বাকর আল ফারগানী আল মারগীনানী আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন, *আল হিদায়াহ ফী শারহু বিদায়াহ আল মুবতাদী*, ১ম খণ্ড, দার ইহয়া আত তুরাছ আল 'আরাবী, বৈরুত-১৯৯১, পৃ. ৯৫

[২৪৭] শামসুদ্দীন আবূ বাকার আস সারুখসী, *আল মাবসূত*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

[২৪৮] আস সাইয়্যিদ আস সাবিক, *ফিক্‌হ আস সুন্নাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩

[২৪৯] M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice,* The Islamic Academy, Cambridge-1986, P. 266

[২৫০] ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.) *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ*, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ঝিনাইদহ-২০০৯, পৃ. ১৯

[২৫১] জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০১৬, পৃ. ৫১২

করা উদ্দেশ্য হবে, দাস মুক্তির জন্য, ঋণে নিমজ্জিতদের সাহায্যের জন্য, আল্লাহ্‌র পথে এবং পথিকদের সাহায্যের জন্য, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আরোপিত একটি ফরয এবং আল্লাহ্‌ সব কিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ।"[২৫২]

আল্লাহ্‌র নির্দেশিত উক্ত খাত ব্যতীত অন্য কোনো খাতে এই যাকাতলব্ধ অর্থ বা সম্পদ ব্যয় করা যাবে না। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র হয়। তাই যাকাত প্রদান করে প্রতিটি নিসাব পরিমাণ সম্পদশালী ব্যক্তি তাঁর সম্পদ পবিত্র করে নেয়। এর ফলে তাঁর সম্পদে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত বর্ষিত হয়। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি লাভ করে এবং সম্পদ পবিত্র হয়। নগদ অর্থ-সম্পদের যেমন আর্থিক হিসেবে যাকাত দিতে হয়, ঠিক তেমনি ফসলেরও যাকাত দিতে হয়। ফসলের যাকাতকে 'উশর বলে। ইসলামী শরী'আতে ফসলের কর আদায়ের পদ্ধতিই হলো 'উশর। 'উশর ইসলামী শরী'আতের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যক পালনীয় ফরয ইবাদাত। ফসলি জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশানুযায়ী ধার্যকৃত যাকাতব্যবস্থা হচ্ছে 'উশর। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ বলেন,

"তিনি আল্লাহ্‌ই নানা প্রকার লতাগুল্ম ও বাগান সৃষ্টি করেছেন। খেজুরবীথি সৃষ্টি করেছেন। শস্য উৎপাদন করেছেন, তা থেকে নানা প্রকার খাদ্য আহরণ করা হয়। যাইতুন ও ডালিম বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, এদের ফলের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও স্বাদ বিভিন্ন। এগুলোর ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং এগুলোর ফসল কাটার সময় আল্লাহ্‌র হক আদায় করো আর সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদের আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না।"[২৫৩]

আর 'উশর দেয়ার ক্ষেত্রে নিসাব ও পদ্ধতি কি হবে অথবা ফসলের উপর কীভাবে 'উশর বণ্টন করতে হবে সে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস,

"সালিম ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন: যে যমীনে বৃষ্টি, নদী ও কূপের পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা যেখানে পানি সেচের আদৌ কোনো প্রয়োজন হয় না- এমন ক্ষেতের ফসলের যাকাত হলো 'উশর বা উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ, আর যে জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সিঞ্চিত হয়-তার যাকাত হলো নিসফে 'উশর বা উশরের অর্ধেক।"[২৫৪]

---

[২৫২] আল কুর'আন, সূরা আত তাওবা: ৬০

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[২৫৩] আল কুর'আন, সূরা আল আন'আম: ১৪১

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

[২৫৪] আবূ দাঊদ, *আস্‌ সুনান*, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাহ, বাবুন মা ইঊজিবুল 'উশ্‌র ওয়ামা ইঊজিবু নিসফুল 'উশ্‌র, দারুল ফিকরি লিত তাবাঈ ওয়াল ইসর ওয়াত তাওঈ', বৈরুত, তা.বি., পৃ. ২৮

عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر

এভাবে নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন ব্যতীত ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মাছ চাষ, পশু-পাখি পালনসহ যত কৃষিকাজ রয়েছে তার উপর নির্ধারিত যে নিসাব রয়েছে, তার ভিত্তিতে সর্বদা যাকাত দিতে হবে। কারণ যাকাত দানের মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এক্ষেত্রে যত বেশি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গভীর হয় তত বেশি আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়। আর তখন মানুষ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য অন্তরের কৃপণতা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতাসহ সকল খারাপ কাজ থেকে পবিত্র থাকার চেষ্টা করে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ সাওম (রোযা)

সাওম (صوم) এর বহুবচনে (صيام) সিয়াম। সাওম শব্দটি বাবে নাসারা-এর মাসদার। এর অভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, চুপ থাকা, বন্ধ করা, আত্মসংযম ইত্যাদি। রাগিব আল-ইস্পাহানী (রহ.) বলেন, 'বিশেষ কাজ থেকে বিরত থাকার নাম সাওম।' আল্লামা বদরুদ্দীন আল-'আয়নী (রহ.) বলেন, 'শরী'আতের পরিভাষায়, সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী-সহবাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে বিরত থাকাকেই সাওম বলে।' খলীল আহমাদ সাহ্‌রানপূরী (রহ.) বলেন, 'শরী'আতের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট বস্তু থেকে বিরত থাকাই সাওম।' আয্-যারকানী (রহ.) বলেন, 'কথায় ও কর্মে কোনো বিষয় বিরত থাকার নামই সাওম।' ড. ইউসুফ হামিদ আল-আলেম বলেন, 'সিয়াম সাধনা হলো দুইটি কামনার চাহিদা থেকে বিরত থাকা, পেটের কামনা ও যৌন কামনা।'[২৫৫]

ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হলো সাওম (রোযা)। প্রতিটি মুসলিমের উপর সাওম (রোযা) একটি ফরয ইবাদাত। সাওম পালন করতে হয় ফজর (সুবেহ সাদেক) থেকে শুরু করে মাগরিব (সূর্যাস্ত) পর্যন্ত। সাওম (রোযা) রমজান মাসের পুরো একমাস একাগ্রতার সাথে পালন করতে হয়। আর এই রমজান মাসেই পবিত্র কুর'আন নাযিল হয়েছে। যা এসেছে মানবজাতির হিদায়াতের (কল্যাণের) জন্য। যে কারণে রমজান মাসের গুরুত্ব অত্যধিক। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "রোযার মাস এমন একটি মাস যাতে কুর'আন নাযিল করা হয়েছে, আর এ কুর'আন হচ্ছে মানবজাতির জন্যে পথের দিশা, সৎপথের সুস্পষ্ট নিদর্শন, হক-বাতিলের পার্থক্যকারী, অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে এতে রোযা রাখবে।"[২৫৬]

রোযা মানুষদেরকে পরিশীলিত হয়ে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়। এটি একটি প্রশিক্ষণের মাস। এক মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে বাকি এগারো মাস সেই শিক্ষণ অনুযায়ী জীবন সঠিকভাবে পরিচালিত করা যায়। কারণ প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো মানুষ তার কর্মগুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। মানুষের মধ্যে যেসব পশুত্ব রয়েছে সেগুলোকে দমন

---

[২৫৫] ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪৫-৭৪৬

[২৫৬] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ১৮৫
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দরকার। এই প্রশিক্ষণলব্ধ শিক্ষণের মাধ্যমে বান্দা সকল প্রকার হিংসা, বিদ্বেষ, পানাহার ও জৈবিক চাহিদা পূরণ করা ও সমস্ত অশ্লীলতা, ঝগড়া-ফাসাদ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে এবং সবর্দা আল্লাহ্‌র ইবাদাতে রত থাকে। রোযা এমন একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে সর্ম্পক বৃদ্ধি করে। রোযা রাখা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনি করে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা এর মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"[২৫৭] রোযার মাধ্যমে বান্দার ইবাদাতের একনিষ্ঠতা প্রকাশিত হয়। রোযা অনেক কষ্টকর ইবাদাত হওয়ায় আল্লাহ্ এর জন্য আলাদা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, "রোযা আমার জন্য আর আমি এর প্রতিদান দিব।"[২৫৮]

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ হজ

(حج) হজ শব্দের অভিধানিক অর্থ- ইচ্ছা করা, সংকল্প করা, সাক্ষাৎ করা বা কোনো স্থানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গমন করা। হজ শব্দটি 'হা' বর্ণে যবর ও যের সহকারে পড়া যায়। রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন, "হা' বর্ণে যবর হলে এটা মাসদার (ক্রিয়ামূল) হবে যের হলে ইস্‌ম (বিশেষ্য) হবে।" ইব্‌ন মানযূর আল-ইফ্‌রীকী বলেন, "হজ শব্দের অর্থ সংকল্প করা। 'অমুক ব্যক্তি আমাদের নিকট হজ করলো' অর্থাৎ আগমন করলো। যে বিষয়ের সংকল্প করলো, আমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম।"[২৫৯] হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। সালাত, যাকাত ও রোযার মতোই হজ একটি ফরয ইবাদাত। তবে হজ প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয করা হয়নি, কেবল সামর্থ্যবানদের উপর হজ ফরয করা হয়েছে। আর এই ফরয হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। সেই শর্তগুলো পূর্ণ হলেই কেবল হজ ফরয হয়। যেমন, হজ পালনে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হয়, আর্থিক সামর্থ্যবান (যার হজ পালনকালে পারিবারিক ব্যয়সহ পবিত্র কাবাগৃহে যাওয়া ও আসার ব্যয় বহন করার ক্ষমতা আছে) হতে হয় ও সক্ষম (যিনি পবিত্র কাবা শরীফে যাওয়া ও আসার মতো শারীরিক সুস্থতার অধিকারী) হতে হয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ ইবাদাতটি পালন কারার জন্য প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলিম মক্কায় একত্রিত হয়। তারা সকলেই এক অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এক হয়ে এক পোশাকে হজের সকল আরকান ও আহকাম পালন করে। পবিত্র কাবা ঘরকে প্রদক্ষিণসহ আরো কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে হজ পালন করতে হয়। এই কাবা ঘরকে আল্লাহ্

---

[২৫৭] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ১৮৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

[২৫৮] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৩য় খণ্ড, (অনু: সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) কিতাবুস সাওম, বাবু উজুবিস সাওমি রামাযান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (চতুর্থ সংস্করণ) ঢাকা-২০০৩, পৃ, ২৩৮

يقول الله عز و جل الصوم لي وأنا أجزي به.

[২৫৯] ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৫

তা'আলা মানুষের জন্য নিরাপত্তা, কল্যাণ ও বরকতময় করে নির্ধারণ করেছেন এবং ইবাদাতের জন্য নির্ধারিত স্থান হিসেবেও নির্ধারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

> *"নিশ্চয়ই গোটা মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘরটি বানিয়ে রাখা হয়েছিল তা ছিল মক্কা নগরীতে, এ ঘরকে কল্যাণ ও বরকত দান করা হয়েছে এবং মানবকূলের জন্য হিদায়াতের কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। এখানে রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, আরো রয়েছে ইবরাহীমের ইবাদাতের স্থান, যে এখানে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, মানুষের মধ্যে যারা সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন এই ঘরে হজ আদায় করে, আর যদি কেউ এ বিধান অস্বীকার করে তার জেনে রাখা উচিত আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকূলের কাছে মুখাপেক্ষী নন।"*[২৬০]

ইবাদাতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে কাবাঘর সৃষ্টি করেছেন সেটি উল্লেখ করে আল্লাহ্ আরো বলেন,

> *"হে নবী স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে ঘর নির্মাণের জন্য স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, আমার এ ঘর পবিত্র রেখো তাওয়াফকারীদের জন্য, নামাযে দণ্ডায়মানের জন্য, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য। তুমি মানুষদের মাঝে হজের ঘোষণা দিয়ে দাও, যাতে করে তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে ও সর্ব প্রকার কৃষ্ণকায় উটের পিঠে আরোহণ করে ছুটে আসে, দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।"*[২৬১]

এই হজ এমন একটি ইবাদাত যা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে। ফলে হজ পালন অবস্থায় সেখানে শাসক ও শাসিত, ধনী-গরিব, সাদা-কালো, আরবি-আজমী সকলের মাঝে সাম্য ও মৈত্রী সৃষ্টি হয়ে এক সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে ইসলাম আল্লাহ্র ইবাদত করার মাধ্যমে মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টিতে নির্দেশ প্রদান করে।

---

[২৬০] আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ৯৬-৯৭
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ - فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

[২৬১] আল কুর'আন, সূরা আল হজ: ২৬-২৭
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ - وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

তৃতীয় অধ্যায়
কুর'আন ও হাদীসের আলোকে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের অর্থনৈতিক অধিকার

প্রথম অনুচ্ছেদঃ যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সময়েও যাকাত

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ নামাযের সাথে যাকাতের পারস্পরিক গুরুত্ব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের সামাজিক অধিকার

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিত এতিমদের অধিকার

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকের অধিকার

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবেশীর অধিকার

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিত আত্মীয়ের অধিকার

নবম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের জ্ঞান অর্জনের অধিকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মহাজগতের স্রষ্টা। তাঁর অপর মহিমায় মহাজাগতিক সব কিছুই সৃষ্টি। মহাবিশ্বের সকল জ্ঞান ও রহস্যের উৎস তিনি। তিনি মহান প্রভু, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই সর্বজ্ঞানী, তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল কিছুর মালিক। সেই আল্লাহ্ তা'আলা সৌরজগতের ক্ষুদ্র একটি গ্রহ পৃথিবীকে মানবজাতির উপযোগী করে প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমাদের আমি ক্ষমতা সহকারে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্যে এখানে জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করেছি। কিন্তু তোমারা খুব কমই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকো।"[২৬২] তিনি মানবজাতিকে পৃথিবীতে আবাদ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। যাতে মানবজাতি তাদের ইচ্ছেমতো প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপন্ন করে জীবনোপকরণের অভাব পূরণ করতে পারে। তিনি মানবজাতির প্রতিটি মানবসন্তানকে নিজস্ব স্বাধীন সত্তা ও স্বাধীন চিন্তা শক্তি দিয়েছেন। যাতে করে মানুষ নিজস্ব চিন্তা থেকে ভালো-মন্দ উপকরণ নির্বাচন করতে পারে, স্বাধীনমত মত-পথ গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে পারে, এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে তাঁর ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।[২৬৩] তাই মানবজাতির কাজ হলো, আল্লাহ্র আদেশ পূর্ণভাবে পালনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে পৃথিবীতে বসবাস করে সৃষ্টিকূলের মধ্যে কল্যাণ সাধন করা। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁরই মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা ইসলামকে মানবজাতির জন্য নির্ধারণ করেছেন।[২৬৪] যাতে মানুষ উন্নত চরিত্রের মানবিকতাগুণ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করতে পারে। কিন্তু যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামের এ সুমহান চির শাশ্বত ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে।[২৬৫]

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বকালের মানবসভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান[২৬৬] দিয়ে সর্বপ্রথম মানুষ হযরত আদম[২৬৭] (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর

---

[২৬২] আল কুর'আন, সূরা আল আ'রাফ: ১০

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

[২৬৩] আল কুর'আন, সূরা আয যারিয়াত: ৫৬

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

[২৬৪] 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন ইসলাম'। আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ১৯

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

[২৬৫] 'যমীন ও আসমানের ভাণ্ডারের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে তারাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে'। আল কুর'আন, সূরা আয যুমার: ৬৩

لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

[২৬৬] "অতঃপর আল্লাহ্ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন।" আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ৩১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ

[২৬৭] (أدم) (আ.) মানবজাতির জনক, আল্লাহ্র মনোনীত যাঁকে ফেরেশতাগণ সিজদা করেছেন। দুনিয়ায় আল্লাহ্র প্রতিনিধি ও প্রথম নবী। তিনি জন্মদাতা, গোত্র বা জাতির বড় নেতা ও আদি পুরুষ। আদম (আ.)-এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য

সঙ্গী ও স্ত্রী হযরত হাওয়া[২৬৮] (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির প্রথম থেকেই তাঁরা উন্নত সভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে জান্নাতকে বসবাসের জন্য নির্ধারিত করে দেন। যে নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃত অর্থে মানবজাতির মৌলিক সংস্কৃতির প্রকাশ করেন।[২৬৯] আল্লাহ্ তা'আলার মহিমার ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিকতায় হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-কে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবতরণ করান।[২৭০] তৎপরবর্তী সময়ে পুনরায় তাঁদের একত্রিত করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে মানব বংশ বৃদ্ধি করে মানবজাতির যাত্রা শুরু করেন।[২৭১]

তিনি মানুষকে প্রয়োজনীয় চাহিদা ও মানবীয় দুর্বলতাসহ অত্যন্ত দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে তিনি মানুষকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জনে প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।[২৭২] যাতে মানুষ নিজের এবং তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ পূরণ করে পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারে এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। মানবজাতির প্রথম শিক্ষক হযরত আদম (আ.) তাঁর বংশধরদের জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুর শিক্ষা দেন।[২৭৩] আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত সব মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের জ্ঞানের ব্যবস্থা রেখেছেন। যা সময়ের ধারাবাহিকতায় সভ্যতার প্রয়োজনে বিকশিত হয়ে চলেছে। হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বসবাস করার জন্য বাড়িঘর নির্মাণ ও চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করেছিলেন।[২৭৪] তাঁর নেতৃত্বে

তাঁর ও তাঁর বংশধর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করানো। আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.)-কে দুনিয়ার মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করেন, যা সময়ের ধারাবহিকতায় মানবজাতির মধ্যে বিকশিত হবে। (সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ৩৪১)

২৬৮ (حواء) (আ.), আদম (আ.)-এর স্ত্রী। যাকে আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.)-এর সঙ্গী হিসেবে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তাঁর স্বামীর সাথে যুগ্মভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে জান্নাত হতে বহিষ্কৃত হন। (সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫তম খণ্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩, পৃ. ২৩)

২৬৯ 'এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখানে যা যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে'। আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ: ৩৫

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

২৭০ 'অতঃপর শয়তান সেখান থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করল। আর আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে নেমে যাও; এবং কিছু দিনের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল যমীনে।' আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ: ৩৬

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

২৭১ ড. মুস্তফা সুবায়ী, *ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন* [ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির সোনালী অধ্যায়], বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ২৯

২৭২ 'অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও'। আল কুর'আন, সূরা আল জুমু'আ: ১০

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

২৭৩ আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

২৭৪ ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৮, পৃ. ১৮৮

মানবজাতি একটি সুসভ্য উন্নত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল।[২৭৫] যার ধারাবাহিকতায় মানবসভ্যতার বিভিন্ন সময়ের চাহিদানুযায়ী ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে।

মানবজাতি শুরু থেকেই সভ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও তখন মানুষের জীবনযাপন অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ ছিল। তথাপিও তখন মানুষের মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, লালসা, কামনা-বাসনাসহ নিজেদের বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার অসুস্থ প্রতিযোগিতাও ছিল। যার ধারাবাহিকতা মনুষ্য সভ্যতার বিবর্তনের মাঝেও সকল সময়ে সকল জাতির মঝে বিদ্যমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এ কারণে আধুনিক সভ্যতায় মানুষ যতই উন্নত প্রযুক্তির উন্নতি সাধন করুক না কেন, তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বহীন ও মানবতাহীন বিষয়গুলো এখনো বিদ্যমান। যা এই সভ্যতায় আরো বীভৎস্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। আর এই ঘটনার সূচনা হয়েছিল হয়রত আদম (আ.)-এর সন্তান কাবীল কর্তৃক হাবীলকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে।[২৭৬] এসব ঘটনাপ্রবাহে কালের বিবর্তনে সভ্যতার হাজার পরিবর্তন ও বিবর্তনে মানুষের মাঝে সুখ, দুঃখ, আনন্দ ও বেদনাসহ বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে মানবজাতি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মনুষ্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করে।

সময়ের প্রবহমান ধারায় সভ্যতার এই পরিবর্তন ও বিবর্তন মানুষের মাঝে শ্রেণি বিভাজনকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছে। যার উপর ভিত্তি করে পৃথিবী হয়ে উঠে সংঘাতময় আবাসস্থল। এসব কারণে সকল সময়ে সকল জনপদে শ্রেণিবৈষম্য অত্যন্ত বীভৎস্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ধনী শ্রেণি ভোগ ও কামনা চরিতার্থ করার প্রয়াসে এবং সম্পদকে নিজেদের কুক্ষিগত করার জন্য তাদের শক্তিমত্তা ও কুটকৌশল ব্যবহার করে থাকে। এ সকল কাজ ধারাবাহিকভাবে

---

[২৭৫] 'হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্‌কে অবলম্বন কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট চাও এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন'। আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ১
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

[২৭৬] আল্লাহ্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদেশ্য করে বলেন, আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন এক জনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্য জনের কবুল হলো না। তাদের একজন বলল, আমি তোমাকে হত্যা করবই। অপরজন বলল, আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগের কুরবানী কবুল করেন। আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত উঠালেও তোমাকে হত্যার জন্য আমি হাত উঠাবো না; আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি। আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অতঃপর তার মন ভাই হত্যায় তাকে উদ্বুদ্ধ করল এবং সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। অতঃপর আল্লাহ্ একটি কাক পাঠালেন সে মটি খনন করল, তার ভাইয়ের মরদেহ কীভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য। সে বলল, হায়! আমি এ কাকের মতোও হতে পারলাম না যাতে আমার ভাইয়ের মরদেহ গোপন করতে পারি? অতএব সে লজ্জিত হল। আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা : ২৭-৩১
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ-لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ - فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ - فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ

সব সময়েই চলে এসেছে। যার বড় উদাহরণ ছিল দরিদ্র শ্রেণিকে শ্রমিক ও দাস[২৭৭] হিসেবে ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে ধনীরা নিজেদের লিপ্সাকে চরিতার্থ করতে দরিদ্রদের উপর নির্যাতনের ভয়ানক পন্থা প্রয়োগ করে। যা তাদের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। তথাপি ধনী মানুষেরা নিজেদের দম্ভ ও অহঙ্কারে দরিদ্রদের উপর নির্যাতন করেই চলেছে। অথচ ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া, মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। এটি কেবল আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়ে থাকে, আর কারো ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় হয় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন, "তাঁর কাছে আসমানসমূহ ও যমীনের চাবিকাঠি। তিনি যার জন্য ইচ্ছে তার রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[২৭৮]

আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক ব্যবধান দিয়ে দিয়েছেন। যার উপর ভিত্তি করে সুবিধাপ্রাপ্ত ও সুবিধাবঞ্চিত দুটি বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। সেই ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য-সহযোগিতা করা সুবিধাপ্রাপ্তদের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন। কিন্তু ধনী শ্রেণি কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় নিজেরা ভোগ-বিলাসে মত্ত থেকে তাদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বিস্তারের জন্য সর্বদা লিপ্ত। তারা দরিদ্রদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে এবং সম্পদ লুণ্ঠন করে গড়ে সুরম্য প্রাসাদ ও নগরী। যার পথ পরিক্রমায় প্রতিষ্ঠিত হয় এক একটি সভ্যতা। যে সভ্যতার অন্তরালে আছে বঞ্চিত শ্রেণির ত্যাগ, দুঃখ, বেদনা ও রক্তের বন্যায় ভেসে যাওয়া এক চরম নির্যাতনের ইতিহাস। এসবের ধারাবাহিকতায় যখন সমাজ মানবতাহীন হয়ে পড়ে। অনিয়ম, অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তখন তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহের কথা ভুলে যায় এবং সম্পদ গড়তে মিথ্যা, প্রতারণা, কূটকৌশল ও ক্ষমতাকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। অভাবী, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন করে পৃথিবীকে করে তোলে সংঘাতময় আবাসস্থল। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা অভাবী, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের সর্বোপরি, মানবজাতির অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে প্রতিটি জাতিতে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী ও রাসূলগণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ও মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য আমৃত্যু কাজ করেছেন। নবী ও রাসূলগণ মানুষদেরকে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা মানবজাতিকে ভ্রাতৃত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন, "এবং আমি নিঃসন্দেহে আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট দলীল সহকারে এবং তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি আল-কিতাব ও আল মীযান, যেন মানুষ সুবিচার সহকারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"[২৭৯]

---

[২৭৭] মাওলানা ইউসুফ আল কারদাভী, *ইসলামে যাকাত বিধান*, ১ম খণ্ড, (অনু:) খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৭, পৃ. ৫৪

[২৭৮] আল কুর'আন, সূরা আশ শূরা: ১২

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

[২৭৯] আল কুর'আন, সূরা আল হাদীদ: ২৫

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের স্বভাব, বিবেক ও চিন্তা-চেতনার স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশিত একমাত্র নির্ধারিত পথ। মানুষকে দায়িত্ববান ও পরিপূর্ণ মানবীয় গুণাবলী সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান ইসলামে বিদ্যমান। এটি জন্মের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য সময়োপযোগী একটি সর্বাধুনিক অপরিবর্তনীয় রূপরেখা। এটি মানবজাতির সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য নির্ধারিত একটি পরিপূর্ণ শাশ্বত ও চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। ইসলামে মানবজীবনের প্রতিটি অংশের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে সেগুলো পরিচালনার সঠিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এটি স্থান-কাল-পাত্র-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে সুস্পষ্ট সকল ব্যবস্থাপনা দিয়েছে। যার মধ্যে মানুষের সম্পদ ও অর্থনৈতিক বিষয়ের ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টনব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু মানবজীবনে অর্থ ও সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অর্থ-সম্পদ ছাড়া পৃথিবীতে বসবাস করা প্রায় অসম্ভব; এর সুস্পষ্ট, সুনিয়ন্ত্রিত ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া সুস্থ ও সভ্য সমাজ পরিচালিত হওয়া অকল্পনীয় সেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলা মানবজাতিকে সুশৃঙ্খলভাবে তাদের কল্যাণে নিয়োজিত ও পরিচালিত হতে সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও মানবিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা দিয়েছেন।[২৮০]

ইসলামী অর্থব্যবস্থা এমন একটি ব্যবস্থা, যা মানুষের পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করে এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সুদৃঢ় করে। এটি সব ধরনের অর্থনৈতিক শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুম থেকে মুক্ত করে একটি ইনসাফভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।[২৮১] যার মাধ্যমে সমাজে কল্যাণময় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এ ব্যবস্থা পরকালীন মুক্তির একটি অন্যতম উপাদান। এ অর্থব্যবস্থায় আল্লাহ্‌ তা'আলা সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সুস্পষ্ট মৌলিক নীতিমালা দিয়েছেন। যার মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ভারসাম্য নিশ্চিত করা সম্ভব। যা সকল যুগের, সকল সময়ের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রেখে সামাজিক সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ লক্ষ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিসাব পরিমাণ (পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের পর যার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সমপরিমাণ নগদ অর্থ-সম্পদ এক বছর ধরে জমা এমন) সম্পদের অধিকারী প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির জন্য যাকাত দেয়া ফরয করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আর ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে।"[২৮২]

---

[২৮০] মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, খায়রুন প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ঢাকা-২০০৭, পৃ. ৩২

[২৮১] M. Zohurul Islam FCA, *Al-Zakah, A Hand Book of Zakah Administration*, Bangladesh Institution of Islamic Thought, Dhaka-1999. P. 12

[২৮২] আল কুর'আন, সূরা আয যারিয়াত: ১৯

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

প্রথম অনুচ্ছেদঃ যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা

যাকাত সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদে দরিদ্রের অধিকার। অভাবী ও দরিদ্র মানুষই হলো যাকাতের অর্থ ব্যয়ের প্রধান খাত।[২৮৩] এ খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার জন্য যাকাত দানকারীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে যাকাত প্রদানকারী যাকাত গ্রহণকারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দিবে। কারণ যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তি স্বভাবতই সংকোচ ও লজ্জার মধ্যে থাকে। তার পক্ষ থেকে এটি বুঝে নেয়ার বাস্তব কোনো অবস্থা থাকে না। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ দরিদ্রদের প্রদান করতে তিনি সম্পদশালীদেরকেই নির্দেশ দিয়েছেন। আর সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে তা প্রকৃত হকদারের নিকট পৌঁছাতে পারলে সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এজন্য বলা যায়, যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থাই কেবল সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র চিরন্তন অর্থব্যবস্থা। যা বাস্তাবায়নের মাধ্যমে মানবসমাজে সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব। এ ব্যবস্থাই দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র মাধ্যম। আর এ ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল ধনী-দরিদ্রের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে অভাবী ও দরিদ্রদ্রের অধিকার প্রদানের জন্য এবং নিজ উদ্যোগে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য অনেক নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। পবিত্র কুর'আনকে তিনি মানবজাতির কল্যাণের জন্য একটি নির্দেশনামূলক কিতাব হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। তিনি মানুষদেরকে এমনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র এই নির্দেশনা মেনে অর্থ-সম্পদ দরিদ্রদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য দান করে তবে ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দিবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, "যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা কতইনা উত্তম! আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। আল্লাহ্ তোমাদের কিছু গোনাহ দূর করে দিবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্মের খুবই খবর রাখেন।"[২৮৪] অন্যদিকে কোনো ব্যক্তি যদি সালাত, রোযা ও হজ সঠিকভাবে করে কিন্তু অভুক্ত দরিদ্রের সাহায্য-সহযোগিতা না করে সম্পদ জমিয়ে রাখে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কঠিন আযাব রেখেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশনার বাস্তব প্রয়োগ করেছেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ছিলেন মানবতার মুক্তির দূত। তিনি মানুষের কল্যাণে তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি বিশেষত দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের জন্য ছিলেন আশ্রয়। তিনি আল্লাহ্ মনোনীত নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট ছিলেন। তিনি সর্বদা আল্লাহ্ নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হতেন।

---

[২৮৩] ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৮, পৃ. ৯১

[২৮৪] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ২৭১

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তিনি ছিলেন জীবন্ত কুর'আন। তিনি অভাবী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে প্রচেষ্টা করতেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে নির্দেশ প্রদান করতেন। তিনি দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মদিনা রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করেছিলেন। বিশ্ব মানবতার মুক্তির নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত অর্থব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করা। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।"[২৮৫] মানবজাতির কল্যাণকামী অতুলনীয় মানবাধিকার কর্মী, নেতা সর্বশ্রেষ্ট মহামানব ও নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবকল্যাণে তাঁর জীবন পরিচালিত করেছিলেন।

তিনি দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। যার কারণে তিনি যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন অভাবী, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষগুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি যখন মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক হলেন তখন তিনি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এ কাজে তিনি কোনোরূপ শিথিলতা সহ্য করেন নি। তিনি ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির মুক্তির জন্য মানুষের স্বভাব ও সংস্কৃতির প্রতিটি দিক ও বিভাগকে সংস্কার করেছিলেন। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মূল্যবোধভিত্তিক বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। মানুষের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সকলের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দেন। এ সকল কাজ করে তিনি বিশ্ব মানবতার সকল শাখাতে অতুলনীয় বিরল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার এ পদক্ষেপের কারণে মানবজাতি মনুষ্যত্ব এবং মানবতার এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে পেরেছে।

আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানবকল্যাণের জন্য প্রেরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মানবজাতির মাঝে বিদ্যমান বৈষম্যের মূলোৎপাটন করা প্রয়োজন। সেজন্য সমাজকাঠামোর প্রতিটি শাখায় ইসলামী জীবনব্যবস্থার নিয়ম-নীতিগুলো পরিপালন করতে হবে। যদি তা করা সম্ভব হয় তবেই কেবল মানবজাতির মাঝে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা সম্ভব। আর এই বৈষম্য দূর করা ব্যতীত কখনোই মানবজাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। সেজন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ একান্ত প্রয়োজন। তাদের মৌলিক চহিদা পূরণ করার জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থা ভিন্ন আর কোনো অর্থব্যবস্থা কল্যাণকর কোনো পদ্ধতি দিতে পারেনি। যার

---

[২৮৫] আল কুর'আন, সূরা আল আম্বিয়া: ১০৭

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

সূচনা হয়েছে যাকাত বিধান আবশ্যিক করে ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এছাড়াও তাদের জন্য অর্থ-সম্পদ দ্বারা আরো কিছু আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক সাহায্য-সহযোগিতা করার নির্দেশনা রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ নির্ধারণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছেন। এক্ষেত্রে যদি কেউ তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচিত হয়ে আল্লাহ্র কাছে তাওবা করে, ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত পন্থায় যাকাত আদায় করাসহ অন্যান্য নির্দেশগুলো পরিপালন করে, তবে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। সে ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, "অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়িম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই।"[২৮৬]

আল্লাহ্ তা'আলা দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে যাকাত বণ্টনের একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করে যাকাত প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর যোগ্যতার মাপকাঠিও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। যদি আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের খাতসমূহ[২৮৭] নির্ধারণ করে না দিতেন, তবে সমাজের খারাপ চরিত্রের সুবিধাভোগী লোকগুলো যাকাতের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করে নেয়ার জন্য অনেক চোরা পথ খুঁজে বের করতো। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের খাতসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[২৮৮] যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ-সম্পদের যেমন যাকাত রয়েছে তেমনি ফসলেরও যাকাত রয়েছে। ফসলের যাকাতকে 'উশর বলা হয়। চাষযোগ্য জমির মালিকরা বা চাষাবাদে সক্ষম মানুষেরা জমিতে ফসল চাষাবাদ করে প্রয়োজনীয় ফসল উৎপন্ন করে। কিন্তু যাদের কোনো চাষযোগ্য ভূমি নেই বা দারিদ্র্য বা অক্ষমতার কারণে কোনো জীবিকা উপার্জন করতে পারে না, তাদেরকে ফসলের একটি নির্ধারিত অংশ দেয়ার জন্য উৎপাদিত ফসলের মালিকের উপর ফরয করা হয়েছে।

'উশর আদায় প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! যে অর্থ তোমরা উপর্জন করেছো এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করে দিয়েছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর। তাঁর পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা যেন সবচেয়ে খারাপ জিনিস বাছাই করার চেষ্টা করো না, অথচ ঐ জিনিসই যদি কেউ তোমাদের দেয় তা হলে তোমরা কখনো তা নিতে রাজি হও না, যদি না তা নেয়ার ব্যাপারে তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকো। তোমাদের জেনে রাখা

---

[২৮৬] 'আল কুর'আন, সূরা আত তাওবা: ১১

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

[২৮৭] "এই সাদকা (যাকাত) নিদৃষ্ট করে দেয়া হলো ফকীরদের জন্য, মিসকীনদের জন্য, সাদাকা আদায় ও বণ্টনকারীদের জন্য, তাদের জন্য যাদের মন আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য হবে, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য, আল্লাহ্র পথে এবং পথিকদের সাহায্যের জন্য। এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আরোপিত একটি ফরয এবং আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ।" আল কুর'আন, সূরা আত তাওবা: ৬০

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[২৮৮] ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে যাকাত বিধান*, ২য় খণ্ড, (অনু:) খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৮, পৃ. ১৯

উচিত, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সর্বোত্তম গুণে গুণান্বিত।"[২৮৯] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'উশরের ভাগ নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন "যে জমি নদী-নালা ও বর্ষার পানিতে সিক্ত হয় তাতে 'উশর (উৎপাদিত শস্যের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে) ধার্য হয়। আর যে জমিতে সেচের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয় তাতে অর্ধেক 'উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে) ধার্য হবে।"[২৯০] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন,

> *"তিনি আল্লাহ্ নানা প্রকার লতাগুল্ম ও বাগান সৃষ্টি করেছেন। খেজুরবীথি সৃষ্টি করেছেন, শস্য উৎপাদন করেছেন, তা থেকে নানা প্রকার খাদ্য সংগৃহীত হয়। যাইতুন ও ডালিম বৃক্ষ সৃষ্টি করেছেন, এদের ফলের মধ্যে বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও স্বাদ বিভিন্ন। এগুলোর ফল খাও যখন ফলবান হয়। আর ফসল কাটার সময় আল্লাহ্র হক আদায় করো কিন্তু সীমা অতিক্রম করো না। কারণ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।"*[২৯১]

যাকাত যেমন একটি ফরয ইবাদাত ঠিক তেমনি তা সামাজিক সমৃদ্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মাধ্যমও। সঠিকভাবে যাকাত প্রদান করলে যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়ে যায়। এর ফলে তারা আর্থিকভাবে কিছুটা সচ্ছল হয়ে দারিদ্র্যের কঠিন অবস্থা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে সামাজিক অসাম্য বৃদ্ধি পায় এবং এর পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।[২৯২] তাই একথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, দারিদ্র্য দূরীকরণে আল্লাহ্র নির্দেশনা অনুযায়ী যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। যাকাত প্রদান শুধু সামাজিক কল্যাণই করে তা নয়, বরং যাকাত দানের ফলে যাকাতদাতারা অধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ করে এবং তারা সম্পদে উন্নতি ও সাফল্য লাভ করে। তাদের নিজেদের নৈতিক অবক্ষয় থেকে পরিত্রাণ পায় এবং দুনিয়ার জীবন ও পরকালীন জীবনে শান্তি, সাফল্য ও মুক্তি লাভ করে।

---

[২৮৯] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ২৬৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

[২৯০] ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, ৩য় খণ্ড, (অনু:) কিতাবুয যাকাত, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-২০০০, পৃ. ৩৪৫

عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر "

[২৯১] আল কুর'আন, সূরা আল আন'আম: ১৪১

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

[২৯২] ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রকাশনা বিভাগ, সপ্তম সংস্করণ, ঢাকা-২০০৮, পৃ. ৩৩২

মানবতার মুক্তির দূত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি যখন হযরত মুয়ায (রা.)-কে ইয়ামেনে পাঠাচ্ছিলেন তখন তাঁকে বললেন। "তাদের জানিয়ে দিবে যে, তাদের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে, যা তাদের ধনী লোকদের নিকট থেকে নেয়া হবে এবং তাদের গরিব লোকেদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।"[২৯৩] কারণ অভাবীদের দারিদ্র্য দূর করে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করাই যাকাতব্যবস্থার প্রথম লক্ষ্য ও প্রকৃত উদ্দেশ্য।[২৯৪] নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়ে কোনো শৈথিল্য পছন্দ করতেন না। তাই তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে বলেছেন,

> *"যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে (বিষের তীব্রতার কারণে) টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন: "আল্লাহ্ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করেছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই কিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করেছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে।"*[২৯৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তিনি যাকাতদানে সর্বাবস্থায় মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। আর যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে তাদের প্রতি তিনি শাস্তির কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস-

> *"হযরত আবূ যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ছায়ায় বসা ছিলেন। এমন সময় আমি গিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, কা'বার প্রভুর শপথ! তারা ক্ষতির মধ্যে*

---

[২৯৩] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, বাবু লা তু'খাযু কারাইমু আমওয়ালিন্নাস ফিস সাদাকাহ, মাকতাবা ইসলামিয়া, ঢাকা, তা.বি., পৃ. ১৯৬

أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.

[২৯৪] ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে যাকাত বিধান*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[২৯৫] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ১ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, বাবু ইসমি মানিইজ যাকাতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة بلهزمتيه – يعنى شدقيه – ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة.

নিমজ্জিত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি গিয়ে তাঁর কাছে বসলাম, কিন্তু বসে থাকতে পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, সেই ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা কারা? তিনি বললেন, এরা হলো এমন সব ধনাঢ্য ব্যক্তি, যারা এখানে-সেখানে ইচ্ছেমতো খরচ করে এবং সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডাক দিক থেকে ও বাম দিক থেকে অকাতরে (অপ্রয়োজনে ও অপাত্রে) খরচ করে। আর তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছে, যারা জিহাদ ও দীনের সাহায্যের জন্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে। আর যেসব উট, গরু ও ছাগলের মালিক এর যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন এসব জন্তু পৃথিবীতে যেভাবে ছিলো তার চেয়ে অনেক গুণ মোটাতাজা ও চর্বিযুক্ত হয়ে এসে তাকে (মালিককে) পা দিয়ে দলিত-মথিত করবে এবং শিং দিয়ে আঘাত করবে। এর শেষ পশুটি অতিক্রম করলে প্রথমটি পুনরায় এসে ঐরূপ করতে আরম্ভ করবে। আর এভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না বান্দাদের বিচার শেষ হয়।"[২৯৬]

এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীস,

"সোনা-রুপার অধিকারী যেসব লোক এর হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সোনা-রুপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরি করা হবে, অতঃপর তা দোযখের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তার ললাট, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেয় হবে। যখনই ঠাণ্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। আর তার সাথে এরূপ করা হবে এরকম একদিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর এ অবস্থা চলতে থাকবে এরূপ শাস্তি প্রাপ্ত লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর তাদের কেউ পথ ধরবে হয় বেহেশতের দিকে আর কেউ দোযখের দিকে।"[২৯৭]

---

[২৯৬] ইমাম মুসলিম, *আস্‌ সহীহ*, কিতাবুয যাকাত, বাবু তাগলীজি উকুবাতি মান লা ইউআদ্দিয যাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم ؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا (من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله) وقليل ما هم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطوؤه بأظلافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولادها حتى يقضى بين الناس.

[২৯৭] ইমাম মুসলিম, *আস্‌ সহীহ*, কিতাবুয যাকাত, বাবু ইসমি মানিইয যাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل ؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها

সমাজের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের মাঝে সামাজিক ব্যবধান কমানোর জন্য এবং ধনীদের মাঝে বিরাজমান ও অঙ্কুরিত অহংবোধ নষ্ট করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেদের মধ্যে বেশি বেশি সালাম প্রচলন করতে বলেছেন। সমাজে সালাম প্রচলনের মাধ্যমে ধনীরা দরিদ্রদেরকে সালাম প্রদান করে তাদের অহঙ্কার মিটিয়ে ফেলতে পারে। কারণ সম্পদই তাদের অহঙ্কারের কারণ। এজন্য বেশি বেশি করে ধনী-দরিদ্র সমাজে সালামের প্রচলন করবে। তাতে করে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ভালোবাস, প্রীতি ও বন্ধন তৈরি হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আম্মার (রা.) বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য, "রাসূল বলেন, তিনটি গুণ যে আয়ত্ত করে, সে পূর্ণ ঈমান লাভ করে: (১) নিজ থেকে ইনসাফ করা, (২) বিশ্বে সালামের প্রচলন করা, (৩) অভাবী অবস্থাতেও দান-খয়রাত করা।"[২৯৮] এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একটি হাদীস, আব্দুল্লাহ ইব্নু আমর হতে বর্ণিত, "এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের কোন কাজ সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, তুমি লোকদের খাদ্য খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সকলকে সালাম দিবে।"[২৯৯]

দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণি অবেহেলিত হওয়ায় তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কাজ করেছেন এবং সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য সামর্থ্যবানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখবে, তাদের জন্য ঐ পুঞ্জীভূত সম্পদ কঠিন শাস্তির কারণ হবে। তাদেরকে বিভিন্ন স্তরে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই যাকাত আদায়ে অবহেলা না করে উৎসাহিত হতে হবে, যাতে কিছু মানুষের হাতে সব সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে না পড়ে। তাহলে মানুষের মাঝে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধ হবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সময়েও যাকাত

আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন। তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করতেন। পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের শরী'আতে

فصيلا واحدا تطؤه بأخفافا وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

[২৯৮] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ১ম খণ্ড, কিবাবুল ঈমান, বাবু ইফশাউস সালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

عن عَمَّار رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنْ الْإِقْتَارِ".

[২৯৯] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

যেমন যাকাতের বিধান ছিল, তেমনি শেষ নবীর শরী'আতে তা বিদ্যমান আছে।[৩০০] যেমন হযরত ইব্রাহীম[৩০১] (আ.) ও হযরত ইয়াকূব[৩০২] (আ.)-এর সময়েও যাকাতব্যবস্থা ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি তাঁদের নেতা (ইমাম) বানিয়েছি, তাঁরা আমার বিধান অনুযায়ী চলে এবং আমি তাঁদের প্রতি ভালো ভালো কাজ করা, সালাত কায়িম করা ও যাকাত দেয়ার জন্য ওহী পাঠিয়েছি। আর তাঁরা বস্তুতই আমার ইবাদাতকারী।"[৩০৩] হযরত ইসমাঈল[৩০৪] (আ.)-এর সময়েও সম্পদে যাকাত ছিল। সেই কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন, "কিতাবে ইসমাইলের কথা স্মরণ কর। সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যবাদী, আর ছিলো একজন রাসূল, একজন নবী। সে জনগণকে সালাত আদায় ও যাকাত দেয়ার জন্য নির্দেশ দিত। আর সে আল্লাহ্র কাছে পছন্দ ও সন্তুষ্টি প্রাপ্ত ছিল।"[৩০৫] হযরত ঈসা[৩০৬] (আ.)-এর সময়েও সম্পদে যাকাত ছিল। সে বিষয়ে বনী ঈসরাঈলের ওয়াদা সম্পর্কে উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন, "আর স্মরণ কর, আমি যখন বনী ইসরাইলের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এই বলে যে, তোমারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দরিদ্রদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে আন্তরিকভাবে ভালো ব্যবহার করবে, সালাত কায়িম করবে ও যাকাত দিবে।"[৩০৭] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন,

> *"আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাইলের কাছ থেকে ওয়াদা গ্রহণ করেছেন। আমি তাদের মধ্য থেকে বারো জন দলপ্রধান প্রেরণ করলাম। আর আল্লাহ্ বলেন, আমি*

---

[৩০০] M. Zohurul Islam FCA, *Al- Zakah, A Hand Book of Zakah Administration*, ibid. P. 12

[৩০১] ইব্রাহীম, উপাধি- খালীলুল্লাহ, শব্দটির কয়েকটি রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। যথা ইবরাহীম নামটি দুই ভাবে উল্লেখ হয়েছে; প্রথমত আবরাম অর্থাৎ মর্যাদাবান-এর পিতা, ইবরাহীম (আবূ রাহম অর্থাৎ বহু গোত্রের পিতা)। আল কুর'আনে ২৫টি সূরায় ৬৯ বার তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া 'ইবরাহীম' নামে আল-কুর'আনু'ল করীমে একটি সূরা রয়েছে, যা মক্কায় নাযিল হয়। (সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৬, পৃ. ৬৬৫-৬৬৭)

[৩০৩] আল কুর'আন, সূরা আল আম্বিয়া: ৭৩

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

[৩০৪] ইসমাঈল (আ.) একজন প্রসিদ্ধ নবী, কুরাইশ বংশের আদি পিতা, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রিয়তম ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। কুর'আন কারীমে উল্লেখ হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) বৃদ্ধ বয়সে একজন পুণ্যবান সন্তানের জন্য দু'আ করেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর। অতঃপর আমি তাকে এক হালীম (স্থিরবুদ্ধি ও ধৈর্যশীল) পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।" এই দু'আর ফলেই হযরত ইসমা'ঈল (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইসমা'ঈল (আ.) ছিলেন হযরত হাজিরা (আ.)-এর গর্ভজাত সন্তান। (সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯)

[৩০৫] আল কুর'আন, সূরা মারইয়াম: ৫৪-৫৫

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

[৩০৬] ঈসা ইবন মারইয়াম (আ.), বনী ইসরাঈলের শেষ নবী এবং হযরত মারইয়াম (আ.) এর পুত্র। তাঁর বংশ তালিকা- ঈসা ইব্ন মারইয়াম বিন্ত 'ইমরান ইব্ন পাশাম ইব্ন উমূন ইব্ন মীশা ইব্ন হায়কি'য়্যা ইব্ন আহ'রীক ইব্ন মূছি'ম ইব্ন 'আযাযিয়া ইব্ন আমসি'য়া ইব্ন আহ্রীহ্ ইব্ন য়াসিম ইব্ন য়াহফাশাত ইব্ন ঈশা ইব্ন ইয়ান ইব্ন রুণ্ডব'আম ইব্ন ইব্ন সুলাইমান (আ.) ইব্ন দাউদ (আ.)। (সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৫)

[৩০৭] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ৮৩

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.

তোমাদের সাথেই রয়েছি, যদি তোমরা সালাত কায়িম কর, যাকাত দাও এবং আমার নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো, তাদের সহযোগিতা কর। আর আল্লাহ্‌কে করযে হাসানা দাও, তাহলে আমি তোমাদের থেকে সব খারাপ ও দোষ দূর করে দিব এবং তোমাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিম্নদেশ থেকে ঝরনাধারা সতত প্রবহমান। আর এরপরও যে কুফরী করবে, সে তো সঠিক সরল পথ হারিয়ে ফেলল।"[৩০৮]

আল্লাহ্ তা'আলা শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলগণের সময়ে দরিদ্রদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাতব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করেছিলেন। "তাওরাত ও ইনজীল-এ দুর্বল ও দরিদ্র লোকেদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের নির্দেশ দেয়া আছে। বিধবা, এতিম, দুর্বল ও অক্ষম লোকদের অধিকার আদায়ের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"[৩০৯] যেমন হযরত ঈসা (আ.) জন্মের পর লোকেদের সাথে কথা বলার সময় তিনি যাকাতের প্রসঙ্গে বলেন, "এবং আমি যেখানে থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করে দেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।"[৩১০]

সময়ের পথপরিক্রমায় প্রায় সকল জাতির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যাকাতের নির্দেশনা এসেছে। আহলে কিতাব অনুসারীদের প্রতি যাকাতের নির্দেশনা ছিল, সে কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ বলেন, "তাদেরকে তো এছাড়া আর কোনো নির্দেশই দেয়া হয়নি যে, তাঁরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে, সালাত কায়িম করবে এবং যাকাত দিবে, এটাই সত্য ও সঠিক দীন।"[৩১১] অন্যত্র বলা হয়েছে, "আমি তাঁদেরকে নেতা করলাম, তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো, আমি তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, সালাত কায়িম করার এবং যাকাত দান করার এবং তাঁরা আমার ইবাদাত করতো।"[৩১২] এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য নবীদের সময়েও যাকাত বাধ্যতামূলক করেছিলেন।

---

[৩০৮] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ১২

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

[৩০৯] ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে যাকাত বিধান*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

[৩১০] আল কুর'আন, সূরা মারইয়াম: ৩১

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

[৩১১] আল কুর'আন, সূরা আল বাইয়্যিনা: ৫

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

[৩১২] আল কুর'আন, সূরা আম্বিয়া: ৭৩

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ সালাতের সাথে যাকাতের পারস্পরিক গুরুত্ব

সালাত যেমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত ঠিক তেমনি যাকাতও সমান গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। ইচ্ছাকৃত সালাত ছেড়ে দিলে যেমন মুসলিম পরিচয় রহিত হয়ে যায় ঠিক তেমনি যাকাত ছেড়ে দিলেও মুসলিম পরিচয় রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে আটাশটি আয়াতে সালাত ও যাকাত আদায়ের কথা একত্রে বলেছেন।[৩১৩] সালাত ও যাকাত একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অথচ আমাদের সমাজে সালাত বা নামাযকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে আদায় করা হয় যাকাতকে সেভাবে আদায় করা হয় না। যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আর আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে বত্রিশটি আয়াতে যাকাতের কথা বলেছেন।[৩১৪] সালাতের মাধ্যমে যেমন বান্দার সাথে আল্লাহ্র সরাসরি সর্ম্পক সৃষ্টি হয় তেমনি যাকাত আদায় করার মাধ্যমেও আল্লাহ্ সাথে তাঁর বান্দার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে একটি বাদ দিয়ে অন্যটি পালন করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ্র অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে হলে সালাত ও যাকাতকে সমান গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে হবে। তা না হলে ঈমানের পূর্ণতা আসবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর সালাত কায়িম কর, যাকাত দান কর এবং সালাতে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়।"[৩১৫] বস্তুত ইসলামে সালাত এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো অবকাশ নেই। তাই যারা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী সালাত কায়িম করবে, দরিদ্র ও সুবিধাবিঞ্চতদের জীবনমান উন্নয়নে যাকাত প্রদান করবে এবং যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সহায্য-সহযোগিতা করবে, তারা অবশ্যই পুরস্কৃত হবে। অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে এবং তাদেরকে নির্ভয় দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোনো শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"[৩১৬]

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের পরিচয় দিতে গিয়ে সালাত কায়িম করা ও যাকাত দানের কথা বলেছেন এবং তা পরিপালনে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আল্লাহ্ আগেও তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম এবং কুর'আনের মধ্যেও তোমাদের নাম এটিই, যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন এবং তোমরা

---

[৩১৩] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী অর্থনীতি*, জমজম প্রকাশনী, ঢাকা-২০১২, পৃ. ২২৯

[৩১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

[৩১৫] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ৪৩

وَأَقِيمُواالصَّلَاةَ وَآتُواالزَّكَاةَ وَارْكَعُوامَعَ الرَّاكِعِينَ

[৩১৬] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ২৭৭

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

সাক্ষী হও লোকদের উপর। অতএব, সালাত কায়িম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌র রশি শক্ত করে ধর।"[৩১৭] আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং যাকাত দানকারীরাই মূলত মুসলিমদের বন্ধু, সে কথা জানিয়ে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের বন্ধু তো কেবল আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা সালাত কায়িম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্‌র সামনে বিনীত হয়।"[৩১৮] আর আল্লাহ্ তা'আলা এই সব ইবাদাতকারী ও আল্লাহ্‌ভীরু মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, "নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়িম করেছে সালাত ও আদায় করে যাকাত; আর আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৩১৯] এজন্য আল্লাহ্‌র কাছে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে অবশ্য সালাত কায়িমের সাথে সাথে যাকাতও যথার্থভাবে আদায় করতে হবে। তবেই মুসলিম হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। এজন্য যাকাতের ব্যাপারে অবহেলা করার কোনো সুযোগ কোনো মুসলিমের নেই।

আল্লাহ্‌র দেয়া এ বিধি-বিধানসমূহকে সঠিকভাবে পরিপালন করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা পরিপূর্ণভাবে পালনে সচেষ্ট হতে হবে। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। আর এই কাজগুলো সঠিকভাবে করা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ তিনিই জীবন্ত কুর'আন এবং পরিপূর্ণ ইসলাম। তাঁর দিক-নির্দেশনা ও অনুমোদন ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় কোনো ইবাদাত গ্রহণযোগ্য হবে না। সকল ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্য তিনি যেভাবে যাকাত আদায় করতে বলেছেন ঠিক সেভাবেই আদায় করতে হবে এবং সেটিই সঠিক পন্থা। এর আর কোনো বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "সালাত কায়িম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।"[৩২০]

আল্লাহ্ তা'আলা ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ব্যবধান কমিয়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সকল কালের, সকল সময়ের ও সকল অবস্থায় যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহ্‌র দেয়া এ যাকাতকে অস্বীকার করে, তাহলে সে সরাসরি কুফুরীতে লিপ্ত হবে। কারণ যাকাত আল্লাহ্‌র হুকুম, এটি আদায়ে যেকোনো প্রকারের শিথিলতাই আল্লাহ্‌র হুকুমের সরাসরি

---

[৩১৭] আল কুর'আন, সূরা আল হজ: ৭৮

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ

[৩১৮] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ৫৫

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

[৩১৯] আল কুর'আন, সূরা আত তাওবা: ১৮

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

[৩২০] আল কুর'আন, সূরা আন নূর: ৫৬

وَأَقِيمُواالصَّلَاةَ وَآتُواالزَّكَاةَ وَأَطِيعُواالرَّسُول لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ

বিরোধিতা। যাকাত প্রদান করে যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, অন্যদিকে তা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভেও সহায়তা করে।[৩২১] এজন্য যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করবে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি, যার ভয়াবহতা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। যাকাত বিষয়ে আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা অধিকারসমূহ কেবল নির্ধারণই করেননি বরং প্রত্যেক হকদারের স্থানে স্বয়ং নিজের সত্তাকে রেখেছেন, যাতে কোনো ব্যক্তির উপর সংশ্লিষ্ট ফরয আরোপিত হলে সে যেন অনুভব করে যে, সে এই অধিকার কোনো ব্যক্তিকে না বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে দিচ্ছে।"[৩২২] এজন্য যাকাত দানে উপযুক্ত ব্যক্তি সর্বদা যাকাত প্রদান করবেন। কেউ যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়েও যাকাত প্রদান না করে তার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি রয়েছে। তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অত্যন্ত ভয়াবহ কঠিন আযাবের কথা স্মরণ করে দিয়ে বলেন, "হে নবী এদের বলে দাও, আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ। আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় যে, একজনই মাত্র তোমাদের প্রভু, কাজেই সোজা তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হও এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা যাকাত দেয় না এবং আখিরাত অস্বীকার করে।"[৩২৩]

সমাজে বিদ্যমান দারিদ্র্য সমস্যা থেকে মানবজাতিকে রক্ষার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক সচ্ছল মুসলমানের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন। কারণ সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকুক তা আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না। তিনি চান এটি মানুষের কল্যাণে ব্যয় হোক, সমাজে অর্থনীতির চাকা গতিশীল থাকুক।[৩২৪] কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত কল্যাণময় এই যাকাতব্যবস্থা বাদ দিয়ে যারা নিজেদের সম্পদ জমিয়ে রাখে, মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, তাদের জমানো সম্পদ তাদের কল্যাণকর কাজে আসবে বলে মনে করে, তবে তারা অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ্‌র এই আদেশ যারা মানবে না তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলবেন, "তোমাদের কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারী ছিলাম না এবং আমরা অভাবগ্রস্তকে খাবার দান করতাম না।"[৩২৫] এজন্য আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানের সঠিক নির্দেশনার আলোকে কাজ করতে হবে। তবেই সমাজে সকলেই শান্তিতে বসবাস করতে পারবে আর সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হবে।

---

৩২১ সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২

৩২২ মুহাম্মাদ সালাউদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ১৫৬

৩২৩ আল কুর'আন, সূরা হা-মীম আস সাজদাহ: ৬-৭

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ – الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

৩২৪ সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯

৩২৫ আল কুর'আন, সূরা আল মুদ্দাসসির: ৪২-৪৪

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ– قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ – وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব

মানবজাতি সূচনালগ্ন থেকেই মানবসভ্যতার উন্নয়নে একটি সামাজিক কাঠামোয় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এটি এমন সামাজিক কাঠামো ছিল, যার মধ্যে তৎকালীন জনগোষ্ঠী সুশৃঙ্খলভাবে নেতার আদেশ মেনে নিরাপত্তাসহ বসবাস করতো। রাষ্ট্রের উৎপত্তির নির্ধারিত দিনক্ষণ নির্ণয় নিশ্চিত করা সম্ভব না হলেও এটা নিশ্চিত যে হযরত আদম (আ.)-এর নেতৃত্বে একটি সমাজভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তখনকার সময় থেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পওয়ার জন্য, নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সামাজিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল। তাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, নবী হযরত আদম (আ.)-এর নেতৃত্বে অবশ্যই সে সময় একটি সামাজিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল। তার ধারাবাহিকতায় মানবজাতির মধ্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই কালের পরিবর্তন ও বিবর্তনে আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সময়ে তাদের চিন্তা, গবেষণা ও ধারণা দ্বারা রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের চরিত্র, রাষ্ট্রের প্রকার এবং রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত স্তর বিন্যাসসহ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে সেই সকল পথ ও পদ্ধতিগুলো ত্রুটিপূর্ণ ছিল। যা প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে অধিকার, সাম্য, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা মানবজাতির ইতিহাসে এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সর্বোত্তম আধুনিক ন্যায়বিচারভিত্তিক ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার মর্যাদা লাভ করেছে। এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সব মানুষের অধিকার, সাম্য, নিরাপত্তা নিশ্চিত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীতে প্রতিটি মানবসন্তান স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করে। সেজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সাম্যের ভিত্তিতে সকল শ্রেণির মানুষের অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র প্রদত্ত আইন অনুসারে মুসলিম, অমুসলিম, অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জান-মালের সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সকলের ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলার নিবিঘ্ন পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা। সকল নাগরিকদের সমঅধিকারের ভিত্তিতে মৌলিক অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং সকল প্রকার আইনানুগ স্বাধীনতা ভোগ করার নিশ্চয়তা বিধান করাও রাষ্ট্রের দয়িত্ব। আবার রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হলে তা পূরণ করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের। এখানে রাষ্ট্র যেমন তার প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তেমনি নাগরিকগণও তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে রাষ্ট্র গড়ার কাজে নিয়োজিত হবেন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক কল্যাণকর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করবেন। আর যখন কোনো রাষ্ট্রে কোনো মুসলিম ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন তখন তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে ন্যায়বিচার কায়িম করবেন, যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করবেন এবং তা যথাযথ হকদারের নিকট পৌঁছে দিবেন। সকল নাগরিকের অধিকার সমানভাবে প্রদানের জন্য সচেষ্ট

হবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "এই মুমিনরা যাদেরকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তারা এমন লোক, তাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করি, তাতে সালাত কায়িম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং কল্যাণের নির্দেশ দিবে আর অন্যায়-অকল্যাণ থেকে বিরত রাখবে।"[৩২৬]

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন, বিচার ও শাসন বিভাগে হস্তক্ষেপ করে কোনো মানুষের অধিকার খর্ব করার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি শাখায় ইনসাফভিত্তিক নীতিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে মানুষের অধিকার পূর্ণ নিশ্চিত করা হয়। ফলে এখানে মানুষের পারস্পরিক লেন-দেন, কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানসহ প্রয়োজনীয় কাজ সুশৃঙ্খলভাবে করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকে না। তখন রাষ্ট্রই সকল নাগরিকের অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে কোথাও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতরা যে শুধু আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয় বরং তারা সকল ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তারা প্রয়োজনীয় মৌলিক ও মানবিক অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তা করবে।"[৩২৭] এ ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসল্লামকে নির্দেশ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> *"যেহেতু এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাই হে মুহাম্মাদ এখন তুমি সেই দীনের দিকেই আহ্বান জানাও এবং যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো সেভাবে দৃঢ়তার সাথে তা আঁকড়ে ধরো এবং এসব লোকের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করো না। এদের বলে দাও, আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার উপর ঈমান এনেছি। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করি। আল্লাহ্ই আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব তিনিই, আমাদের কাজকর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো বিবাদ নেই। একদিন আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে।"*[৩২৮]

---

[৩২৬] আল কুর'আন, সূরা আল হজ: ৪১

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

[৩২৭] আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ৫৮

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

[৩২৮] আল কুর'আন, সূরা আশ শূরা: ১৫

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন প্রত্যেক নবী-রাসূল দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়বিচারের কথা বলেছেন। যে কারণে নবী-রাসূলগণের সময়ে দরিদ্র মানুষেরা দলে দলে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন,

"পূর্ব পশ্চিমে মুখ ফিরানোতে তোমাদের জন্য কোনো পুণ্যের কাজ নেই বরং নেক কাজ হলো সেই ব্যক্তির জন্য, যে ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল কিতাবের প্রতি, নবীদের প্রতি, আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে আত্মীয়দের জন্য, এতিমদের জন্যে, মিসকীনদের জন্যে, পথিকদের জন্যে, সাহায্য প্রার্থীদের জন্যে এবং মানুষকে গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার জন্য। আর সালাত কায়িম করে যাকাত দান করে। যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং বিপদে-অনটনে ও হক-বাতিলের সংগ্রামে ধৈর্য ধরে। তারাই সৎ, সত্যাশ্রয়ী ও মুত্তাকী।"[৩২৯]

[৩২৯] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ১৭৭

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের সামাজিক অধিকার

মানবজাতি সৃষ্টির শুরু থেকেই সমাজবদ্ধ হয়ে বসাবাস করে আসছে। তার ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের উপর ভিত্তি করে মানুষের মাঝে শ্রেণিবিন্যাস হয়েছে। সেই শ্রেণিবিন্যাসে তৈরি হয়েছে মানুষের মাঝে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু ইত্যাদি শ্রেণি বিভাজন। যে বিভাজনের কারণে মানুষের মাঝে দম্ভ, অহমিকার সৃষ্টি হয়েছে। একজন অন্যের চেয়ে বড় প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। এ প্রচেষ্টায় ধনীরা দরিদ্রদের থেকে আলাদা করে নিজেদেরকে উন্নত পর্যায়ে অধিষ্ঠিত করে শ্রেণি বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত করছে। যে শ্রেণি বৈষম্যের কারণে দরিদ্রদের অবস্থান হয়েছে দাস বা চাকর হিসেবে। যার ফলে ধনীরা সর্বদা দরিদ্রদের অধিকার বঞ্চিত ও নিগৃহীত করে চলেছে। অথচ আল্লাহ্‌র দরবারে ধনীদের তুলনায় দরিদ্ররা বেশি তাড়াতাড়ি মর্যাদাসম্পন্ন হবে। আর পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা দরিদ্রদেরকে ধনীদের তুলনায় শত শত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "দরিদ্র মুমিন সম্প্রদায় ধনীদের তুলনায় অর্ধ দিবস অর্থাৎ পাঁচশ' বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩৩০] এতদসত্ত্বেও পৃথিবীতে দরিদ্রদের উপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চলমান রয়েছে। আর এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে পারে কেবল ইসলাম। সামাজিক অধিকার গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলাম কোনো স্তরভেদ বা বৈষম্য নির্ধারণ করে দেয়নি বরং সেখানে মানুষের সকল অধিকার সংরক্ষিত রেখেছে। যেখান থেকে সবাই প্রয়োজনমতো নিজের ও অপরের অধিকার গ্রহণ ও প্রদান করতে পারে। সৃষ্টিগতভাবে মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য, জন্মগ্রহণ, জীবনধারণের প্রক্রিয়াসহ সকল জৈবিক প্রয়োজন একই ধারার হয়। এক্ষেত্রে জীবনধারণ করার জন্য ধনীরও যা প্রয়োজন, দরিদ্রেরও তা প্রয়োজন হয়। আল্লাহ্ এই প্রক্রিয়ায় মানুষের মাঝে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করে দেন নি। এখানে সকলেই মানুষ বা মানবজাতি হিসেবে গণ্য।

মানুষের মাঝে বৈষম্য কোনোভাবেই কাম্য নয় বরং সকল ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার সমান হওয়ায় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তা না হয়ে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। যা এই সমাজব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা পেয়েছে। এর ফলে মানুষের মাঝে বৈষম্য ও বিভাজন বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের রিযিক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর ফলে পরিশ্রম করে কেউ কাঙ্ক্ষিত সম্পদ বা তার চেয়ে বেশি পেয়ে যায়, আবার কেউ পায় না। আবার কেউ বা অল্প পরিশ্রম বা কোন পরিশ্রম ছাড়াই তা লাভ করে। কারণ সম্পদশালী হওয়া বা না হওয়া কোনো ব্যক্তির যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। এটি আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের উপর নির্ভর করে। তিনি কাউকে সম্পদ দেন পরীক্ষা করার জন্য আবার কাউকে সম্পদহীন করেন তাও পরীক্ষা করার জন্য। তাই এটি সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, সম্পদের উপর ভিত্তি করে মানুষের

---

[৩৩০] মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, ৩য় খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুয যুহ্‌দ, বাবু মানযিলাতিল ফুকারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০২, পৃ. ৫৬১

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم ، بمقدار خمسمائة سنة "

মর্যাদা নির্ভর করে না। কারণ আল্লাহ্ মানুষকে মানুষ হিসেবে সমান মযর্দা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।[৩৩১] যদিও মানুষের সামাজিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে মানুষের মাঝে অবস্থানগত ভিন্নতা বা ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু মৌলিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে সকলেই সমান হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই সকলের উচিত, মানুষের মাঝে কোনো বৈষম্য না করে প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে দেয়া।

প্রকৃত অর্থে মানুষের মর্যাদা নির্ভর করে তার অন্তর বা মনোজগতের উৎকর্ষতা ও তার কৃতকর্মের উপর। যার অন্তরের স্তর যত উন্নত এবং যার কৃতকর্মগুলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষের কল্যাণে নিবেদিত হয়, আল্লাহ্র কাছে সেই মানুষ তত বেশি উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু এই পরিমাপ প্রকৃত অর্থে মানুষ করতে পারে না। কারণ একজন মানুষ আর একজন মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। এর ফলে কাউকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এই পরিমাপ করার ক্ষমতা কেবল মহান আল্লাহ্ তা'আলার রয়েছে। তিনি মানুষদেরকে মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের সম্পদ ও বাহ্যিকতা দেখেন না। দেখেন তাদের অন্তরের লুকানো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে প্রকাশিত কর্মগুলো। যা একজন মানুষ তার অন্তরের মধ্যে লালন করে। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের বহ্যিক চেহারা ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি তোমাদের কার্যকলাপ ও অন্তরের দিকে লক্ষ রাখেন।"[৩৩২]

পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের বসবাসের জন্য মানবিক মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করা আবশ্যক। যা প্রত্যেক মানবসন্তান ভোগ করার অধিকার রাখে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এই অধিকারগুলোকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। যা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না এবং তা করারও কোন অধিকার কারোর নেই। আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকারগুলো একে অন্যকে প্রদান করলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় একে অন্যের সাহায্যকারী, কল্যাণকামী হয়ে যায়। আর যাদি তা না করা হয় তবে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে অবস্থান করে। এর ফলে সেখানে প্রতারণা ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। এজন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না বরং প্রত্যেককেই প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও অধিকার দিতে হবে। কারণ মানুষের জন্মগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ যে নিয়ম-বিধান দিয়েছেন তা কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের কোনো ক্ষমতাও কাউকে দেয়া হয়নি।[৩৩৩]

---

৩৩১ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, খায়রুন প্রকাশনী, সপ্তম প্রকাশ, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ১২

৩৩২ ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, ৩য় খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুয যুহ্দ, বাবুল কানা'আহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১
قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلا أَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

৩৩৩ মুহাম্মাদ সালাউদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

মানুষের জীবন পরিচালনার পথপরিক্রমায় সম্পদ ও অর্থ উপার্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে অর্থ ও সম্পদ উপর্জনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন। যা মানুষ পূর্ণভাবে দিতে পুরোপুরি অক্ষম। কারণ নিজের আত্মাকে খুশি করার প্রবণতার কারণে মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে বিদ্যমান। তাই মানুষের পক্ষে এ ধরনের সাম্যভিত্তিক ন্যায় বোধ থেকে উৎসারিত কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রায় অসম্ভব। সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে পৃথিবীতে নিজ নিজ ন্যায় সঙ্গত অধিকার ভোগ করার জন্য একটি নীতিমালা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। যে নীতিমালার বাইরে অন্য কোনো পন্থা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য হবে না। যা সময়ের ধারাবাহিতকায় বার বার প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নিজেদের তৈরি করা যেসব বিধি-বিধান নির্ধারণ করে নিয়েছে তা বাস্তবায়ন করলে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বরং তাতে অনিয়ম, দুর্নীতি, বিচারহীনতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে মানুষের মাঝে বৈষম্য বৃদ্ধি করে। এই বৈষম্য দূর করতে হলে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনবিধানকে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান হিসেবে মেনে নিতে হবে। তবেই সামাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সামাজিক বৈষম্য রোধ হয়ে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করে নিজেদের মনগড়া কিছু করা যাবে না। কারণ আল্লাহ্ যা দিয়েছে তা অপরিবর্তিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "...আল্লাহ্ তৈরি কাঠামো পরিবর্তন করা যায় না। এটা সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক দীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।"[৩৩৪]

আল্লাহ্ তা'আলা অর্থ উপর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি এমন কোনো পন্থায় উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন, যে উপার্জন ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, অনেক মানুষ সম্পদশালী হওয়ার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেয়। অনেকেই ক্ষমতাশালীদের সাথে যোগসাজস করে অন্যের সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে দখল করে। এই পন্থায় সম্পদ উপার্জন করলে অনেকের ব্যক্তিগত সম্পদ ও জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট হয়, অন্যের অধিকার খর্ব হয় এবং অন্যরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আর এ ধরনের অবৈধ পন্থায় উপার্জন অব্যাহত থাকলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। সর্বোপরি সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে। বেশিরভাগ সম্পত্তিশালীরা সম্পদকে শুধু তাদের অধিকার হিসেবে মনে করে। সেখান থেকে তারা দরিদ্র ও বঞ্চিতদের জন্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করে এবং উক্ত সম্পদকে তারা নিজেদের অর্জিত বলে দম্ভ করে। অথচ তাদের সম্পদ যদি আল্লাহ্র নির্দেশমত অভাবী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের প্রদান না করে তবে ঐ সম্পদই তাদের জন্য ক্ষতির একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দীনার, দীরহাম ও মূল্যবান চাদরের গোলামেরা ধ্বংস হোক। আল্লাহ্ এদেরকে

---

[৩৩৪] আল কুর'আন, সূরা আর রূম: ৩০

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

আধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। জাহান্নামের কাঁটার খোঁচা খেয়েও সে বের হতে পারবে না।"[৩৩৫]

কোনো কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে সম্পদ ভোগ করার জন্য প্রতারণার পন্থা অবলম্বন করে, শক্তির জোরে মানুষের সম্পদ দখল করে অথবা সম্পদের লোভে কাউকে হত্যা করে। এসব ঘৃণিত কাজে যারা লিপ্ত হয় তাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি কেউ এ কাজ করা থেকে বিরত না থাকে তবে তাদের জন্য চরম শাস্তির কথা আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন। এজন্য ঘৃণিত এসব পথ থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা নিজেরা পরস্পরের অর্থ-সম্পদ অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না। আর জেনে বুঝে অপরাধমূলক পন্থায় অপরের সম্পদের কিছু অংশ ভক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তা শাসকদের কাছে উপস্থাপন করো না।"[৩৩৬] এ প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এসব ব্যক্তিদের উপদেশ দিয়ে বলেন, "হে লোকেরা, যারা ঈমান এনেছো! তোমরা নিজেদের মধ্যে অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারো। আর নিজেকে নিজে (কিংবা পরস্পরকে) তোমরা হত্যা করো না। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের প্রতি কৃপাময়।"[৩৩৭] কিন্তু যারা সম্পদের মোহে অন্যের সম্পদ দখল করে, ভোগ করে তাদের জন্য রয়েছে চরম শাস্তি। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার ঘাড়ে সাত তবক জমি লটকিয়ে দিবেন।"[৩৩৮]

নির্ধারিত সীমানার বাইরে সম্পদ উপার্জন করাকে ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্বের সমাজব্যবস্থায় যখন কোনো ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় নি তখন মানুষ একে অন্যের কাছে তাদের সঞ্চিত সম্পদ আমানত (জমা) রাখতো। সেই আমানাতদারি ছিল অনেক কঠিন, তথাপি তা করতে হতো। কখনো কখনো সেই আমানতকে রক্ষার জন্য সর্বোত্তম ত্যাগও করতেন। এমনকি কখনো কখনো নিজের জীবনও বিলিয়ে দিতেন। আর ইসলাম এভাবেই আমানাতদারির কথা বলেছে।

---

[৩৩৫] ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, ৩য় খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল যুহ্দ, বাবুন ফীল মুকছিরীনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯
عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة . تعس وانتكس وإذا شيك ، فلا انتقش "

[৩৩৬] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ১৮৮
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

[৩৩৭] আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ২৯
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[৩৩৮] ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, ৫ম খণ্ড, (অনু: বা.ই.সে.) কিতাবুল মুসাকাহ ওয়াল মুযারাআহ্ (বাগান ও জমির ভাগচাষ), অনুচ্ছেদ: জুলুম করা, অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পত্তি দখল ইত্যাদি হারাম, ঢাকা-২০০২, পৃ. ৩৮০
قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، : مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ.

কারণ আমানতকারী সম্পদ ফেরত না পেলে উক্ত আমানতকারী ও তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দারিদ্র্যে পতিত হয়। তখন সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এবং উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার পরিবার সমাজের জন্য বোঝা হয়ে উঠে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা খিয়ানতকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি কেউ যদি কারো আমানত খিয়ানত করে তথাপি উক্ত খিয়ানতকারীর আমানত খিয়ানত করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার কাছে যে আমানত রেখেছেন, তা তাকে প্রত্যার্পন কর এবং যে তোমার খিয়ানত করেছে, তার খিয়ানত করো না।"[৩৩৯] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর যে আত্মসাৎ (জনগণের অর্থ-সম্পদ খিয়নত) করবে, কিয়ামতের দিন সে অবশ্যই এ আত্মসাৎসহ হাজির হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেখানে তার কৃতকর্মের পরিপূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা হবে।"[৩৪০] এ প্রসঙ্গে আরো একটি হাদীস, "ইবনে মাসঊদ (রা.) সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশে (মিথ্যা) কসম করবে (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন।"[৩৪১]

অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এর ফলে কিছু মানুষ নতুন করে দরিদ্রতার মধ্যে নিপতিত হয়। আর সম্পদ দখলকারী ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। সেখানে দরিদ্রতার হার গতি পেতে থাকে। সম্পদ অবৈধভাবে দখল না করে বরং সমঝোতার ভিত্তিতে লেনদেন বা ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়। সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য করলে সম্পদের মালিকের সাথে ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে এবং একে অপরের উপর আস্থা তৈরি হয়। সর্বোপরি, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ইসলাম সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ কারাকে হারাম করেছে। কিন্তু কেউ তা করলে তার জন্য রয়েছে অত্যন্ত কঠিন আযাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা অবৈধ পন্থায় একে অপরের অর্থ-সম্পদ ভোগ-ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে তোমাদের মাঝে লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্য হতে পারে।"[৩৪২] কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ্র দেয়া নির্দেশ অমান্য করে শয়তানের দাসে

---

[৩৩৯] ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ আত্-তিরমিযী, *সহীহ আত্-তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, (অনু:), অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য, অনুচ্ছেদ: আমানতদারি রক্ষা করা, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ঢাকা-২০১০, পৃ. ৭৬

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : " أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى من ائتمنك ، وَلَا تخن من خانك "

[৩৪০] আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ১৬১

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

[৩৪১] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৪র্থ খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুশ শাহাদাত, বাবুল ইয়ামিনি বা'দাল আছর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৪০৬

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

[৩৪২] আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ২৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

পরিণত হয়, তখন শয়তান তাকে অন্যের সম্পদ অবৈধভবে ভোগ, লুণ্ঠন করতে আরো বেশি প্রলুব্ধ করে। কারণ সম্পদের মোহ মানুষকে অন্ধ করে তোলে। ফলে তার ন্যায়-অন্যায় বোধ হারিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে একটি হদীস, "আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে।"[৩৪৩]

আল্লাহ্ মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা স্থির করে দিয়েছেন, যা অপরিবর্তনীয়। সে নীতিগুলো বাস্তবায়ন হলে পৃথিবী শান্তিময় হয়ে উঠবে। কিন্তু মানুষ যখন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হানাহানি, মারামারি, অনাচার, যৌনাচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন মানুষের মাঝে মায়া-মমতা ও ভালোবাসা, প্রীতি, বন্ধন ও ন্যায়বিচার থাকে না। ফলে সেখানে মারামারি, হানাহানি, খুন, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনসহ সকল প্রকার অপরাধ সংগঠিত হয়। এসবের কারণে সেখানেই দরিদ্ররা আরো বেশি নির্যাতিত ও নিগৃহীত হতে থাকে। এ অবস্থায় দারিদ্র্যের কঠিন যাতাকলে পিষ্ট হয়ে সকল স্নেহ, মায়া ও মমতা জলাঞ্জলি দিয়ে কখনো কখনো নিজ সন্তানদেরও হত্যা করে ফেলে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা দরিদ্রদের ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়ে বলেন, "দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমি তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করি এবং তাদেরও জীবিকার ব্যবস্থা করি।"[৩৪৪]

দারিদ্র্যের কষ্টকে ধৈর্যের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে। এ ব্যাপারে হতাশ হওয়া যাবে না এবং নিজের দারিদ্র্য অন্যের সামনে প্রকাশ করা যাবে না। নিজের দারিদ্র্য শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সামনে প্রকাশ করতে হবে তবে তিনি তা দূর করে দিবেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি দারিদ্র্যপীড়িত হয়ে তা মানুষের নিকট প্রকাশ করে- আল্লাহ্ তার দারিদ্র্য দূর করেন না। অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি তা আল্লাহ্র কাছে পেশ করে আল্লাহ্ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন- হয় দ্রুত মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা সম্পদশালী করার মাধ্যমে।"[৩৪৫] কঠিন অভাবের মধ্যে থাকলেও আল্লাহ্র প্রতি আস্থা স্থাপন করে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস,

---

[৩৪৩] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৪র্থ খণ্ড, (অনু: ইফাবা), কিতাবুল বুইউ', বাবু মান লামু ইউবালু মিন হাইসু কাসাবাল মাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال :يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم الحرام.

[৩৪৪] আল কুর'আন, সূরা আল আন'আম: ১৫১

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ

[৩৪৫] আবূ দাউদ, *আস্ সুনান*, ২য় খণ্ড, (অনু: ইফাবা), কিতাবুয যাকাহ, বাবুন ফিল ইসতি'ফাফ, ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০০৬, পৃ. ৪২৮

عن عبد الله ابن مسعود –قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل"

"আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত। একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কতিপয় আনসারী কিছু চাইলে তিনি তাদেরকে দান করলেন, তারা পুনারায় চাইলেন তিনি তাদেরকে পুনরায় দান করলেন। এভাবে দান করতে করতে তাঁর সম্পদ শেষ হয়ে গেলো। তখন তিনি বললেন, আমার কাছে সম্পদ থাকলে আমি তোমাদেরকে না দিয়ে তা জমা করে রাখি না। কেউ চাওয়া থেকে পবিত্র থাকতে চাইলে আল্লাহ্ তাকে পরিত্র রাখেন। যে অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, আল্লাহ্ তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন এবং যে ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ্ তাকে তাই দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম এবং ব্যাপক আর কিছু দান করা হয়নি।"[৩৪৬]

মানুষের মাঝে অন্যের সম্পদ যেকোনোভাবে ভোগ করার কুপ্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সেই কুপ্রবৃত্তির অধীনতা না মেনে সত্য ও সুন্দরের মাঝে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাতে শয়তানের প্ররোচনায় কেউ অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করতে উৎসাহিত না হয় বরং তারা এমনভাবে নিজেদের তৈরি করবে যে, একে অন্যের প্রতি সম্মান রেখে নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। এর ফলে তারা নিজেদের মাঝে সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবসাও পরিচালনা করতে পারে। এটি না করে যদি কেউ কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ দখল করে, তখন সম্পদের প্রকৃত মালিক সম্পদহীন হয়ে দরিদ্রতার মধ্যে পড়বে। এ অবস্থায় ঐ ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণ সম্পদ হারিয়ে হতাশায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই হতাশা তা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যখন তাদের বেঁচে থাকাও দুরূহ হয়ে পড়ে। অনেক সময় ব্যক্তি সম্পদ হারিয়ে দরিদ্রতার নির্মম কষাঘাত ও হতাশা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে ফেলে। অথচ আল্লাহ্ আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয়ই জানো, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি মেহেরবান।"[৩৪৭] এছাড়াও কখনো কখনো মানুষ দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জীবনাধিক প্রিয় সন্তানকে অন্যের কাছে বিক্রি করে জীবন ব্যয় নির্বাহ করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন। যারা এ অবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি আস্থা রেখে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী চলবে অবশ্যই তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে সাজিয়েছেন মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগপণ্য ও সামগ্রী দিয়ে। তিনি এই ভোগ্যপণ্য ও সামগ্রী দিয়েছেন যাতে মানুষ এগুলো ভোগ করে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে, তাঁর নির্দেশ মেনে সত্য ও ন্যায় অনুসারে নির্ধারিত সীমানার মধ্যে জীবনযাপন করে। কিন্তু

---

[৩৪৬] আবূ দাউদ, *আস্ সুনান*, ২য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাহ, বাবুন ফিল ইসতি'ফাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِنَّ نَاسًا مِنْ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ : "مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ".

[৩৪৭] আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ২৯
وَلَاتَقْتُلُواأَنفُسَكُمْۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

মানুষের বৈরাগ্যনীতি অবলম্বন করা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। সকল ক্ষেত্রে মানুষের জন্য মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, সহিষ্ণু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এবং অভাবী, দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য সম্পদশালীদের নির্দেশ দিয়েছেন। সম্পদশালীরা তারা তাদের সম্পদ যেমন নিজেদের জন্য খরচ করবে, ঠিক তেমনি আত্মীয়, প্রতিবেশী ও দরিদ্রদের জন্যও খরচ করবে। যারা তাদের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করবে, তাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিবে না বরং তারা তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে। এভাবে যারা সম্পদ খরচ ও ভোগের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচালনা করবে তাদের জন্য থাকবে পুরস্কার। এর কোনো ব্যতিক্রম হলে তাদের জন্য ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- প্রাচুর্যের মালিকদের ধ্বংস অনিবার্য, তবে যারা ডানে, বাঁয়ে, সামনে পিছনে (আল্লাহ্‌র পথে) নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তারা ব্যতীত।"[৩৪৮]

পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে এবং জীবন পরিচালনা করতে অর্থ উপার্জন করে প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যয় করতে হয়, কিন্তু আয়-ব্যয় অনিয়ন্ত্রিত না হয়ে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত পন্থায় হতে হবে। আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত পন্থায় না হলে মানুষের কুপ্রবৃত্তির গোলাম হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এজন্য যখন সম্পদ উপার্জন করবে তা অবশ্যই বৈধ পন্থায় করতে হবে। কোনোভাবেই সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা যাবে না। কারণ অবৈধ পন্থায় সম্পদ আহরণ করলে সমাজের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করলে মানুষের স্বাভাবিক বিবেকবোধ নষ্ট হয়ে যায়। তখন মানুষ যেকোনো অন্যায় করতে কুণ্ঠিত হয় না। এরকম অবস্থায় কিছু মানুষ অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের সম্পদ জোরপূর্বক দখল করার কূটকৌশল তৈরি করে। যখন মানুষ লোভে পড়ে ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এ ধরনের কাজ করতে উদ্দত হয় তখন সমাজের দুর্বল মানুষেরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, মানবতার বিপর্যয় হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কারো দাসত্ব করতে নিষেধ করেছেন। শয়তানের প্ররোচনার ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ্ বলেন, "হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না। কারণ সে তোমার প্রকাশ্য দুশমন, আর আমারই দাসত্ব কর, এটাই সরল পথ।"[৩৪৯]

মানুষ যেন ইচ্ছেমতো অবৈধভাবে আয় ও ব্যয়ে আগ্রহী হয়ে না উঠে সেজন্য ইসলাম মানুষের আয়ের যেমন পদ্ধতি দিয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ব্যয়ের পদ্ধতিও সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। এজন্য আয়-

---

[৩৪৮] ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, ৩য় খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুয যুহ্‌দ, বাবুন ফীল মুকছিরীনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৬
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِينَ ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا أَرْبَعٌ : عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَمِنْ قُدَّامِهِ ، وَمِنْ وَرَائِهِ

[৩৪৯] আল কুর'আন, সূরা ইয়াসীন: ৬০-৬১
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ - وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

ব্যয় করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন থাকা প্রয়োজন। কোনো অবস্থায় অবৈধ পন্থায় আয় ও ব্যয় করা যাবে না। কিয়ামত দিবসে আয়-ব্যয়ের হিসাব ছাড়া কোনো বান্দাকে একবিন্দু নড়তে দেয়া হবে না। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বান্দার পদদ্বয় (কিয়ামত দিবসে) এতটুকুও সরবে না। তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে যে পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা হবে? কীভাবে তার জীবনকাল অতিবাহিত করেছে এবং কী কী কাজে তার শরীর বিনাশ করেছে; তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কী আমল করেছে; কোথা হতে তার ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে ও কোন খাতে ব্যয় করেছে।"[৩৫০] এখানে আয়-ব্যয়ের অবস্থার উপরও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি নির্ভর করে। এজন্য আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে সর্বদা সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তাই কোনো জিনিস আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার ক্ষেত্রেও খুবই সচেতন হতে হবে। কোনো অবস্থায় অবৈধ পন্থায় আয় করা অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা যাবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা দানের ক্ষেত্রে সকল অবস্থায় উত্তম জিনিস দান করার কথা বলেছেন।[৩৫১] আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ তার স্বভাবগত অবস্থার কারণে কম মূল্যের বা নষ্ট জিনিস, খাদ্যদ্রব্য দান করতে উৎসাহী হয়। যদি কেউ সেটা করে তবে অবশ্যই সে তিরস্কৃত হবে।

মানুষের আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ এই বিধি-নিষেধ না থাকলে ক্ষমতাশীলরা কুপ্রবৃত্তির থাবায় অন্য সব মানুষের সম্পদ নিজেরাই ভাগ বাটোয়ারা করে দখল করতে চায়। এজন্য ইসলাম এ বিষয়কে সামনে রেখে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যাতে করে সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি মানুষ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং অন্যের অধিকার দেয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে পূর্ণাঙ্গ অধিকার ভোগ করতে পারে, কিন্তু ইসলাম প্রদত্ত সেই নীতিমালাকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে যথেচ্ছভাবে অবৈধ উপার্জন করলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইসলাম মানুষের জীবনকে সর্বোপরি, সমাজকে সুন্দর ও নিরাপদ করে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল রাখতে আগ্রহী। এজন্য সকল মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো বাস্তবায়ন হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ না হলে মানুষের মাঝে বন্ধন সুদৃঢ় হয় না এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সকল ক্ষমতার মালিক, সেহেতু মানুষের উচিত আল্লাহ্ তা'আলার

---

[৩৫০] ইমাম তিরমিযী, *সহীহ আত্-তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড, (অনু:) কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাতি, বাবুন ফিল কিয়ামাহ্, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, (দ্বিতীয় প্রকাশ), ঢাকা-২০১১, পৃ. ৪৬৪.

قال رسولَ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ".

[৩৫১] 'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা যমীন থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।' (আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ২৬৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

নির্দেশ অনুযায়ী চলা। অভাবী, দরিদ্র ও বঞ্চিতদের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করা। কারণ মানুষের রিযিক মানুষ নিজে ঠিক করতে পারে না। তা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দেন। তিনি যার জন্য যেটুকু রিযিক নির্ধারণ করেছেন তার চুল পরিমাণ কম-বেশি হবে না। তাঁর নির্ধারিত রিযিক থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। এখানে কারোর কোনো ক্ষমতা কাজে আসবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র বলেন, "তিনিই যমীনকে তোমাদের জন্য বাধ্যগত ও বশীভূত করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা এর প্রশস্ততার উপর চলাচল কর এবং আহার কর তাঁর প্রদত্ত জীবিকা থেকে। আর (জেনে রাখো) তোমাদের পুনরায় জীবিত হয়ে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।"[৩৫২] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "আমি পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রিযিকের সংস্থান করেছি এবং তাদের জন্যও রিযিকের ব্যবস্থা করেছি, যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও, এমন কোনো বস্তু নেই যার ভাণ্ডার আমার নিকট নেই, যার থেকে আমি এক পরিকল্পিত হিসাব অনুসারে বিভিন্ন সময়ে রিযিক নাযিল করে থাকি।"[৩৫৩] অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন, "আসমান ও জমিনের যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তাঁর আয়ত্তাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।"[৩৫৪]

আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত ভোগ্য নেয়ামত মানুষকে দিয়েছেন তা থেকে দরিদ্রদের অধিকারগুলো যথাযথভাবে আদায় করে দিতে হবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া নেয়ামত থেকে মানুষ জীবনধারণ করে। এজন্য সামর্থ্যবানদের উচিত আল্লাহ্র নেয়ামত স্বীকার করে অসহায় ও দরিদ্রদের জন্য খাবার প্রদান করা এবং জীবন উপকরণের ব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন পানি, অতঃপর এরই সাহায্যে তোমাদের জীবিকার জন্যে সৃষ্টি করেছেন নানা রকম ফল-ফলাদী। নৌযানকে তিনি তোমাদের নিয়ন্ত্রাধীন করেছেন, যাতে করে তাঁরই নির্দেশে তা সমুদ্রে চলাচল করে। তিনি সমুদ্রকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন।"[৩৫৫]

কৃপণতা একটি মারাত্মক ব্যাধি। কৃপণতায় আবদ্ধ মানুষ সমাজের উন্নয়নে কোনো অবদান রাখতে পারে না। কৃপণ ব্যক্তিরা না নিজেরা ভোগ করতে পারে, না পরিবারকে দিতে পারে, আর না অসহায় দরিদ্র মানুষদেরকে দিতে পারে। তারা শুধু সম্পদকে পুঞ্জীভূত করে রাখতে পারে। কৃপণতা

---

[৩৫২] আল কুর'আন, সূরা আল মুলক: ১৫
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

[৩৫৩] আল কুর'আন, সূরা আল হিজর: ২০-২১
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

[৩৫৪] আল কুর'আন, সূরা আশ শুরা: ১২
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ

[৩৫৫] আল কুর'আন, সূরা ইব্রাহীম: ৩২
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

সর্বদা পরিহার করা উচিত। কৃপণতা পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে অর্জিত সম্পদ অভাবী, দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের মাঝে দান করতে হবে। একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন সম্পদ দান করেন ঠিক তেমনি তিনি তা আবার নিয়ে নিতে পারেন। এজন্য আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করতে হবে। কিন্তু যারা সম্পদের মায়ায় সকল প্রকার কল্যাণময় কাজ থেকে দূরে থাকবে, সম্পদকে আঁকড়ে ধরবে, দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য দান করবে না, কৃপণতার আশ্রয় নিয়ে তাদের অধিকার বঞ্চিত করবে, তাদের জন্য আল্লাহ্ কঠিন শাস্তির বিধান রেখেছেন। কারণ সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখলে তা কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না বরং তা তার ও তার পরিবারের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কৃপণতার ভয়বহতা সম্পর্কে বর্ণনা করে কৃপণতা করা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করে। তারা যেন মনে না করে এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর, বরং এটা তাদের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ প্রতিপন্ন হবে। তারা কৃপণতা করে যা কিছু সঞ্চয় করেছে, কিয়ামতের দিন সেই ধন-সম্পদকে তাদের গলার বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের মালিক। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে জানেন।"[৩৫৬] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "শুনো, তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করেছে। যারা কৃপণতা করেছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করেছে। আল্লাহ্ তো ঐশ্বর্যের মালিক, তোমরাই বরং তাঁর মুখাপেক্ষী।"[৩৫৭] তাই আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ থেকে সাহায্যপ্রার্থীকে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এটা পালন করতেন এবং তার উম্মতদেরকেও তা পালন করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস "জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন জিনিস চাওয়া হলে, তিনি কখনো না বলেন নি।"[৩৫৮]

অভাবগ্রস্ত এবং যারা দান গ্রহণকারী তাদের প্রতি সর্বদা সহানুভূতি প্রকাশ করে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। তাদের অভাব পূরণের জন্য যাদের দানের হাত প্রসারিত হয় না, দান করার ব্যাপারে আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে যারা শুধু নিজের ভোগের স্রোতে চলতে ইচ্ছুক, যারা দরিদ্র অভাবীদের সাহায্য করা হতে দূরে থাকতে আগ্রহী, যারা মনে করে সম্পদ শুধু তাদের নিজেদের

---

[৩৫৬] আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ১৮০
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

[৩৫৭] আল কুর'আন, সূরা মুহাম্মাদ: ৩৮
هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ

[৩৫৮] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৫ম খণ্ড, (অনু: তা.পা.) কিতাবুল আদব, বাবু হুসনিল খুলুক ওয়াসসাখাই ওয়ামা ইউকরহু মিনাল বুখলি, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, (চতুর্থ প্রকাশ), ঢাকা-২০১২, পৃ. ৪৫৫
عَنِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : "مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا".

কল্যাণার্থে এবং এই সম্পদ শুধু তাদের জন্য চিরস্থায়ী তাদেরকে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"[৩৫৯] যারা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করে, আল্লাহ্র রাস্তায় দান-সাদকা থেকে দূরে থাকে, যারা আল্লাহ্র দেয়া সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ ও রহমত একথা অস্বীকার করে এবং যারা নিজের দাম্ভিকতা ও গোমরাহী দিয়ে আল্লাহ্র পথ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "আর যে কৃপণতা অবলম্বন করলো এবং আল্লাহ্ বিমুখ হলো এবং কল্যাণ অস্বীকার করলো, তার জন্যে আমি কষ্টের জাহান্নামে যাওয়ার সহজ পথ দান করবো।"[৩৬০] এজন্য সব সময় কৃপণতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহ্ কাছে দু'আ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস-

> *"সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি (সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস) পাঁচটি কার্য থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই বর্ণনা করতেন। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ করতেন: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা থেকে, আমি আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা থেকে, আমি আশ্রয় চাচ্ছি অবহেলিত বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার বড় ফিত্না দাজ্জালের ফিত্না থেকে এবং আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের শাস্তি হতে।"*[৩৬১]

আল্লাহ্ তা'আলা সকল ক্ষেত্রে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কাজে সহযোগিতা করাকে সচ্ছল সকলের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন। যাতে করে সমাজের সচ্ছল মানুষগুলো কৃপণতা অবলম্ব করা থেকে বিরত থাকে। সম্পদের মোহ যখন মানুষকে অন্ধ করে তোলে তখন তারা অপরাধ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এজন্য যারা কৃপণতা পরিহার করবে এবং দরিদ্র ও অভাবীদের মাঝে দান করবে তারা সফলকাম হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "অতএব, তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্কে ভয় কর, শোনো, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর– এটাই তোমাদের জন্য

---

[৩৫৯] আল কুর'আন, সূরা আল হাদীদ: ২৪

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

[৩৬০] আল কুর'আন, সূরা আল লাইল: ৮-১০

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ

[৩৬১] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৫ম খণ্ড, (অনু: তা.পা.) কিতাবুদ দাওয়াত, বাব তা'য়াউয্যি মিনাল বুখলী আল বুখলু ওয়াল বাখালু ওয়াহিদুন মিসলুল হুযনি ওয়াল যানি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫

عن (سعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه كان (يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن) عن النبي أللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر".

কল্যাণকর। আর যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত থেকেছে, তারাই সফলকাম।"[৩৬২] তাই সর্বদা কৃপণতা পরিহার করে চলতে হবে এবং সেজন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস, "হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ্! আমি দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের আধিপত্য থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[৩৬৩]

সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া নিয়ামত। যা কোনো ব্যক্তি শুধু নিজের প্রচেষ্টা ও যোগ্যতা দিয়ে অর্জন করতে পারে না। এজন্য যারা সম্পদশালী তাদের কৃপণতা করা উচিত নয়। কারণ কৃপণতা করলে তাদের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না বরং তা অকল্যাণ বয়ে আনে। সমাজে দেখা যায়, অনেক কৃপণ মানুষ তার সম্পদ জমিয়ে রাখে আর তার মৃত্যুর পর তার সন্তানরা সেই সম্পদ নিয়ে ঝগড়া, হানাহানি, হত্যাসহ অনেক অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। অথচ উক্ত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় সম্পদ দিয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে পারতো। অর্থ-সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যয় না করে জমিয়ে রাখলে বিপদ অনিবার্য হয়ে উঠে। সেই বিপদ দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানেই ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "আল্লাহ্ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করেছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই কিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করেছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে।"[৩৬৪]

সমাজে অনেক আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখও সম্পদের মোহে কৃপণতা করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও কৃপণতার ব্যাপারে সাবধান করেছেন এবং এ ব্যাপারে উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> *"হে ঈমানদারগণ! এ আহলে কিতাবদের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায় পদ্ধতিতে খায় এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। যারা সোনা ও রুপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাময় আযাবের সুখবর দাও। একদিন আসবে যখন এ সোনা ও রুপাকে জান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তারই সাহায্যে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিছে দাগ দেয়া হবে- এ সেই সম্পদ যা*

---

[৩৬২] আল কুর'আন, সূরা আত তাগাবুন: ১৬
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

[৩৬৩] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৫ম খণ্ড, (অনু: তা.পা.) কিতাবুদ দাওয়াত, বাব তা'য়াউয্যি মিন আরযালিল 'উমুরি আরাযিলুনা আসকাতুনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫
عن أنس رضى الله عنه اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

[৩৬৪] আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ১৮০
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

তোমরা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে, নাও এখন তোমাদের জমা করা সম্পদের স্বাদ গ্রহণ কর।"[৩৬৫]

আল্লাহ্ তা'আলা নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের প্রতি সবসময় দয়াময়। তিনি সবসময় তাদের অধিকারের কথা বলেছেন। এই পৃথিবীতে নির্যাতিত ও বঞ্চিতরা খুবই অসহায়। তারা সব সময় আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে এজন্য যে, কেউ না কেউ তাদের প্রয়োজনে পাশে এসে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম হলো বঞ্চিতরা পৃথিবীতে তাদের অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করবে। আর তাই তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন ইসলাম তা করতে নির্দেশ দেয়। এছাড়াও প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের ব্যয় নির্বাহ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "বিত্তবান ব্যক্তি তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে যেন আল্লাহ্ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করে। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না।"[৩৬৬] এজন্য যার যেমন সামর্থ্য আছে তা দিয়ে সে বঞ্চিতদের সাহায্য সহযোগিতা করবে; তাদের কাজের ব্যবস্থা করবে, যাতে তারা সেখানে পরিশ্রম করে উপার্জনের মাধ্যমে তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারে।

আল্লাহ্ অভাবীদেরকে সম্পদশালীদের অধীন করে দিয়েছেন। যাতে করে অভাবীদের অভাব মোচনে তারা অবদান রাখতে পারে। যখন কোনো সম্পদশালী কোনো অভাবীকে সাহায্য করে তখন একে অন্যের কাছাকাছি আসার ফলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। তখন একে অন্যের সহযোগী হয়ে যায় এবং অভাবী ব্যক্তি তার প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকে। অভাবীদের সাহায্য করার প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা তা থেকে আহার করো এবং ধৈর্যশীল অভাবী ও যাচনাকারী অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। এভাবে আমি এদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"[৩৬৭] অভাবীদের সাহায্য করা অনেক সাওয়াবেব কাজ। এটি আল্লাহ্ পছন্দ করেন, এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো ভিখারী অথবা অভাবগ্রস্ত

---

[৩৬৫] আল কুর'আন, সূরা আত তাওবা: ৩৪-৩৫
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

[৩৬৬] আল কুর'আন, সূরা আত তালাক: ৭
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ

[৩৬৭] আল কুর'আন, সূরা আল হজ: ৩৬
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

লোক এলে সাহাবীদের তিনি বলতেন, "তোমরা সুপারিশ করো, তাহলে তোমরা প্রতিদান পাবে। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের দু'আ অনুযায়ী যা পছন্দ করেন তা করেন।"[৩৬৮]

আল্লাহ্ তা'আলা দরিদ্র ও বঞ্চিতদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু যারা আল্লাহ্র এ নির্দেশকে অমান্য করে, তাদের প্রতি অবহেলা করে, তাদের প্রতি কঠোর ও নির্দয় আচরণ করে তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি রয়েছে।[৩৬৯] যারা আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামত থেকে অভাবীদের দান করা থেকে বিরত থাকবে, এমনকি দান না করার জন্য বিভিন্ন ছলনার আশ্রয় নিবে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এক উদাহরণ দিয়ে বলেন,

> *"আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি বাগানের মালিকদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে, ইনশাআল্লাহ্ না বলে। অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো, যখন তারা নিদ্রিত ছিল। ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণসম। সকালে তারা এক-অপরকে ডেকে বলল, তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল-সকাল ক্ষেতে চল। অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে, যেন কোনো মিসকীন তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হলো। অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল: আমরা তো পথ ভুলে গেছি বরং আমরা তো কপাল পোড়া। তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল: আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? তারা বলল: আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম। অতঃপর তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে লাগল।"*[৩৭০]

অভাবীদের সাহায্য করার যে আদেশ আল্লাহ্র দিয়েছেন, সে আদেশ না মানলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে হবে। এজন্য প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিকে অভাবী ও দরিদ্রদের অভাব দূর করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। আর এই দায়িত্ব পালনে উদাসীন হলে আল্লাহ্ তা'আলা-এর অসন্তুষ্টি অনিবার্য এবং

---

[৩৬৮] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৫ম খণ্ড, (অনু: তা.পা.) কিতাবুল আদব, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা..., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩

وعن أَبي موسى الأَشعري رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذَا أَتَاهُ طالِبُ حاجةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلسائِهِ فَقَالَ: "اشْفَعُوا تُؤجَرُوا ويَقْضِي اللهُ عَلَى لِسان نَبِيِّهِ مَا أَحبَّ" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وفي رواية:"مَا شَاءَ

[৩৬৯] ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

[৩৭০] আল কুর'আন, সূরা আল কলম: ১৭-৩০

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ - وَلَا يَسْتَثْنُونَ-فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ-فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ - فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ - أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ -فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ- وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ - فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ -بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ - قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ-قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ-فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ

আখিরাতে জাহান্নামের আগুনের শাস্তি পেতে হবে।[৩৭১] এই শাস্তি প্রাপ্তদের ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির উদ্দেশ্যে পবিত্র কুর'আনে বর্ণনা করেছেন। তারা বলবে, "আমরা মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ছিলাম না এবং অভাবগ্রস্তকে খাবার দিতে উৎসাহ দিতাম না।"[৩৭২] এখানে এই আয়াতটির পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল্লাহ্র প্রতি যারাই বিশ্বাস স্থাপন করবে তারা অবশ্যই অভাবীদের অভাব দূর করার সার্বিক প্রচেষ্টা করবে। আর তাই সকল অবস্থায় অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকার দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, "আত্মীয়-স্বজন, অভাবী ও মুসাফিরকে তার প্রাপ্য দিয়ে দাও।"[৩৭৩] সুতরাং যার অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে অথচ সে তার মুসলিম ভাইকে ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন ও বাসস্থানহীন অবস্থায় দেখেও তাকে সাহায্য করেনি। নিঃসন্দেহে সে তাঁর প্রতি প্রতি দয়া প্রদর্শন করেনি এবং একজন মানুষ হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করেনি,[৩৭৪] যা নিন্তাতই অগ্রহণযোগ্য।

আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও সর্বদা দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। দান করার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "আদি ইবনে হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দোজখের আগুন থেকে বেঁচে থাকার সামর্থ্য রাখে সে যেন এক টুকরো খেজুর দিয়ে হলেও তাই করে।"[৩৭৫] অন্যখানে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দানকারীদের সুখকর পরিণতির কথা বলেছেন, "যারা রাত ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের পুণ্যফল তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[৩৭৬] এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে, "তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের মতো, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে।"[৩৭৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ্ তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা ব্যয় করো। তোমাদের

---

[৩৭১] ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

[৩৭২] আল কুর'আন, সূরা আল হাক্কাহ: ৩৩-৩৪

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ-وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

[৩৭৩] আল কুর'আন, সূরা বনী ইসরাঈল: ২৬

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

[৩৭৪] ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

[৩৭৫] ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, ৩য় খণ্ড, কিতাবুয যাকাত, বাবু আল হাচ্ছু 'আলাস সাদাকাতি ওলাউ বিশিক্কি তামরাতিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১

عَنْ عَدِيِّ بنِ حاتمٍ - رَضْيَ اللهُ عَنْه - قَالَ: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: «اتَّقُوا النَّار ولو بِشِقِّ تمرةٍ» متفق عليه

[৩৭৬] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ২৭৪

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

[৩৭৭] আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ১৩৩-১৩৪

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ - الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।"[৩৭৮] এছাড়াও আল্লাহ্ সফল ব্যক্তিদের পরিচয় দিয়ে বলেন, "আর তারা অন্যদের নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও নিজেরা অভাবগ্রস্ত থাকে। যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।"[৩৭৯]

সমাজের অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি তাদের অর্জিত সম্পদ থেকে ব্যয় করতে ইচ্ছা পোষণ করে না। তারা তাদের সম্পদকে জমিয়ে রাখতে পছন্দ করে এবং মনে করে যে, আরো কিছু দিন পর সম্পদ বেশি হলে তার পর দান করবো, কিন্তু এভাবে চলতে চলতে তাদের মৃত্যু এসে যায় অথচ তারা আর দান করতে সক্ষম হয় না। দুনিয়ার মোহ তাদেরকে সম্পদ গচ্ছিত রাখতে উৎসাহিত করে। মৃত্যুর পর পরকালে আল্লাহ্ দরবারে যখন তারা দণ্ডায়মান হবে তখন তারা আল্লাহ্কে বলবে, আরো কিছু কাল সময় যদি পেতাম তবে দান সাদকাহ করে আসতে পারতাম। তাদের একথা স্মরণ করে দিয়ে আল্লাহ্ বলেন, "আমি তোমাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই। অন্যথায় সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণ হতাম।"[৩৮০] আর যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র আদেশ পালন করে তাদের নিজেদের অর্জিত সম্পদ থেকে বঞ্চিত মানুষের জন্য দান করে এদের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কার রয়েছে, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা নিজেদের কল্যাণের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তা আল্লাহ্র নিকট পাবে। সেটি উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর।"[৩৮১] যারা এভাবে আল্লাহ্ দেয়া নির্দেশ মোতাবেক তাদের নিজেদের সম্পদ থেকে অভাবীদের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে দান করবে, তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্কে ভালোবেসে তারা অভাবী, এতিম ও বন্দীকে আহার দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদের আহার দান করি, আমরা তোমাদের থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা ভয় করি, আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভীতিপ্রদ ভয়ঙ্কর দিনের।"[৩৮২]

---

[৩৭৮] আল কুর'আন, সূরা আল হাদীদ: ৭
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

[৩৭৯] আল কুর'আন, সূরা আল হাশর: ৯
أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

[৩৮০] আল কুর'আন, সূরা আল মুনাফিফুন: ১০
وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

[৩৮১] আল কুর'আন, সূরা আল মুযাযাম্মিল: ২০
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ

[৩৮২] আল কুর'আন, সূরা আদ দাহর: ৭-১০
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا -إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا -إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যপ্রার্থীদের সহায়তার জন্য সাহায্যকারীদেরকে মুমিন ও সৌভাগ্যশীল হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। এই সাহায্যপ্রার্থীরা প্রতিবেশী, আত্মীয়, পরিচিত ও অপরিচিত কোনো এতিম অথবা কোনো ব্যক্তি হতে পারে। এ সাহায্যপ্রাথীদের সকলকেই একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনে তাদের পাশে থাকতে হবে। সাহায্যকারী এ সকল ব্যক্তিদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, "সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করিনি। তুমি কি জানো বন্ধুর গিরিপথ কী? এটা হচ্ছে দাসমুক্তি অথবা এতিম, আত্মীয়কে অথবা দারিদ্র্য নিষ্পেষিত নিঃস্বকে দুর্ভিক্ষের দিনে খাবার দান। অতঃপর সে অন্তর্ভুক্ত হয় মুমিনদের শ্রেণিতে, যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের এবং দয়া-দাক্ষিণ্যের, তারাই সৌভাগ্যশালী।"[৩৮৩]

আল্লাহ্ দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে ব্যবসায় বিনিয়োগ বলেছেন এবং উক্ত ব্যবসাটি হবে মহান আল্লাহ্র সাথে, সে কথাটিও তিনি বলে দিয়েছেন। সেই সাথে এই ব্যবসায় অনেক বড় মুনাফার কথাও তিনি বলেছেন। ব্যবসাটি হলো, সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষদের সাহায্য-সহযোগিতার লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করা। উক্ত ঋণ প্রদানকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ঋণ দেয়া হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, "কে সে, যে আল্লাহ্কে করদে হাসান (নিঃস্বার্থ ঋণ) প্রদান করবে? তিনি তার জন্য একে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আসলে কমানোর ও বাড়ানোর ক্ষমতা আল্লাহ্রই রয়েছে এবং তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"[৩৮৪] এক্ষেত্রে তাদেরকে যে ঋণ প্রদান করা হবে, সেই ঋণ ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা যাবে না। তাদের যতটা প্রয়োজন ততটা পর্যন্ত ঋণ দিতে হবে এবং ঋণ শোধ করার জন্য পর্যাপ্ত সময়ও দিতে হবে। অনেক সময় ঋণ গ্রহীতা অভাবের কারণে গ্রহণকৃত ঋণ ফেরতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তার উপর কোনো প্রকার জোর জুলুম করা যাবে না। তার প্রতি কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করা যাবে না।[৩৮৫] এক্ষেত্রে ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিবে। আর যদি উক্ত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তবে সেই ঋণ ক্ষমা করে দেয়াই শ্রেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া উচিত। আর যদি তা ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা তা উপলব্ধি কর।"[৩৮৬] এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সকল সামর্থ্যবানকে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের

---

[৩৮৩] আল কুর'আন, সূরা আল বালাদ: ১১-১৮

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ -وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ -فَكُّ رَقَبَةٍ -أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ -يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ- أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ - ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ-أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

[৩৮৪] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ২৪৫

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

[৩৮৫] মাওলানা মুহম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

[৩৮৬] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ২৮০

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

সাহায্য করার জন্য ভয় ও সুসংবাদ দিয়েছেন। তাই যারা আল্লাহ্‌র দেয়া এই বিধানকে নিজেদের মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে মান্য করে না, তারা আল্লাহ্‌র কাছে শাস্তির মুখোমুখী হবে।

দরিদ্রতা মানুষের জীবনের সবথেকে কঠিন এক অধ্যায়। যাদের জীবন দারিদ্র্যের নির্মম চক্রের মধ্যে বাধা পড়ে দুর্বিষহ হয়ে উঠে, তাদের কাছে এই পৃথিবী অনেক ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে। জীবনের চলার পথের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে তাদের জন্য অপেক্ষা করে বিভিন্ন অযত্ন, অবহেলা ও অপমান। যা তাদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে ফেলে এবং ক্রমশ মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। এজন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা দারিদ্র্য থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন, যাতে কোনোভাবেই দারিদ্র্যের মধ্যে না পড়তে হয় সেজন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় অত্যন্ত মহৎ কাজ। যারা তা করবে তাদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রতিদানের সু-সংবাদ দিয়েছেন, কিন্তু কখনো যেন এমন না হয় যে, দান করতে করতে নিজের সব সম্পদ দান করে নিজেই দারিদ্র্যের মধ্যে পড়তে হয়। এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে, যাতে মানুষ আবেগের বশবর্তী হয়ে সব সম্পদ দান না করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষদেরকে সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে উৎসাহিত করেছেন। দান করার ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন। কারণ দান করতে যেয়ে এমনভাবে অর্থ ব্যয় করবে না যাতে পরবর্তী প্রজন্ম বা তার সন্তানেরা দরিদ্রতার মধ্যে পড়ে। আবার এমনভাবে সম্পদ পুঞ্জীভূত করবে না, যাতে তার মধ্যে কৃপণতা চলে আসে। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান হওয়ায় এখানে মানুষের কল্যাণের সমগ্র উপাদান উপস্থিত। আল্লাহ্‌ মানুষের মনের সকল অবস্থার কথা জানেন। সে কারণে তিনি মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য সেটিই হলো সঠিক কাজ, যখন একজন ব্যক্তি তার নিজের ও নিজের পরিজনের জন্যে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। কারণ তার সম্পদে তার নিজের এবং তার সাথে যারা রয়েছে বা তার সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের অধিকার রয়েছে। এছাড়াও অভাবীদের জন্যও দানের হাতকে নিঃস্বার্থভাবে প্রসারিত করতে হবে; দানের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা যাবে না। অন্যদিকে আবার দান করতে যেয়ে নিজের ওয়ারিশদের বঞ্চিত করে সব অর্থ সম্পদ নিঃশেষ করে দেয়াও যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন, "আর নিজের হাতকে গলায় বেঁধে রেখো না, আবার সম্পূর্ণ প্রসারিত করে দিও না। এমনটি করলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।"[৩৮৭] এজন্য দানের ক্ষেত্রে সব সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এমনভাবে দান করতে হবে যাতে করে পরবর্তীতে অভাবী ও দারিদ্র্যদের মাঝে অর্থ-সম্পদ দান করার

[৩৮৭] আল কুর'আন, সূরা বনী ইসরাঈল: ২৯
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

মত দানকারী ব্যক্তির অর্থনৈতিক সক্ষমতাও থাকে। এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা এই দু'য়ের মাঝে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তবে নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদের ভালোবাসেন।"[৩৮৮] এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস, "হাকীম ইবনু হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান করা হয় সেটাই উত্তম। উপরের হাত (বা দাতা) নিচের হাতের (বা ভিক্ষাকারীর) চেয়ে উত্তম। নিজের নিকটাত্মীয়দের দিয়ে দান-খয়রাত শুরু কর।"[৩৮৯]

আল্লাহ্ তা'আলা দান করতে সব সময় নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সমাজের সচ্ছল ব্যক্তি কর্তৃক দানের মাধ্যমে অভাবী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোর অভাব দূর করা সম্ভব। কিন্তু সেই দান অবশ্যই হতে হবে পরিবার পরিজনের স্বাভাবিক জীবন ব্যয় নির্বাহ করার পর উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাস্তায় খরচ করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, "তোমার কাছে লোকেরা জানতে চায়, তারা আল্লাহ্র পথে কী পরিমাণ খরচ করবে? তুমি বলো, যা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত।"[৩৯০] অন্যত্র বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাকে যে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তার মাধ্যমে পরকালের ঘর অন্বেষণ কর। তবে তোমার পার্থিব অংশের কথাও ভুলে যেও না। আর আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, এবং অর্থ-সম্পদ দ্বারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না"[৩৯১]

মানবতার কল্যাণের জন্য ইসলাম প্রেরণ করা হয়েছে এবং এটি সমাজে কল্যাণ করতে নির্দেশ দেয়। এই কল্যাণ করতে হবে সর্বপ্রথম নিজের জন্য তারপর নিজের পরিবার-পরিজন ও মানুষের জন্য। এজন্য দান করার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। তাই সর্বপ্রথম নিজের প্রয়োজন বিবেচনায় এনে এরপর অবশ্যই অভাবী, দরিদ্র ও বঞ্চিতদের সহযোগিতা করতে হবে। প্রথমে নিজের ও নিজের পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। অতঃপর অন্যদের প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করতে হবে, অভাবী ও দরিদ্রদের জন্য দান করতে হবে। তবেই পুণ্যবানদের কাতারে শামিল হওয়া যাবে। এ

---

[৩৮৮] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ১৯৫

وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

[৩৮৯] ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, কিতাবুয যাকাত, বাবু আন্নাল ইয়াদাল 'উলুয়া খয়রুম মিন ইয়াদিস ছুফলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنى، والْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

[৩৯০] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ১১৯

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

[৩৯১] আল কুর'আন, সূরা আল কাছাছ: ৭৭

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

প্রসঙ্গে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের পছন্দনীয় জিনিস আল্লাহ্র পথে ব্যয় করবে। আর তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পূর্ণ জ্ঞাত।"[৩৯২]

কখনো কখনো মানুষ তাদের কৃতকর্মের কারণেও সচ্ছল থেকে দরিদ্র হয়ে যেতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ না করে শুধু অলস বসে থেকে অপব্যয় করতে থাকে তবে তার সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি কোনো অপব্যয় না করেও যদি কেবল বসে বসে অলস জীবন কাটাতে ইচ্ছা করে তবে তাও দারিদ্র্যে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদেরকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজ করে নিজের ও পরিবারের জীবিকা অর্জন করতে বলেছেন। রিযিক অন্বেষণ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, "যখন জুমু'আর সালাত সম্পন্ন হবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর।"[৩৯৩] কাজ করা ব্যতীত কোনো মানুষ তার প্রয়োজন মিটাতে পারে না। সেই কাজ করার বিষয়টি কম বা বেশি হতে পারে তথাপি তাকে অবশ্যই কাজ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে মানুষের আবাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেখানে তারা তাদের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে পরিশ্রম করে নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে পারে। এজন্য অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "সেই মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে জমি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তোমাদেরকে আবাদ করেছেন।"[৩৯৪]

মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা রিযিক নির্ধারণ করে দেন। প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিশ্রম করে সেই রিযিক অর্জন করতে হয়। পৃথিবীতে মানুষ যে ফসল চাষ করে খাদ্য উৎপন্ন করে তার সূচনা হয়েছিল সর্বপ্রথম মানব ও নবী হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জমি চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা শিখিয়েছিলেন। এ ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যেমে সময়ের ধারাবহিকতায় মানুষ তার খাদ্যের প্রয়োজন পূরণ করেই চলেছে,[৩৯৫] এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার ধারাবহিকতা বিদ্যমান থাকবে। এছাড়াও মানুষ শুধু খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করছে না বরং তার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ঘর বাড়ি, শিল্প, কারখানাসহ সকল উৎপাদনমুখী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন সূরা 'নাবা'য় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

---

[৩৯২] আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ৯২

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

[৩৯৩] আল কুর'আন, সূরা আল জুমু'আ: ১০

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

[৩৯৪] আল কুর'আন, সূরা হুদ: ৬১

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

[৩৯৫] ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

"একথা কি সত্য নয়, আমি যমীনকে বিছানা বানিয়েছি। পাহাড়গুলোকে গেড়ে দিয়েছি পেরেকের মতো। তোমাদের (নারী ও পুরুষ) জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। তোমাদের ঘুমকে করেছি শান্তির বাহন। রাতকে করেছি আবরণ এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময়। তোমাদের উপর সাতটি আকাশ স্থাপন করেছি এবং একটি অতি উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত বাতি সৃষ্টি করেছি। আর মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা। যাতে তার সাহায্যে উৎপন্ন করতে পারি শষ্য, শাক-শবজি ও নিবিড় বাগান। নিঃসন্দেহে বিচারের দিনটি নির্ধারিত হয়েই আছে।"[৩৯৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ্ আদ জাতির পর তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যার ফলে আজ তোমরা পৃথিবীর সমতল ভূমির উপর সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করছো ও তার পর্বতগাত্র খুঁড়ে ঘর-বাড়ি বানাচ্ছো। কাজেই আল্লাহ্র নেয়ামতকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।"[৩৯৭]

অন্যত্র বলা হয়েছে, "তিনিই তো সেই মহান আল্লাহ্, যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা এর বুকের উপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহ্র দেয়া রিযিক খাও। তোমাদেরকে তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"[৩৯৮]

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে কর্মহীন হয়ে বসে থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি সর্বদা মানুষকে তার নিজ ও পরিবার পরিজনের জীবনোপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সেই প্রচেষ্টা অবশ্যই বৈধ কাজ-কর্মের মাধ্যমে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত পন্থায় হতে হবে। এই পন্থায় কাজ-কর্ম করে মানুষ তার প্রয়োজনসমূহ পূরণ করবে এবং আরো বেশি প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বদা নিজের সচেতনতা ও প্রচেষ্টা থাকতে হবে, যাতে দরিদ্রতা গ্রাস করে না বসে। কারণ

---

[৩৯৬] আল কুর'আন, সূরা আন নাবা: ৬-১৭
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا - وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا - وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا - وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا - وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا - وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا - وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا - وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا - وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا - لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا - وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا - إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا

[৩৯৭] আল কুর'আন, সূরা আল আ'রাফ: ৭৪
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

[৩৯৮] আল কুর'আন, সূরা আল মূলক: ১৫
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

দারিদ্র্য এমন এক মারাত্মক অবস্থা, যা একজন মানুষের কর্মক্ষমতা, সৃষ্টিশীলতা, তারুণ্যকে বাধাগ্রস্ত করে শক্তিহীন করে ফেলে। এর ফলে সমাজে সকলের কাছে ব্যক্তি অবহেলার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হয় ও সম্মানহীন জীবনযাপন করে। এজন্য দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সকল জীবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে এবং সেই সাথে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। দু'আ করতে হবে দারিদ্র্যের কঠিন অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট দারিদ্র্য, অভাব, লাঞ্ছনা, অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।"[৩৯৯] দারিদ্র্যকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনা হিসেবেও মনে করতেন। দারিদ্র্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনি এই দু'আ করতেন,

> *"হে আল্লাহ্‌ আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের ফিতনা থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে। আমি আশ্রয় চাই কবরের ফিতনা থেকে এবং আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। আমি আরো আশ্রয় চাই প্রাচুর্যের ফিতনা থেকে, আর আমি আশ্রয় চাই দারিদ্র্যের ফিতনা থেকে, আমি আরো আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।"*[৪০০]

আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী চলার পরও যদি মানুষের মাঝে দরিদ্রতার প্রভাব পড়ে, তবে তাদের জন্য সচ্ছল ব্যক্তিরা সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সচ্ছল ও সম্পদশালী ব্যক্তিদের কর্তব্য হয়ে পড়ে প্রত্যেকের স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী এ সকল দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করা। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন, হে আদম সন্তানেরা! তোমরা অকাতরে দান করতে থাকো, আমিও তোমাদের উপর ব্যয় করবো, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, আল্লাহ্‌র হাত প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। রাত দিন অনবরত ব্যয় করলেও তা মোটেই কমছে না।"[৪০১]

---

[৩৯৯] আহমাদ বিন শু'আইব আন নাসাঈ, *আস্‌ সুনান আল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল ইসতি'আযাহ, বাব আল ইসতি'আযাতু মিনাল ফাকরি, দার আল কুতুব আল'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-১৯৯১, পৃ. ৪৫১

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ ، وَالْقِلَّةِ ، وَالذِّلَّةِ ، وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ

[৪০০] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৯ম খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুদ দাওয়াত, বাবুল ইসতিয়াযাতি মিনাল ফিতনাতিল গিনায়ি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ৫৮৫

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

[৪০১] ইমাম মুসলিম, *আস্‌ সহীহ*, কিতাবুয যাকাত, বাবু আল হাসসু 'আলান নাফকাতি ওয়া তাবশিরিল মুনফিক বিল খালাফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك" وقال" يمين الله ملان سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار".

সমাজকে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ গঠন করার জন্য দরিদ্রদের মাঝে সম্পদ দানের কোনো বিকল্প নেই। তাদের অভাব দূরীকরণে সর্বদা সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসতে হবে। যদি তা না করা হয় তবে ইসলাম বিরুদ্ধবাদীরা এ সকল মুসলিম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য বিমোচনের নাম করে কুফুরীর দিকে নিয়ে যাবে। এর বাস্তব অবস্থাও বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। কারণ যখন মানুষ দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে আক্রান্ত হয় তখন তাদের কাছে জীবন বাঁচানোই সবথেকে বড় মনে হয়। তাই তারা যেকোনো কাজ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এমনকি তাদের কুফরীর মধ্যেও নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এবং কখনো কখনো তারা কুফরীও করে ফেলে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "দারিদ্র্য প্রায় কুফরীর কাছাকাছি নিয়ে যায় এবং হিংসা প্রায় ভাগ্যকে পরাজিত করার কাছাকাছি করে ফেলে।"[৪০২] এজন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কুফরীর হাত থেকে রক্ষা করতে সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসতে হবে।

অন্যদিকে যারা অপব্যয় করে, বাজে খরচ করে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের ভাই হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমন অনেক মানুষ আছে যারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ও মনুষদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করে অবৈধ ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। এছাড়াও তারা সম্পদের দাম্ভিকতায় অশ্লীলতার মধ্যে নিমজ্জিত থেকে সম্পদ ধ্বংস করতে থাকে অথচ দান করতে আগ্রহী হয় না। তারা দিন-রাত বাজে খরচ করে চলেছে। এদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দিয়ে দাও। তোমরা বাজে খরচ করো না। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।"[৪০৩]

অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা সফল ব্যক্তিদের পরিচয় দিয়েছেন। যারা কার্পণ্যও করে না আবার বাজে খরচও করে না। তারা তাদের জীবন ব্যয় নির্বাহ করার সময়ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। তারা প্রয়োজনমতো নিজেদের ও মানুষের কল্যাণার্থে খরচ করে, কিন্তু সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলা এরকম মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীদের পরিচয় দিয়ে বলেন, "তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং তারা উভয় চরম পন্থার মধ্যবর্তী অবস্থান করে।"[৪০৪] অন্যত্র বলেন, "হে বনী আদম! প্রত্যেক ইবাদাতের সময় তোমরা নিজ নিজ সুন্দর সাজে সজ্জিত হও।

---

[৪০২] আবূ বকর আহমাদ বিন আল হুসাইন আল বায়হাকী, *আস সুনান আল কুবরা*, ৫ম খণ্ড, কিতাবু শু'আবিল ঈমান, বাব আসসালিস ওয়াল আরবাঊন মিন শু'আবিল ঈমান, মাকতাবাতু দারিল কুতুব আল'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-১৪১০ হি., পৃ. ২৬৭
قال رسول الله صلى الله عليه وآله :كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر

[৪০৩] আল কুর'আন, সূরা বনী ইসরাঈল: ২৬-২৭
وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

[৪০৪] আল কুর'আন, সূরা আল ফোরকান: ৬৭
وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

আর খাও ও পান করো কিন্তু সীমা অতিক্রম কর না, আল্লাহ্ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৪০৫]

মানুষ তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য ব্যয় করবে, কিন্তু সেই ব্যয় করার ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে অপব্যয় না হয়। সর্বদা ব্যয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমানার মধ্যেই ব্যয় করতে হবে। অন্যদিকে আবার কোনোভাবেই কৃপণতাবশত আল্লাহ্ তা'আলার অনুমোদিত নিয়ামত ভোগ করা থেকে বিরত থাকা যাবে না। অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও অর্থ-সম্পদের মায়ায় আল্লাহ্র নিয়ামত ভোগ করা থেকে বিরত থাকা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্যের শামিল। এক্ষেত্রে আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থায় ব্যয় করতে হবে তবেই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ কল্যাণময় হয়ে উঠবে, কিন্তু যারা আল্লাহ্র এ আদেশকে অমান্য করে সীমালংঘন করে, অপব্যয় করে, তাদের জন্য আল্লাহ্ শাস্তির বিধান রেখেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সামাজের অভাবী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক নিয়ম ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

---

[৪০৫] আল কুর'আন, সূরা আল আ'রাফ: ৩১
يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিত এতিমদের অধিকার

পৃথিবীর অমোঘ নিয়মে যেমন কোনো কিছুর জন্মই হয় ধ্বংস হওয়ার জন্য ঠিক তেমনি কোনো প্রাণির জন্ম হয় মৃত্যুর জন্য। এভাবে কোনো মানুষের যখন জন্ম হয় তখন তার মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়। তাই তো জন্মের পর থেকেই মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে যেতে থাকে। বয়স যতই বাড়তে থাকে মৃত্যু ততই কাছে আসতে থাকে। এভাবে যখন কোনো পরিবারের কোনো অভিভাবকের মৃত্যু হয় তখন সেই পরিবার খুবই বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অভিভাকহীন এতিম ও বিধবাগণ এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকে। তখন অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা তাদের খুবই প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় যারা তাদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করবে, তাদের জন্য রয়েছে অনেক কল্যাণ। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "সাফওয়ান ইবনু সুলাইম (রা.) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিধবা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টা-সাধনকারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদকারী অথবা সারা দিন রোযা পালনকারী ও সারারাত সালাত আদায়কারীর সমান সাওয়াবের অধিকারী।"[৪০৬] এতদসত্ত্বেও সমাজের কিছু সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা না করে তাদের ক্ষতি করার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার অভিপ্রায়ে থাকে। এতিম ও বিধবাগণ দুর্বল হওয়ায় কখনো কখনো সুযোগসন্ধানী চতুর ব্যক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্নরা অত্যন্ত সহজে উক্ত ভুক্তভোগীদের সম্পদ কূটকৌশলে ও জোরপূর্বক দখল করে নেয়। অথচ আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ্ আমি দুই প্রকার দুর্বল লোকের হক নষ্ট করা নিষিদ্ধ করছি, তারা হলো এতিম ও মহিলা।"[৪০৭]

এতিমদের নিরাপত্তা দান করা সকলের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালন না করে তাদের সম্পদ অবৈধভাবে দখল ও আত্মসাৎ করার মতো জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করে এতিমদের সম্পদ অবৈধভাবে দখল করে, আত্মসাৎ করে তবে তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কঠিন আযাব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "যারা অন্যায়ভাবে এতিমের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ করে তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে। অচিরেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।"[৪০৮] তাই লোভে পড়ে কোনোভাবেই

---

[৪০৬] ইমাম তিরমিযী, *সহীহ আত্-তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড, (অনু:) কিতাবুল বিররি ওসসিলাতি, বাবু মাজা'আ ফিসসা'ই 'আলাল আরমিলাতি ওয়াল ইয়াতিমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
السَّاعِي علَى الأرْمَلَةِ والمِسْكِينِ كالْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللَّهِ، أوْ: كالَّذِي يَصُومُ النَّهارَ ويقومُ اللَّيْلَ

[৪০৭] ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, ৩য় খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল আদব, বাবু হাক্কিল ইয়াতিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬
عن أبي هريرة -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَعِيفَين: اليَتِيم والمَرْأَة".

[৪০৮] আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ১০
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

এতিমদের সম্পদ দখল বা আত্মসাৎ করা যাবে না। তাদের সম্পদ যা আছে তা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং ছলচাতুরি করে নিজের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে ভোগ করা যাবে না। যদি কেউ এ ধরনের সম্পদ ভোগ করার জন্য কোনো ষড়যন্ত্র করে, তবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "এতিমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। খারাপ মালের সাথে ভালো মাল রদ-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে মিশিয়ে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয়ই, এটা বড়ই মন্দ কাজ।"[৪০৯] অন্যত্র বলা হয়েছে, "তোমরা এতিমদের ধন-সম্পত্তির নিকটেও যেয়ো না, অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায়, যা সর্বাপেক্ষা ভালো, যত দিন না তারা জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায়।"[৪১০] এতিমের মালামাল অবৈধভাবে ভক্ষণ করলে তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যায়। এ জঘন্য কাজ খুবই ঘৃণিত কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। যারা এ ঘৃণিত কাজের সাথে জড়িত তাদের শাস্তির ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস-

> *"আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। "তিনি বলেন, সাতটি ধবংসকারী বিষয় হতে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা, (২) জাদু, (৩) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) এতিমের মাল গ্রাস করা, (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবের সতী-সাধ্বী মু'মিনাদের অপবাদ দেয়া।"*[৪১১]

এতিমরা সমাজে সব থেকে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকে। এরকম অবস্থায় তাদের শিশুকাল থেকে বেড়ে উঠার প্রতিটি স্তরে অভিভাবকের প্রয়োজন এবং প্রয়োজন হয় অভিভাবকের সঠিক দিক-নির্দেশনার। যাতে তারা তাদের জীবনকে সঠিকভাবে ন্যায়নীতির উপর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান পেতে পারে। এছাড়াও তাদের সকল বৈধ চাহিদা পূরণ হওয়া প্রয়োজন। কারণ প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হওয়া ব্যতীত তাদের ভালোভাবে বেড়ে উঠা সম্ভব নয়। তাদের উক্ত প্রয়োজনগুলো পূরণ হওয়ার জন্য সমাজের আত্মীয়-অনাত্মীয় সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসতে হবে যতক্ষণ না তারা

---

[৪০৯] আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ২

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

[৪১০] আল কুর'আন, সূরা বনী ইসরাইল: ৩৪

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

[৪১১] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৫ম খণ্ড, (অনু: তা.পা.) কিতাবুল ওয়াসায়া, বাবু কওলিল্লাহি তা'আলা..., তাওহীদ পাবলিকেশন্স, (চতুর্থ প্রকাশ), ঢাকা-২০১২, পৃ. ১৭০

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات"، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".

প্রাপ্তবয়স্ক হয়। তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাদের জীবন নির্বাহের জন্য খরচ করতে কুণ্ঠিত হওয়া যাবে না। কারণ পিতামাতা না থাকলে তাদের প্রয়োজন মিটানোর, আদর, স্নেহ, ভালোবাসা দেয়ার আর কেউ থাকে না। এক্ষেত্রে দরিদ্র ও অভাবী এতিমদের অবস্থা আরো করুণ হয়। সবাই তাদেরকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। সেই অবস্থায় তাদের সাহায্য-সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন হয়। এরকম পরিবেশে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও জোর দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এতিম ছিলেন, তিনি এতিমদের ব্যথা, বেদনা বুঝতে সক্ষম। তাই তো তিনি এতিমদের অধিকার রক্ষায় শুধু নির্দেশ দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি। তিনি নিজেই অনেক এতিমদের দায়িত্ব নিয়েছেন। যার উদাহরণ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে উল্লেখ আছে। এজন্য কিয়ামত পর্যন্ত যারা আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মেনে এতিমদের তত্ত্বাবধান করবে, তাদের ভালোভাবে দেখভাল করবে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শেষ বিচারের দিন হাশরের ময়দানে থাকবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "সালহ্ ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ও এতিমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকবো। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জনি ও মাধ্যমা আঙুল মিলিয়ে ইশারা করে দেখান।"[৪১২]

এতিমদের মধ্যে অনেকেই সম্পদশালী, অনেকেই কম সম্পদশালী আবার কেউ কেউ হতদরিদ্র। এর মধ্যে যেসব এতিম সম্পদশালী কিন্তু সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার মতো যোগ্যতা এখন গড়ে উঠেনি, তাদেরকে ও তাদের সম্পদকে রক্ষা করা বা দেখাশোনা করা এবং তার বিনিময়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দোষের নয়। কারণ এর মাধ্যমে একাধারে সম্পদশালী এতিমরা একজন অভিভাবক পায় এবং একজন তত্ত্বাবধানকারীর তত্ত্বাবধানে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে তদারককারী কতটুকু পারিশ্রমিক নিতে পারবে সে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস-

> *"আমার ইব্ন শু'আইব (রা.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলে: আমি ফকির, আমার কিছু নেই। কিন্তু আমার প্রতিপালনে একজন এতিম আছে- (যার সম্পদ আছে)। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার এতিমের মাল হতে এ শর্তে খেতে পার যে, তুমি*

---

[৪১২] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৯ম খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল আদব, বাবু ফাদলি মান ইয়াউলু ইয়াতিমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ" :أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما".

অমিতব্যয়ী হবে না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করবে না, যাতে মাল তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এতিমের মাল হতে নিজের জন্য কিছু জমা করবে না।"[৪১৩]

সর্বদা এতিমের অধিকার প্রদান করতে হবে। এতিমের সাথে কোনোভাবেই দুর্ব্যবহার করা যাবে না। নিজ সন্তানদের মতো তাদের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সবসময় সচেতন থাকতে হবে। একটি সাম্যভিত্তিক কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। এরূপ অবস্থায় তাদের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ খারাপ আচার-ব্যবহার ও কঠোরতা প্রদর্শন করা যাবে না। এ ব্যাপারে মানবজাতিকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন, "আর তারা তোমাকে এতিমদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলে দাও, তাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে গুছিয়ে দেয়া উত্তম, আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই।"[৪১৪] অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে লক্ষ্য করে বলেন, "অতএব, হে নবী, তুমি এতিমের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবে না এবং অভাবীদেরকে তিরস্কার করবে না।"[৪১৫]

সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র এতিমরা সমাজের সবথেকে অবহেলিত ও ক্ষতির সম্মুখীন। তারা সমাজে খুবই অবহেলিত। তাদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার হাত সর্বদা প্রসারিত থাকে না। তাদের প্রতি মায়া মমতা থাকে না। তাদের সাথে বেশিরভাগ মানুষ ভালো আচরণ করে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে সুন্দর, উত্তম ও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "এতিমের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করো, তোমরা যা ভালো কাজ করবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন।"[৪১৬] এতিমদের প্রতি সদয় হওয়ার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে মনে প্রশান্তি লাগে, নিজেদের কল্যাণ সাধিত হয়। এজন্য সম্পত্তি বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস বণ্টনের সময় যদি কোনো অভাবী, নিকটাত্মীয় ও এতিম উপস্থিত হয় তবে সেই সম্পত্তি থেকে তাদের দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে বলেন, "সম্পত্তি বণ্টনের সময়

---

৪১৩ ইমাম আবূ দাউদ, *আস্ সুনান*, ৪র্থ খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল ওসায়া, বাবু মাজা'আ ফীমা লিওয়ালিইয়্যিল ইয়াতিমি আইইয়ানালা মিম্মালিল ইয়াতিমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (দ্বিতীয় সংরক্ষণ), ঢাকা-২০০৬, পৃ. ১২৪
.أن رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فقال إني فقيرٌ ليس لي شيءٌ ولِي يتيمٌ فقال كُلْ من مالِ يتيمِكَ غيرَ مُسْرِفٍ ولا مبادِرٍ ولا مُتَأثِّلٍ

৪১৪ আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ২২০
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

৪১৫ আল কুর'আন, সূরা আদ দোহা: ৯-১০
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ – وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

৪১৬ আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ১২৭
مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

যখন (উত্তরাধিকারী নয় এমন) আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু দাও, তাদের সাথে উত্তম কথা বল।"[৪১৭]

এতিমদের প্রতি রূঢ় আচরণ করা যাবে না। সর্বদা তদের কল্যাণকামী হয়ে থাকতে হবে। যদি কেউ কল্যাণকামিতার পরিবর্তে তাদের সাথে খারাপ আচরণকারী হয়, তবে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তি রয়েছে। যারা এতিমদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম অস্বীকারকারী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তুমি কি তাকে দেখেছো, যে দীন (ইসলাম)-কে অস্বীকার করে? সে তো এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবীকে খাবার দানে উৎসাহ দেয় না।"[৪১৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও এতিমদের সাথে আচরণকারীর আচরণের ভিত্তিতে তাদের সফলতা ও ব্যর্থতার অবস্থান নির্ধারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে যে ঘরে এতিম থাকে এবং তার সাথে সদয় ব্যবহার করা হয়, সেই ঘরই সর্বোত্তম। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে যে ঘরে এতিম থাকে এবং তার সাথে নির্দয় ব্যবহার করা হয়, সেই ঘরই সর্বাধিক নিকৃষ্ট।" [৪১৯] এজন্য সর্বদা এতিমের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

---

৪১৭ আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ৮
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

৪১৮ আল কুর'আন, সূরা আল মাউন: ১-৩
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ - فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ - وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

৪১৯ ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, ৩য় খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল আদব, বাবু হাক্কিল ইয়ামিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭
خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه،

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকের অধিকার

সৃষ্টি জগতের প্রতিটি প্রাণিকে তার খাদ্য অন্বেষণের জন্য পরিশ্রম করতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিজগতের প্রাণিকূলকে তাদের জীবন পরিচালনার জন্য পরিশ্রম করে জীবিকা অন্বেষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সকল প্রাণি নিজের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করে এবং তা খেয়ে জীবনধারণ করে। এক্ষেত্রে মানুষকেও নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনে জীবিকা অন্বেষণ করতে হয়। জীবিকা অন্বেষণ যদিও নিজেদের প্রয়োজনে তথাপি তা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। বৈধ পন্থায় নিজের ও পরিবারের খাদ্য জোগাড় করা ইসলামের সর্বোত্তম জিহাদ করার মতোই মর্যাদাপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত।[৪২০] এজন্য নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী জীবিকা অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করতে হবে এবং তাতে তিনি রহমত বর্ষণ করবেন। এ প্রসেঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যখন তোমাদের সালাত শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা আল্লাহ্র যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে হালাল জীবিকা অনুসন্ধান কর, আর আল্লাহ্কে স্মরণ কর, এতে আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"[৪২১]

শ্রম ব্যতীত কোনো ব্যক্তির জীবন ধারণ একেবারেই অসম্ভব। শুধু দরিদ্র ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের জন্য শ্রম ব্যয় করলেই সে শ্রমিক তা নয় বরং অনেক বড় পদে কাজ করলেও তিনি শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত। যিনি অনেক সম্পদের মালিক তিনিও শ্রমিক। কারণ তিনিও তার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রম ব্যয় করেন। উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে সম্পদের প্রকৃত মালিক নন। ব্যক্তির সম্পদ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জন্য দেয়া আমানত। তিনি তার শ্রমের বিনিময়ে আল্লাহ্র দেয়া সেই আমানত সঠিকভাবে তদারক করেন মাত্র। এই তদারক করার জন্যে তাকে শ্রমিকের চাইতে বেশি শ্রম ব্যয় করতে হয়। কারণ সম্পদশালী ব্যক্তি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য যদি শ্রম ব্যয় না করে, তবে সেই সম্পদ কখনোই তার মালিকানায় থাকবে না; তা হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই শ্রমের ব্যাপারে একথা বলা যেতে পারে যে, সকলেই কোন কোনোভাবে শ্রমের মাধ্যমে কাজ করছে, সেখানে কেউ শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে কাজ করে, আর কেউ শারীরিক ও মেধা উভয় শ্রমের উপর নির্ভর করে কাজ করে এবং তারা শ্রমিক।

মানবসভ্যতার সূচনা থেকে যারা শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করে তাদেরকেই শ্রমিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মানবসভ্যতার সকল স্তরের উৎপাদনশীলতায়, উন্নয়নব্যবস্থায় এবং প্রচলিত অর্থব্যবস্থার চলমান প্রক্রিয়ায় এ শ্রমিকের অবদান অপরিহার্য। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়, প্রায় প্রত্যেক নবী-রাসূল শ্রমিক ছিলেন। তাঁরা নিজেরা শ্রমিক হিসেবে কাজ

---

[৪২০] ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষে, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৮০, পৃ. ৫৪

[৪২১] আল কুর'আন, সূরা আল জুমু'আ: ১০
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

করেছেন। হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে বর্ণিত করে বলেছেন, "মেয়ে দু'জনের একজন তার পিতাকে বললো আব্বাজান! একে চাকরিতে নিয়োগ করো, কর্মচারী হিসেবে এ ব্যক্তি উত্তম, বলশীল ও আমানতদার হতে পারে।"[৪২২] মানবজাতির প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) কৃষক ছিলেন। তিনি জীবিকা উপার্জনের জন্য কৃষিকাজ করতেন। হযরত দাউদ (আ.) কামার ছিলেন, যিনি লোহাকে নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। হযরত নূহ (আ.) কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও শ্রমিক ছিলেন। এভাবে সকল নবী ও রাসূল শ্রমিকের কাজ করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি বকরি চরান নি। তখন তাঁর সাহাবীগণ বললেন, আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ; আমি কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরি চরাতাম।"[৪২৩] শ্রমের মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের রিযিক জোগাড় করা সম্মানের ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। আর আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ.) স্বহস্তে জীবিকা নির্বাহ করতেন।"[৪২৪]

পৃথিবীতে মানবসভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশ মানুষের শ্রমব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। সেই শ্রমব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে। মানবজাতির সেই প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিন্নতার কারণে ব্যক্তিভেদে মানুষের কাজ ও কাজের পদ্ধতিও ভিন্নরূপ হতে পারে। মানবজাতির মধ্যে কেউ কেউ অক্লান্ত শারীরিক পরিশ্রম করে, আবার কেউ মেধা শ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করে। এভাবে মানবসভ্যতার সূচনা থেকে মানবজাতির প্রয়োজনীয় সকল উপকরণের উৎপাদন ও সংরক্ষণ শ্রমের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এই শ্রমের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় মানবসভ্যতা উন্নতর অবস্থায় পৌঁছেছে।

বিশ্ব সভ্যতার পথ পরিক্রমায় শ্রমিকগণ কালের পরিবর্তন ও বিবর্তনের প্রতিটি সময়ে নির্যাতিত হয়েছে এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যার ধারাবাহিকতা এখনও বর্তমান। বিশ্ব সভ্যতায় প্রতিটি কালে শ্রমিকের রক্তের উপর ভিত্তি করে পুঁজিপতিরা সম্পদের পাহাড় গড়েছে। অথচ সেখানে শ্রমিকের কোনো অধিকার নেই। তারা সর্বদা নিগৃহীত ও নির্যাতনের শিকার। এক্ষেত্রে

---

[৪২২] আল কুর'আন, সূরা আল কাসাস: ২৬

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

[৪২৩] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৪র্থ খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল ইজারাহ, বাবু রা'আইল গানাম 'আলাল করারিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة

[৪২৪] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ১ম খণ্ড, কিতাবুল বুইউ', বাবু কসবুর রাজুলি ওয়াল আমালু বিয়াদিহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

قال النبي ﷺ:ما أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده

মানবতার মুক্তির একমাত্র পথ ইসলাম শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করে সুস্পষ্ট মৌল নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যার মধ্য দিয়ে সকল সময়ে যুগোপযোগী শ্রমনীতি নির্ধারণ করা যায়,[৪২৫] কিন্তু এর ভিত্তিতে পুঁজিবাদী সম্পদশালীরা শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন না করে বরং তাদের উপর জুলুম অত্যাচার অব্যাহত রাখে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা শ্রমিকদের উপর জুলুম করতে নিষেধ করেছেন। ঐসব জুলুমকারীদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেন, "হে মানবজাতি! তোমাদের আগের জাতিদেরকে (যারা তাদের নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জুলুমের নীতি অবলম্বন করেছিল। তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এলেন, কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনলো না, এভাবে আমি অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি"[৪২৬]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে সকলেই সমান। সকল মানুষ একই সম্প্রদায়ভুক্ত, সবাই হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান। এখানে বৈষম্য, বিভাজন করার কোনো সুযোগ নেই। সকল মানুষ আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী চলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমাদের এ উম্মত আসলে একই উম্মত। আর আমি তোমাদের প্রভু। কাজেই তোমরা আমার ইবাদাত করো।"[৪২৭] সকল মানবসন্তান এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তারা সবাই সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ করবে না। যদি কখনো তাদের মধ্যে ঝগড়া বা বিবাদ দেখা দেয় তখন তারা আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করে নিবে। সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক মীমাংসা করে নাও।"[৪২৮] এজন্য সর্বদা আল্লাহ্র আইনের উপর নির্ভর করতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে।

একজন শ্রমিক শ্রমলব্ধ জীবিকা দিয়ে তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণ করে। অন্যজন শ্রমিকের শ্রমের উপর নির্ভর করে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ প্রয়োজনীয় সকল কাজ-কর্ম সম্পাদন করে। তাই সকলের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ সমঝোতা খুবই প্রয়োজন। যদি একে অন্যের প্রয়োজন পূরণ না করে, তবে সেখানে সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে একটি কথা বিবেচনায় রাখতে হবে যে, মালিক যেমন তার অধীনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে ঠিক তেমনি শ্রমিকের দায়িত্ব হলো তার শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা দিয়ে মালিকের আমানতকে আগলে রাখা। কারণ শ্রমিকের উপর অর্পিত দায়িত্ব হলো তার জন্য আমানত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "সর্বোত্তম শ্রমিক সে, যে দৈহিক দিক দিয়ে শক্ত-

---

৪২৫ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৪২৬ আল কুর'আন, সূরা ইউনুস: ১৩

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

৪২৭ আল কুর'আন, সূরা আল আম্বিয়া: ৯২

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

৪২৮ আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ৫৯

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

সামর্থ্য ও আমানতদার।"[৪২৯] সকলকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল আর প্রত্যকেই তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে মেনে চলবে। তাই আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে যদি মালিক শ্রমিকের এবং শ্রমিক মালিকের উভয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে, তবে সেখানে কোনো সংঘাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বরং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজে বিদ্যমান মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে সম্পদের মালিকানার উপর ভিত্তি করে। অথচ সেই সম্পদ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নিজ অনুগ্রহে মানুষকে দান করেন। কাউকে তিনি বেশি সম্পদ দান করেন আবার কাউকে তিনি কম সম্পদ দান করেন, আবার কাউকে তেমন কোনো সম্পদই দান করেন না। কিন্তু তাই বলে যিনি সম্পদশালী তিনি অন্যদের কোনো মর্যাদা দিবেন না তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেয়া যায়, মালিক তার সম্পদ থেকে তার অধীনস্থদের জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্যও কোনো কিছু দেয় না। তাদের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করে, যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। এসব ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, "আর আল্লাহ্‌ তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর রিযিকের ব্যাপারে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। অতএব, যাদেরকে এই মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় রিযিক থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করে?"[৪৩০] অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, "একটু চিন্তা করো। দুনিয়ায় লোকদের মাঝে এক শ্রেণির উপর আরেক শ্রেণির লোকদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। আর আখিরাতে কারো মর্যাদা আরো বড় হবে এবং তার ফজিলত হবে আরো বেশি।"[৪৩১]

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিকের মর্যাদা দিয়েছেন। যখন দুনিয়ার কোথাও শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে মানুষের কোনো সচেতনতাই ছিল না, কোনো অধিকার ছিল না, সেই অন্ধকার যুগে বিশ্ব-মানবতার মুক্তির দূত মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে নারী, পুরুষ, শ্রমিক, সাধারণ জনতা নির্বিশেষে সকল মানুষ মৌলিক অধিকার পরিপূর্ণরূপে ভোগ করেছে। তিনি মানুষের ভেদাভেদ ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আদর্শ সমাজ গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি শ্রমিক ও মালিকের সর্ম্পককে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রদর্শিত ইসলামী শ্রমনীতি শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার দিয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সর্বাস্থায় শ্রমিকের মর্যাদা সমুন্নত করেছে। তাঁর প্রখ্যাত সাহাবীগণের অনেকে শ্রমিক ছিলেন। যেমন: হযরত ওমর (রা.) পরবর্তীতে ইসলামী

---

[৪২৯] আল কুর'আন, সূরা আল কাছাছ: ২৬

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

[৪৩০] আল কুর'আন, সূরা আন নাহ্‌ল: ৭১

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

[৪৩১] আল কুর'আন, সূরা বণী ইসরাঈল: ২১

انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। অর্ধ পৃথিবীতে তিনি কালেমার পতাকা উড়িয়ে ছিলেন। হযরত আলী (রা.) ইসলামী হুকুমাতের খলিফা ছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) প্রখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। ইবনে মাসঊদ (রা.)-সহ অনেকেই ছিলেন এক একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র।[৪৩২] তারা সকলে এক কালে শ্রমিক বা দাস ছিলেন, তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম মর্যাদা দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের দিন এক কালের হাবসী গোলাম হযরত বিলাল (রা.)-কে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেন।[৪৩৩]

ইসলামপূর্ব যুগে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের ন্যায়। তখন শ্রমিকদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হতো, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালিক ও শ্রমিকের মধ্যকার সেই তিক্ত সম্পর্ককে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে ভ্রাতৃত্যের সম্পর্ক গড়ে তুললেন। তারা একে অন্যের সুখ ও দুঃখের সাথী হয়ে নিজেদের প্রতি দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ হয়েছিল। মালিক ও শ্রমিক একে অন্যের ভাই হয়ে গেল। শ্রমিকদের প্রাপ্য দেয়ার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেরি পছন্দ করতেন না। তাই তিনি শ্রমিকের কাজ সমাপ্ত করার সাথে সাথে পারিশ্রমিক দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে শ্রমিকরা তাদের শ্রমলব্ধ মূল্য দিয়ে পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ঘাম শুকানোর আগেই শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"[৪৩৪]

ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য হলো সামঞ্জস্যপূর্ণ পৃথিবী গঠন করা। যেখানে সকলের ভারসাম্যপূর্ণ অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।[৪৩৫] এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একজন মানুষ তার ভাইয়ের সাথে যে আচার-ব্যবহার করবে করে, ঠিক তেমনি শ্রমিকের সাথেও তাই করবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> *"তোমাদের চাকর-চাকরানি ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ভাই। তাদেকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার ভাইকে যেন তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়। তাকে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। তার সাধ্যের অতিরিক্ত যেন কোনো কাজ তার উপর না চাপায়। একান্ত যদি চাপাতেই হয়, তবে তা সমাধা করার ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত।"*[৪৩৬]

---

৪৩২ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৪৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৪৩৪ ইবনে মাজাহ্, *আস্ সুনান*, ২য় খণ্ড, বাবু আজরিল উজারা, দার আল ফিক্‌র, বৈরুত-১৯৯১, পৃ. ৪১৭
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.

৪৩৫ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৪৩৬ ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, কিতাবুল আইমান, বাব ইত'আমুল মামলূকে মিম্মা ইয়াকুল ওয়া ইলবাসুহু মিম্মা ইয়ালবাসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯
هم إخوانكم خوَلُكم جعَلَهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليُطعِمْه ممَّا يأكلُ ويُلبِسْه مما يلبَس ولا تكَلِّفوهم ما يغلِبُهم، فإنْ كلَّفتُموهم فأعينُوهم،

ইসলাম শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত সকল অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে বৈষম্যহীন ও মানবাধিকার রক্ষার একটি কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যাতে শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সু-প্রতিষ্ঠিত করা যায়। শ্রমিকরা তাদের সৃষ্টিশীলতা দিয়ে পৃথিবীকে মানুষের জন্য বসবাসের উপযোগী করে প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করার কাজে নিয়োজিত থাকে। তারা মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিজেদের সর্বক্ষণ নিয়োজিত করেছে। তাই মানবসভ্যতার সকল উৎকর্ষতায় শ্রমিকদের ত্যাগ চির অম্লান হয়ে থাকবে। সেজন্য শ্রমিকের মর্যাদা অনেক বেশি হওয়া উচিত, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তারা তাদের কাজের মূল্যায়নে পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা পায় না। তারা সব সময় অবহেলিত ও উপেক্ষিত থেকে যায়।

ইসলাম শ্রমব্যবস্থার যে রূপরেখা দিয়েছে তা যদি সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা যায় তবে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিদ্যমান বিভাজন রহিত হবে। এই শ্রমব্যবস্থায় অধীনস্থদের উপর সর্বদা উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীনস্থ, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করবে।"[৪৩৭] তাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে শ্রমিকদের সাথে অবশ্যই নম্র আচরণ করতে হবে। আর যারা এক্ষেত্রে আল্লাহ্ নির্দেশ অমান্য করবে তারা আল্লাহ্র দয়া পাবে না। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতি দয়া করে না, স্রষ্টার পক্ষ থেকে তার প্রতি দয়া করা হবে না।"[৪৩৮] ইসলাম সব ক্ষেত্রে শ্রমিকের মর্যাদা সমুন্নত করার কথা বলেছে। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে পুঁজিবাদী ও সামাজতান্ত্রিকসহ প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকদের যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সে কারণে সমগ্র বিশ্বব্যবস্থায় শ্রম অসন্তোষ বিরাজ করছে, যা সকল মানবজাতির জন্য অকল্যাণকর। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিকসহ প্রচলিত অর্থব্যবস্থার শোষণ ও দমন নীতির কারণে শ্রমের মর্যাদা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।

শ্রমিকরা দরিদ্র শ্রেণির হওয়ায় মানসিকভাবে তারা সকল সময়ই দুর্বল হয়। কারণ অর্থ-বিত্তের প্রভাব প্রতিপত্তি না থাকলে মানুষ মানসিকভাবে দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে। এ কারণে সমাজে দরিদ্রদেরকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখা হয়। ধনীদের জন্য এক সমাজ আর দরিদ্রদের জন্য আর এক সমাজ। এভাবেই সামাজিক বিভাজন তৈরি হয়েছে। সাধারণত শ্রমিকরা যেহেতু দরিদ্র শ্রেণির হয়ে থাকে সেহেতু তাদের প্রতি ধনীদের কোনো সম্মানবোধ থাকে না। ধনীরা তাদেরকে তাদের চাকর হিসেবে মনে করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, কিন্তু শ্রমিকদের সাথে এ ধরনের আচরণ করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তিনি যদি কখনো শুনতেন যে, কোথাও কোনো শ্রমিকের সাথে উচ্চ বংশীয় কোনো ব্যক্তির ঝগড়া হয়েছে এবং উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি শ্রমিককে তার বংশ

---

[৪৩৭] আল কুর'আন, সূরা আশ শু'আরা: ২১৫

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

[৪৩৮] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৯ম খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল আদব, বাবু রাহমাতিন্নাছি ওয়াল বাহা'ইম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

حديث جرير بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ :من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.

বা তার কাজের পরিচয় নিয়ে কথা বলেছে তখন তিনি খুবই অখুশি হতেন।[৪৩৯] তিনি সর্বদা শ্রমিকের সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য বলেছেন। তিনি শ্রমিকদের কাজকে সহজ করে দেয়ার জন্য নিয়োগকর্তাকে উৎসাহ দিতেন। প্রয়োজন হলে তাদের কাজে নিয়োগকর্তাকেও সহযোগিতা করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "তাদের জন্য কষ্টকর এমন কাজের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দিও না। তবুও যদি তা করতেই হয় তবে নিজে তাদের সাহায্য করবে।"[৪৪০]

শ্রমিকরা অনেক কষ্ট করে নিয়োগকর্তার সকল কাজ করে দেন। শ্রমিকরাই ফসল উৎপাদন করে, সেই ফসলকে খাওয়ার উপযোগী তারাই করে থাকে। বাসা-বাড়িতে মালিকদের খাদ্যদ্রব্য মূলত শ্রমিকরাই তৈরি করে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো তারা খেতে পায় না, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিকদের হাতের স্পর্শে তৈরি খাদ্যদ্রব্য তাদের দেয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "তোমাদের খাদেম খাবার তৈরি করে এবং তা নিয়ে যখন তোমার কাছে আসে, যা রান্না করার সময় আগুনের তাপ ও ধোঁয়া তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, তখন তাকে তোমার সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াবে। খাবার যদি অল্প হয় তবে তা হতে তার হাতে এক মুঠো, দু'মুঠো অবশ্যই তুলে দিবে।"[৪৪১]

শ্রমিকরা যখন কাজ করে তখন অনেক সময় তারা অপরাধ করে বা কাজে ভুল করে। এক্ষেত্রে এগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তারা যতই ভুল করুক না কেন সেদিকে খেয়াল না করে তাদের বার বার ক্ষমা করতে হবে। তাদের সাথে সর্বদা ভালো ও উত্তম আচরণ করতে হবে। কারণ শুধু সালাত, রোযা, হজ পালন করলেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করা যাবে না বরং তা পালন করার সাথে সাথে শ্রমিকদের সাথেও ভালো ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সালাতে খেয়াল রেখ, আর তোমাদের অধীনে যারা আছে তাদের ভুলে যেও না।"[৪৪২] কোনো শ্রমিক ভুল করলে তাকে ক্ষমা করার পরিবর্তে যদি খারাপ ব্যবহার করা হয়, তাকে কষ্ট দেয়া হয়, তবে তা ইসলাম পরিপন্থী কাজ বলে বিবেচিত হবে। শ্রমিকের সাথে এমন কোনো কষ্টদায়ক ব্যবহার করা যাবে না, যাতে শ্রমিক হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করে। তাদের সাথে সর্বদা উত্তম ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রা.) বলেন, "আমাকে একদিন রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজ করতে বললেন। আমি ঐ কাজ করতে রওনা হলাম, কিন্তু পথে ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে গেলাম। তখন হঠাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোথা থেকে এসে ধরে ফেললেন, আমি রাসূলুল্লাহর দিকে তাকালাম, তাঁকে হাসতে দেখতে পেলাম

---

৪৩৯ ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. **৭১**

৪৪০ ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, ২য় খণ্ড, বাবুল ইহসান ইলাল মালিক, প্রাগুক্ত, পৃ. **১২১৬**
ولا تكَلِّفوهم ما يغلِبُهم، فإنْ كلَّفتُموهم فأعينُوهم

৪৪১ ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ্*, কিতাবুল আইমান, বাব ইত'আমুল মামলূকে মিম্মা ইয়া'কুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯
عن أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ "

৪৪২ ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, ২য় খণ্ড, বাবু হাল আওসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, প্রাগুক্ত, পৃ. **৯০১**
قال رسول الله ﷺ:" الصلاة الصلاة، وما ملكتْ أيمانُكم".

অতঃপর তিনি বলেন, ইয়া উনাইস তোমাকে যা করতে আদেশ করেছিলাম তা করে এসো, তখন আমি বললাম, জি, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাচ্ছি।"[৪৪৩] তিনি আরো বলেন, "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দশ বছর পর্যন্ত খেটেছি, তাঁর খেদমতে কাজ করেছি, কিন্তু তিনি কোনো দিন আমাকে ভর্ৎসনা করেন নি। কোনো দিন বলেন নি, এটা এমনভাবে কেন করেছো, ওটা ঐভাবে কেন করনি।"[৪৪৪]

শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা সচেতন ছিলেন। কেউ যেন তাদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে সে প্রসঙ্গেও তিনি সতর্ক করেছেন। কারণ শ্রমিকদের ব্যাপারে তাদের অভিভাবকগণ ও মালিকগণ এবং পরিচালকগণ জিজ্ঞাসিত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "শুনে রাখ, তোমরা সবাই পরিচালক আর যারা তোমাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তাদের সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"[৪৪৫] তিনি উত্তম ব্যক্তির পরিচয় দিতে গিয়েও শ্রমিকের সাথে সদাচারণকারীকেই উত্তম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিকের প্রকৃত প্রাপ্য তাকে অতি দ্রুত দেয়ার জন্য জোর দিয়েছেন। তিনি পারিশ্রমিক নির্ধারণ ছাড়া শ্রমিকদের থেকে অতিরিক্ত কাজ করানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অনেক সময় চুক্তির চেয়ে বেশি কাজ করে নেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বেশি কাজ করে নেয় অথচ মজুরি বেশি দেয় না। এ অবস্থায় অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিক অবশ্যই দিয়ে দিতে হবে। যারা শ্রমিকদের দ্বারা অতিরিক্ত কাজ করে অথচ তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয় না, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরোধী থাকবো। (এক) ঐ ব্যক্তি, যে আমার নামে কোনো চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে। (দুই) সেই ব্যক্তি, যে কোনো স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। (তিন) সেই ব্যক্তি যে,

---

[৪৪৩] ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, কিতাবুল ফযায়িল, বাবু কানা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহসানুন নাসি খুলুকান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬

قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس اذهب حيث أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله

[৪৪৪] ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬

قال أنس والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء صنعت لم فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا

[৪৪৫] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ১ম খণ্ড, কিতাবুল 'ইতকি, বাব আল 'আবদু রা'ইন ফী মালি সাইয়েদিহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته : الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته؛ فكلكم راع ومسئول عن رعيته

মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরিভাবে করে নিয়েছে, অথচ তার মজুরি দেয় নি।"[৪৪৬] এছাড়াও শ্রমিকের শ্রমলব্ধ উৎপাদনে অর্জিত লভ্যাংশে ইসলাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিককে লভ্যাংশের অধিকার প্রদান করে। শ্রমিক তার প্রচেষ্টায় উৎপাদিত পণ্যে মুনাফার অংশীদারিত্বে চুক্তি করতে পারে। মালিক তার অর্থ বিনিয়োগ করবে আর শ্রমিক তার শ্রমের অংশীদারিত্বে কাজ করবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এই নিয়মের ভিত্তিতে শ্রম বিনিয়োগ করে হযরত খাদিজার (রা.) ব্যবসায় অংশীদার হয়েছিলেন।

অনেক সময় একজন শ্রমিকের অসহায়ত্বের সুযোগে শ্রমিককে তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দিয়ে তাকে কম দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। শ্রমিক তার প্রয়োজনে সেই অসম চুক্তি করতে রাজিও হয়, যদিও তার আরো বেশি পাওয়ার যোগ্যতা ছিল। এক্ষেত্রে ইসলাম সেই অসম চুক্তি করতে নিষেধ করেছে। কারো অসহায়ত্ব বা বিপর্যস্ততার সুযোগে কোনো অসম চুক্তি করলে সেই চুক্তির কোনো মূল্য ইসলামে নেই। এটা একটা জুলুমের চুক্তি এবং সেই চুক্তিকে অবশ্যই বাতিল করতে হবে। এ ধরনের চুক্তিকে ইসলাম কোনো চুক্তি হিসেবে গণ্য করে না।[৪৪৭] এছাড়াও কোনো কাজের মজুরি নির্ধারণ করতে হবে ইনসাফের ভিত্তিতে। তা না হলে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না। এজন্য ইসলাম শ্রমের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রমিকের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিয়েছে। কাজের মূল্য নির্ধারণ হওয়ার পর অবশ্যই তা পরিশোধ করতে হবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা চুক্তি পূর্ণ করার ব্যাপারে বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।"[৪৪৮]

শ্রমিক অধিকার বঞ্চিত হলে অবশ্যই তা মানবতার চরম লঙ্ঘন। ইসলাম মানবতাবিরোধী সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে। ইসলাম শ্রমিকদের এমন মর্যাদা দিয়েছে যে, তাদের জন্য কোনো মর্যাদাহীন শব্দ প্রয়োগও ইসলাম অনুমোদন করেনি বরং তা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামই শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে, দিয়েছে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, কোনোভাবেই যাতে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন না হয় সেজন্য ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলাম মানুষের মর্যাদাকে মানুষ হিসেবে সমুন্নত করেছে। যেখানে মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে কোনো বিভাজন ও বৈষম্য করা হয় নি। এমন একটা সময় ছিল যখন ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন দাস ও শ্রমিক শ্রেণি থেকে আসা মানুষ।[৪৪৯] এভাবে ইসলাম কেবল শ্রমিকের অধিকার সুনিশ্চিত করেনি বরং তার যোগ্যতাকে সম্মান করে তাকে অধিষ্ঠিত করেছে উচ্চাসনে। তাই ইতিহাসে দেখা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় একজন শ্রমিক হতে পেরেছেন বিশাল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান।

---

[৪৪৬] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ১ম খণ্ড, কিতাবুল বুইঊ', বাব ইসমু মান বা'আ হুররান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "قالَ اللَّهُ: ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرًّا فأكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيرًا فاسْتَوْفَى منه ولَمْ يُعْطِ أجْرَهُ"

[৪৪৭] ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

[৪৪৮] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ১
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

[৪৪৯] ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিরাজির মধ্যে মানবজাতি সর্বশ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন সৃষ্টি। তাই আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে নিজেদেরকে সর্বোন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা ও রাখার চেষ্টা করা তাদের দায়িত্ব। তাদের মধ্যে সার্বিক উন্নতি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য সমাজের প্রতিটি স্তরে ন্যায়বিচার কায়িম করাও তাদের পারস্পরিক কর্তব্য। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সমাজের সর্বস্তরে অন্যায়-অবিচার সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় চর্তুদিকে সংক্রমিত হতে থাকে। যার প্রভাবে সামাজিক বন্ধন ধ্বংস হয়ে যায়, মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে সমাজে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। সৃষ্টিগত ও স্বভাবগতভাবে মানুষ স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর হয়। তারা শয়তানের প্ররোচনায় কুপ্রবৃত্তির বর্শবর্তী হয়ে লোভ-লালসার মধ্যে পড়ে কোনো অন্যায় পথ গ্রহণ করতেও দ্বিধা করে না। ফলে মানুষের মাঝে পারস্পরিক মিল-মহব্বত সৌহার্দ্য সম্প্রীতিসহ সকল মানবীয় গুণাবলী বিলুপ্ত হয়। তাদের মধ্যে হিংস্রতা ও পশুত্ব জেগে উঠে। অন্যের অধিকার পদদলিত করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তখনই মানবসমাজে শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। অন্যায়-অবিচারে পরিপূর্ণ হয়ে সমাজ অশান্তিময় হয়ে উঠে। সমাজে খুন, হত্যা, ধর্ষণসহ সকল প্রকার অপরাধ কাজ বাড়তে থাকে স্রোতের গতিতে। বিশেষ করে দরিদ্র, অভাবী, সুবিধাবঞ্চিত মানুষেরা সকল ক্ষেত্রের মতই ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বঞ্চিত হয়। তারা ন্যায়বিচার পায় না। যদি ধনী ও তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তবে তাদের পক্ষে কেউ অবস্থান করতে চেষ্টা করে না, সবাই ধনীদের পক্ষে থাকার চেষ্টা করে। কারণ ধনীদের পক্ষ থেকে কিছু পাওয়ার সুযোগ থেকে যায়, কিন্তু দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতি ন্যায়বিচার করলে ঐ সকল সুবিধা পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না, এজন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধনীদের পক্ষেই রায় হয়ে যায়, কিন্তু মানবসমাজে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষ যাতে সুবিচার পায়, আর এ সামাজিক অসাম্য প্রতিরোধের জন্য সকল অবস্থায় সকল স্থানে ও স্তরে ন্যায়বিচার কায়িম করা প্রয়োজন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজের প্রতিটি স্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের মাঝে পারস্পরিক মিল-মহব্বত, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজ হয়ে উঠে শান্তিময়।

ইসলামী শরী'আতে ন্যায়বিচারই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মৌল ভিত্তি। যার সুফল সমাজের বসবাসরত সকল শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই প্রাপ্য। কারণ ইসলামী আইন কারোর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের কারণে পক্ষপাতিত্ব করে না। সকল অবস্থায় সকল সময়ে তা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর যখন তুমি বিচার করবে, তখন লোকদের মাঝে ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারীদের পছন্দ করেন।"[৪৫০] এজন্য ইসলামী সমাজদর্শনে মানুষ যে আইনগত ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার রূপরেখা

[৪৫০] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ৪২

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

পেয়েছে তা অন্য কোনো সমাজদর্শনে নেই। ইসলাম মানুষের মানবিক মর্যাদায় সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। কারণ পৃথিবীর সকল মানুষই এক আল্লাহ্‌র বান্দা এবং সকল মানুষই আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান। সকল মনুষকেই মায়ের পেটেই জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়। অতঃপর তার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর সে অতীত হয়ে যায়। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রকার সীমালংঘনের কোনো সুযোগ নেই। তাই সীমালংঘন না করে আল্লাহ্‌র দেয়া আইনানুসারে জীবন পরিচালিত করতে হবে। কোনোভাবেই মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না। মানুষের অধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী আইন-বিধান দিয়েছেন। ইসলামী আইন-বিধান রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে পূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

আল্লাহ্ প্রদত্ত ন্যায়বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এটি একটি ফরয ইবাদাত।[৪৫১] মানবজাতির মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধভিত্তিক মানবীয় গুণাবলী অর্জন করা জরুরি। আর সেই গুণাবলী অর্জন করার জন্য আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের দেয়া নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে। মানবজাতির মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে বসবাসের জন্য আল্লাহ্‌র দেয়া ন্যায়বিচার ব্যবস্থার বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে সময়ের পথ পরিক্রমায় নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন।[৪৫২] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচাররের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। ... আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী।"[৪৫৩]

আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানবীয় দুর্বলতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে ইনসাফ কায়িম করতে বলেছেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ন্যায়বিচার, সদ্ব্যবহার এবং আত্মীয়দেরকে দান করার আদেশ দান করেন, আর অশ্লীল ও খারাপ কাজ করতে নিষেধ করেন।"[৪৫৪] ন্যায়বিচার ইসলামী আদর্শের মুখ্য উদ্দেশ্য।[৪৫৫] ইসলামের প্রতিটি দিক-নির্দেশনা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইনসাফপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রচলনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন। ন্যায়বিচার এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, যদি ন্যায়বিচার করার ক্ষেত্রে

---

৪৫১ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী শরীয়ত ও বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা-২০১২, পৃ. ১৯

৪৫২ মুহাম্মাদ সালাউদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

৪৫৩ আল কুর'আন, সূরা আল হাদীদ: ২৫

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

৪৫৪ আল কুর'আন, সূরা আন নাহ্‌ল: ৯০

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ

৪৫৫ মুহাম্মাদ সালাউদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬

আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তবুও সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আর যখন কথা বল, ইসনাফের সাথে বল, তা নিকট আত্মীয়ের ব্যাপারে হলেও।"[৪৫৬]

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করার জন্য নবী ও রাসূলদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি হযরত দাঊদ (আ.)-কে নির্দেশ প্রদান করে বলেছিলেন, "হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। কেননা, এটা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী হয় অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। যেহেতু তারা কিয়ামতের বিচার দিবসকে ভুলে গেছে।"[৪৫৭] অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ বলেন, "আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ্ তোমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তুমি সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করো।"[৪৫৮] এজন্য বলা যায় যে, ইসলামী বিচারব্যবস্থাই কেবল ন্যায়বিচারপূর্ণ কল্যাণময় বিচারব্যবস্থা। এ বিচারব্যবস্থা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য রহমাতুল্লিল আলামিন হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এজন্য তিনি মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তিন সকল মানুষের স্ব স্ব অধিকার নির্ধারণ করে দিয়ে তা ভোগ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। সর্বোপরি, তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।"[৪৫৯] এক্ষেত্রে তিনি ইসলামী আইনব্যবস্থা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কিন্তু বর্তমান সমাজে মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার পরিলক্ষিত হয় না। যারাই ক্ষমতা গ্রহণ করে তারাই সকলের অধিকার ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতাকে সমুন্নত করে সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছিলেন। মানব ইতিহাসে তাঁর গৃহীত সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার অনন্য দৃষ্টান্ত আর কেউ দেখাতে পারেনি। তাঁর সারা জীবনের ত্যাগ ও সংগ্রাম ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রে অত্যাচার ও অবিচারের মূলোৎপাটন করে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করা।

---

[৪৫৬] আল কুর'আন: সূরা আল আন'আম: ১৫২

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

[৪৫৭] আল কুর'আন, সূরা ছোয়াদ: ২৬

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

[৪৫৮] আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ১০৫

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ

[৪৫৯] আল কুর'আন, সূরা আশ শূরা: ১৫

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

সামাজিকভাবে বসবাসের ক্ষেত্রে মানুষের আদর্শ সংক্রান্ত বিষয়, ব্যক্তিগত, জাতিগত বা অন্য কোনো কারণে দ্বন্দ্ব সংঘাত হতে পারে, কিন্তু সে কারণগুলো যেন কোনোভাবেই ন্যায়বিচার থেকে মানুষকে দূরে রাখতে না পারে। কারণ ইনসাফপূর্ণ বিচারব্যবস্থা ব্যতীত সমাজে কোনোভাবেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই পরিপূর্ণভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুবিচার প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বোচ্চ সুবিচারক হওয়ায় তিনি ইসলামকে মানুষের জন্য জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করে বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সুবিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। ...এবং নির্লজ্জতা অন্যায় ও জুলুম করতে নিষেধ করেছেন।"[৪৬০]

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও যোগ্য বিচারক সৃষ্টির জন্য কখনো কখনো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সাহাবীকে তাঁর উপস্থিতিতেই বিচারকার্য পরিচালনার আদেশ দিতেন। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারূক (রা.), হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.), দাহিয়ায়ে কালবী (রা.), আবূ মূসা আশ'আরী (রা.), উবাই ইবন কা'ব (রা.), যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) ও আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা.) প্রমুখ সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিচারকার্য পরিচালনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল কোনো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করলে সেখানে তিনি একজন সাহাবীকে পাঠিয়ে দিতেন। উক্ত সাহাবী তাদেরকে দীন শিক্ষা দিতেন এবং তাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা করতেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী সমাজের সকল পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল অবস্থায় সকলের মাঝ থেকে অন্যায়-অবিচার দূর করে ইনসাফ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা সত্যের উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও ও ন্যায়বিচারের সাক্ষী হয়ে যাও। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের সুবিচার থেকে দূরে না রাখে। তোমরা ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করো। এটি তাকওয়ার সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা জানেন।"[৪৬১] এজন্য ন্যায়বিচারভিত্তিক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অসহায় অভাবী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের সকল স্তরে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। কোনোভাবে সেখানে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও অনিয়ম করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের অনুসারী ও আল্লাহ্র সাক্ষী হয়ে যাও, যদিও তা নিজের ও নিজের পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হোক। তাদের মধ্যে ধনী বা গরিব যাই হোক না কেন, আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। কাজেই কামনার বশবর্তী হয়ে ইনসাফ থেকে দূরে থেকো না। আর যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা সত্যকে পাশ কেটে সত্য গোপন

---

[৪৬০] আল কুর'আন, সূরা আন নাহ্ল: ৯০
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ

[৪৬১] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ৮
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

কর তবে জেনে রেখো, তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ্ সবকিছু দেখছেন।"[৪৬২] এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, "তুমি যদি বিচার নিষ্পত্তি করো তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।"[৪৬৩] এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য,

> *"আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি করেছিল। তখন তারা বলল, এ ব্যাপারে কে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলতে পারবে? কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই কথা বলার সাহস করল না। উসামাহ (রা.) এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আলোচনা করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বনী ইসরাইল তাদের গণ্যমান্য পরিবারের কেউ চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত এবং দুর্বল কেউ চুরি করলে তারা তার হাত কেটে দিত। আল্লাহর শপথ! আমার মেয়ে ফাতিমা হলেও আমি তাঁর হাত কেটে ফেলতাম।"*[৪৬৪]

আল্লাহ্ মানবসমাজ থেকে সব ধরনের জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করে সকল পর্যায়ে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। আল্লাহ্ মানুষকে মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল অসহায় সুবিধাবঞ্চিতদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে চিরতরে মুক্তির জন্য ইনসাফভিত্তিক সমাজব্যবস্থার রূপরেখা দিয়েছেন। তিনি যে বিচারব্যবস্থা দিয়েছেন তার বাস্তবায়ন হতে হবে স্বাধীনভাবে। যেখানে পক্ষপাত ও স্বজনপ্রীতিমূলক কোনো অবস্থা থাকবে না।[৪৬৫] বিচারব্যবস্থার সকল স্তরে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোনোভাবেই সেই অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। বিচার প্রার্থীর প্রতি সকল অবস্থায় সমান গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "বল, আমার প্রভু আমাকে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৪৬৬]

---

[৪৬২] আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ১৩৫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

[৪৬৩] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ৪২

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

[৪৬৪] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৩য় খণ্ড, (অনু: তাপা) কিতাবুল ফাদা'ইলিস সাহাবাহ, বাবু যিকরি উসামাতাবনি জাইরি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৬

حديث عائشة -رضى الله عنها-: "أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله ﷺ؟، فكلمه أسامة، فقال رسول الله ﷺ :أتشفع في حد من حدود الله؟، ثم قام فاختطب ثم قال :إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها.

[৪৬৫] 'আর যখন কোনো কথা বল, ইনসাফের সাথে বল, তা নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে হলেও'। আল কুর'আন, সূরা আল আন'আম: ১৫২

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

[৪৬৬] আল কুর'আন, সূরা আল আ'রাফ: ২৯

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

ইসলামী বিচারব্যবস্থার মৌল উপাদানই হলো ন্যায়বিচার। আর সেজন্য অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, যোগ্য ও সাহসী বিচারক একান্ত প্রয়োজন। বিচারক সর্বদা দুর্বল ও অসহায় মানুষের মানবাধিকার সমুন্নত রেখে মজলুমের পক্ষে অবস্থানকারী এবং জুলুমকারীর শাস্তি প্রদানকারী হবে। তারাই আল্লাহ্ বিধান মোতাবেক বিচার-ফায়সালাকারী হবে। যাদের সমাজব্যবস্থা ও ইসলামী আইনের উপর অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, যারা বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে মানুষের স্বভাব ও চরিত্র পরিমাপ করার যোগ্যতা রাখেন, যারা প্রতিকূল পরিবেশেও ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সাহসী তারাই ইসলামে বিচারক হওয়ার যোগ্য। এজন্য ইসলাম বিচারকদের মর্যাদা অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত করেছে। তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে কোনো প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না। বিচার করার সময় শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোনো প্রকার পক্ষপাতমূলক অবস্থান গ্রহণ করবেন না। যদি কোনো কারণে দায়িত্বে অবহেলা করেন, পক্ষপাতমূলক অবস্থান গ্রহণ করেন তবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসিক।"[৪৬৭] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন, "সুতরাং মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করো না। আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা বিচার-ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"[৪৬৮]

বিচারকগণ ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অপারগতা, অনীহা ও অবহেলা করবেন না। সর্বদা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদের আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠা করার আদেশ করেছেন।"[৪৬৯] বিচারকদের বিচারকাজ পরিচালনার জন্য অবশ্যই অত্যন্ত সর্তক পন্থা গ্রহণ করে বিচার-ফায়সালা করতে হয়। এজন্য বিচারকার্য সম্পাদনের সময় বিচারপ্রার্থী ও অভিযুক্ত পক্ষকে সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রজ্ঞা দিয়ে বিশ্লেষণ করে আল্লাহ্র আইন অনুযায়ী রায় প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ্ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, দর্শনকারী।"[৪৭০] এভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুবিধবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

---

[৪৬৭] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ৪৭

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

[৪৬৮] আল কুর'আন, সূরা আল মায়িদা: ৪৪

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

[৪৬৯] আল কুর'আন, সূরা আন নাহ্ল: ৯০

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

[৪৭০] আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ৫৮

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবেশীর অধিকার

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানবজীবন পরিচালনার জন্য একে অন্যের সাথে সমাজবদ্ধভাবে প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস করতে হয়। আর সামাজিক জীবনে প্রতিবেশী অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশী ছাড়া বসবাস করা অত্যন্ত কঠিন। সেজন্য স্বাভাবিকভাবে একজন অন্যজনের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। প্রতিবেশীকে একে অন্যের প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় সহযোগী হয়ে কল্যাণকামী হতে হয়। এজন্য প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ বা গোত্র ইত্যাদি বিষয়ে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে শুধু মানবতাকে সমুন্নত রেখে তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের কথা বলা হয়েছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার জন্য ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সকল ক্ষেত্রে এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক প্রত্যেকের জন্য সাহায্যকারী, সহনশীল, উত্তম প্রতিদানকারী ও সর্বোপরি, কল্যাণকামী হবে। এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর কাছে সর্বদা নিরাপদ থাকবে। এজন্য ভালো প্রতিবেশী সমাজ জীবনে খুবই প্রয়োজন। কারণ প্রতিবেশীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে অন্য প্রতিবেশীর মানবিক অধিকার সুরক্ষিত হয়। তাই মানুষের জীবন প্রবাহে প্রতিবেশী অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। আর প্রতিবেশী যদি অভাবী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত হয়, তবে তাদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি আরো বহুমুখী হয়ে উঠে। সেই দায়িত্ব পরিপালনের জন্য প্রয়োজন হয় সঠিক ও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনার। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার জন্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা সবাই আল্লাহ্র ইবাদাত কর। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। নিকটাত্মীয়, এতিম ও মিসকীনদের সাথে নেক আচরণ কর এবং আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধীনে যারা রয়েছে তাদের প্রতি সদয় হও। নিশ্চয়ই জেনে রাখ, আল্লাহ্ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে বড় হওয়ার অহংকার করে।"[৪৭১]

প্রতিবেশীর হক রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। সর্বদা প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে। তাদের প্রতি নজর রাখতে হবে, যাতে প্রতিবেশীরা ক্ষুধার্ত না থাকে। যদি কেউ ইচ্ছাকৃত তার প্রতিবেশীর প্রয়োজনে সাহায্যের হাত প্রসারিত না করে তবে তার উপর থেকে আল্লাহ্র নিরাপত্তা উঠে যায়।[৪৭২] প্রতিবেশীর প্রতি এমন মনোভাব রাখতে হবে, যেন প্রতিবেশী তার নিজের একটি অংশ। এজন্য কোনো যৌক্তিক কারণে প্রতিবেশীকে রান্না করা খাবার দিতে না পারলেও এমনভাবে তা রান্না করতে হবে বা খেতে হবে, যেন উক্ত খাবারের ঘ্রাণ পেয়ে প্রতিবেশী কষ্ট না পায়।

---

[৪৭১] আল কুর'আন, সূরা আন নিসা : ৩৬
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

[৪৭২] ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

যদি রান্না করা খাবার ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য দ্রব্য থাকে তা থেকেও প্রতিবেশীর সন্তানদেরকে দিতে হবে। যদি দেয়া সম্ভব না হয় তবে তা ঘরের মধ্যে রেখে খেতে হবে। কোনোভাবেই যেন প্রতিবেশীর সন্তানরা তা দেখতে না পায়। প্রতিবেশীরা একে অন্যের সাথে পণ্য বিনিময় করবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস। "আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি তরকারি করলে তাতে ঝোল বেশি দিয়ে তোমার প্রতিবেশী পর্যন্ত তা পৌঁছে দিও।"[৪৭৩]

প্রতিবেশীদের সাথে সুন্দরভাবে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন কারতে হবে। কোনোভাবেই এক প্রতিবেশী তার অন্য প্রতিবেশী ভাইয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। যদি কোনো কারণে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষের উদ্ভব হয়, তবে তারা কঠিন ক্ষতির মধ্যে পড়বে। তাই সর্বদা একে অন্যের কল্যাণকামী হতে হবে। প্রতিবেশীর সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে এবং অভাবী, দরিদ্র ও বঞ্চিত প্রতিবেশীদের অধিকারের ব্যাপারে সর্বদা সচেতন হতে হবে। তারা যাতে তাদের অধিকার ভোগ করতে পারে সেদিকে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে।

প্রতিবেশীকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ব্যাপারে সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। সর্বাবস্থায় দরিদ্র প্রতিবেশীর সুখে-দুঃখে, বিপদাপদে সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে হবে। প্রতিবেশীর সহযোগিতার ক্ষেত্রে শুধু খাদ্যদ্রব্য দিয়ে নয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দেয়ার ক্ষেত্রেও সব সময় অগ্রগণ্য থাকতে হবে। দরিদ্র প্রতিবেশীরা ধনী প্রতিবেশীর প্রতি এই আশায় চেয়ে থাকে যে, সচ্ছল প্রতিবেশী তাকে তার ক্ষুধা নিবৃত করতে খাদ্য দিবে, তার অভাব পূরণে এগিয়ে আসবে। এরকম ক্ষুধার্ত ও অভাবী প্রতিবেশী থাকা সত্ত্বেও সচ্ছল প্রতিবেশী যদি তার দরিদ্র প্রতিবেশীর ক্ষুধা ও অভাবের যন্ত্রণা প্রশমনে সাহায্যের হাত প্রসারিত না করে হাত গুটিয়ে থাকে, তবে সে অবশ্যই মুমিন নয়। এজন্য সচ্ছল বা ধনী প্রতিবেশীর দায়িত্ব হলো দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রয়োজন মেটানো। প্রতিবেশীকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে একটি হাদীস, "হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, জিবরাঈল (আ.) বারবারই আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে থাকেন। এমনকি আমার মনে হয় যে, অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন।"[৪৭৪]

উপঢৌকন পাঠানোর মাধ্যমে প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়। এক্ষেত্রে কোনো প্রতিবেশী কোনো উপঢৌকন পাঠালে তা সানন্দে গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু যদি কোনো দরিদ্র প্রতিবেশী তার অক্ষমতার কারণে কোনো মূল্যহীন বা কম মূল্যের উপঢৌকন দেয় তা কোনো

---

[৪৭৩] ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, ৩য় খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল আত'ইমাহ, বাবু মান তাবাখা ফাল ইউকসির মা'আহু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

قال رسول الله ﷺ :يا أبا ذر، إذا طبختَ مرقةً فأكثِر ماءها أي: إذا طبخت لحماً فأكثر ماءه، وتعاهد جيرانك.

[৪৭৪] ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাব, বাবু আল ওয়াসিয়্যাতি বিল জারি ওয়াল ইহসানি ইলাইহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮

قال رسول الله ﷺ :ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.

অবস্থাতেই অবমূল্যায়ন করা যাবে না বা ফেরত দেয়া যাবে না বরং এক মানুষের প্রতি অপর মানুষের ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে উপহারটিকে অবশ্যই গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "আবূ হুরায়রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: হে মুসলিম মহিলাগণ! কোনো প্রতিবেশী মহিলা যেন তার অপর প্রতিবেশী মহিলাকে উপঢৌকন ফেরত দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন না করে। তা ছাগলের পায়ের ক্ষুরই হোক না কেন।"[৪৭৫]

দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সব সময় সচেতন থাকতে হবে। দরিদ্র ও বঞ্চিত প্রতিবেশীর উপর নিজের ক্ষমতা জাহির করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সকল অবস্থায় তাদের সাহায্যকারী হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। কেননা, এটাও প্রতিবেশীর প্রতি উপকার ও অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেশী মানবজীবনে অতি আপনজন। কারণ প্রতিবেশীরাই বিপদে-আপদে, দুঃখ-দুর্দশায় ও প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রথমেই এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে। সকল সামাজিক কাজ-কর্মে প্রতিবেশীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকা, তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা ও তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব।

আল্লাহ্ সকল পর্যায়ের প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি প্রতিবেশীকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। প্রতিবেশীর সাথে এমন আচরণ করতে হবে, যাতে এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে একজন কল্যাণকামী হিসেবে মনে করে।[৪৭৬] প্রতিবেশী যেন মনে করে যে, আমার প্রতিবেশী আত্মার আত্মীয় ও সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যারা অতি আপনজন। তাই প্রতিবেশীর প্রতি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ আচরণ করতে হবে। প্রতিবেশীর বাড়ির পাশে এমনভাবে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে হবে, যাতে প্রতিবেশীর বাড়িতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। এমনভাবে গাছ-গাছালি রোপণ করতে হবে, যাতে প্রতিবেশীর কোনো প্রকার কষ্ট না হয়। আবার অন্যদিকে কোনো প্রতিবেশীর যদি বসবাসের কারণে ঘর তৈরির প্রয়োজন পড়ে এবং সেই ঘর করার জন্য যদি অন্য প্রতিবেশীর দেয়ালে খুঁটি গাড়বার প্রয়োজন হয়, তবে তাও যেন করতে বাধা দেয়া না হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে কাঠ (বাঁশ ইত্যাদি) গাড়তে নিষেধ না করে।"[৪৭৭] এভাবে প্রতিবেশীর প্রতি

---

[৪৭৫] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৯ম খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল আদব, বাবু লা তাহকিরান্না জারাতুন লি জারাতিহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا نساء المسلمات، لا تَحقرنَّ جارة لجارتها، ولو فِرسِن شاة" .

[৪৭৬] ড. মুহাম্মাদ আলী আল হাশেমী, *আদর্শ মুসলিম*, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ১৫৩

[৪৭৭] ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, কিতাবুল মুসাকাত, বাবু গরজিল খাসবি ফি জিদারিল জারি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ في جِدَارِهِ.

কল্যাণকামিতার অনন্য উদহারণ পেশ করতে হবে। প্রতিবেশীর প্রতি সব সময় ভালো ও কল্যাণময় আচরণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করে...।"[৪৭৮]

প্রতিবেশীর প্রতি বিশেষত দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতি যত্নশীল হওয়ার জন্য হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। কোনো প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া, তার সেবা করা ও তার আরোগ্য লাভের জন্য দু'আ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি কোনো প্রতিবেশী সকাল বেলা তার অসুস্থ মুসলিম প্রতিবেশীকে দেখতে যায় তখন সত্তুর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে। আর সন্ধা বেলা অসুস্থ মুসলিম প্রতিবেশীকে দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়।"[৪৭৯]

প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে হোক ধনী বা গরিব, তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করা এবং জানাযা-সংশ্লিষ্ট বিষয় তদারক করা অত্যন্ত কল্যাণকর। ধনী ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণের মানুষের অভাব থাকে না। তার অনেক আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী থাকে। তাই তাদের মৃত্যুর পর জানাযাতে অনেক মানুষের সমাগম হয়। কিন্তু দরিদ্র ও অভাবী মানুষের তেমন শুভাকাঙ্ক্ষী থাকে না, তাই তাদের জানাযা ও দাফন করতে যাতে কোনো সমস্যা না হয় সেজন্য প্রতিবেশীর উচিত, তার দরিদ্র প্রতিবেশীর জানাযায় অংশগ্রহণ করা এবং দাফন কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে সহাবস্থান করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য প্রতিবেশীরা পরস্পরের সহযোগী হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাশাপাশি বসবাস করতে গেলে প্রতিবেশীর সাথে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে এগুলোকে মনে না রেখে প্রতিবেশীর ছোট-খাটো ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে। কোনোভাবেই প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া যাবে না। যদি কোনো প্রতিবেশী বিরোধীও হয় তবুও তার প্রতি সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়া মহৎ কাজ। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্র কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহ্র কসম! সে

---

[৪৭৮] ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, ৩য় খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল আদব, বাবু হাক্কিল জাওয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلى جارِهِ

[৪৭৯] ইমাম তিরমিযী, *সহীহ আত্-তিরমিযী*, ২য় খণ্ড, (অনু:) কিতাবুল জানা'ইয, বাবু মাজা'আ ফী 'ইয়াদতিল মারিযি, হোসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা-২০১০, পৃ. ২৯৫
وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة".

লোক মু'মিন নয়, আল্লাহ্‌র কসম! সে লোক মু'মিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ কে সে লোক? তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।"[৪৮০]

সমাজে অমুসলিম প্রতিবেশীর প্রতিও অধিক মনোযোগী হতে হবে। যাতে তাদের কোনো কষ্ট না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিবেশীর সাথে ধর্মীয় কোনো সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক সে বিষয় বিবেচনায় না এনে সর্বাবস্থায় প্রতিবেশীর কল্যাণকামী হয়ে থাকতে হবে। মুসলিম প্রতিবেশী তার অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে সবসময় সদাচরণ করবে। কারণ ইসলামে কল্যাণকামিতার প্রভাব অনেক বেশি প্রসারিত।[৪৮১] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদের বাড়ি ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।"[৪৮২]

প্রতিবেশী মানুষের জীবনে অনেক প্রভাব বিস্তার করে। তাই সকল ক্ষেত্রে তাদের অধিকার রক্ষায় মনোযোগী হতে হবে। ইসলামের লক্ষ্যই হলো মানুষের মাঝে বিভাজন দূরীভূত করে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা ও তাদের মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় করা, যাতে করে মানুষ শ্রেণি বিভাজন ভুলে সুখে-দুঃখে এক অন্যের সহযোগী হতে পারে। দরিদ্র প্রতিবেশী যদি অভুক্ত থাকে তবে তাকে নিজেদের খাবার থেকে খাবার দেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এখান থেকে তোমারা খাও এবং দুঃস্থ অভাবীদের আহার করাও।"[৪৮৩] কোন প্রতিবেশী যদি অমুসলিমও হয়ে থাকে তবে তার বেলায়ও একই নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে। কারণ ইসলামই সর্বোত্তম মানবতার ধর্ম আর এটাই ইসলামের সৌন্দর্য।[৪৮৪]

---

৪৮০ ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৯ম খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল আদব, বাবু ইসমু মান লা ইয়া'মানু জারুহু বাওয়া'ইকাহু, ইউবিকুহুন্না ইহলিকুহুন্না মাউবিকান মাহলিকান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০

عن أَبي هريرة : أَن النَّبيَّ ﷺ قَالَ :"واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ ، قِيلَ: مَنْ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ :الَّذي لا يأْمنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ".

৪৮১ ড. মুহাম্মাদ আলী আল হাশেমী, *আদর্শ মুসলিম*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬০

৪৮২ আল কুর'আন, সূরা আল মুমতাহিনাহ্: ৮

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

৪৮৩ আল কুর'আন, সূরা আল হজ: ২৮

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

৪৮৪ ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিত আত্মীয়ের অধিকার

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। মানুষের জীবনকে আরো প্রাণবন্ত ও মায়াবী করে গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানবসমাজের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, যেখানে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে একটি পরিবার গড়ে উঠে। সেই পরিবারের উপর ভিত্তি করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্প্রসারিত হয়। সমাজব্যবস্থায় এক আত্মীয়ের সাথে অপর আত্মীয়ের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের মাঝে আত্মীয় সম্পর্কিত কিছু না কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য প্রত্যেকেরই আছে। সমাজ জীবনে মানুষের যত অধিকার ও কর্তব্য আছে, তার মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও কর্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চাও এবং রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দের সম্পর্কে সতর্ক হও।"[৪৮৫]

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে মানব বংশ বৃদ্ধির জন্য ও মানবসমাজে পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নারী-পুরুষের মাঝে বিয়ে বন্ধনের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই বিয়ে পদ্ধতি সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও মানুষের মাঝে মায়া-মমতা সৃষ্টির মাধ্যম। তাই বিয়ে মানবসমাজের জন্য আবশ্যিক একটি অধ্যায়। বিয়ের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মানুষের সাথে বন্ধন সৃষ্টি হয়। এতে একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে এই আত্মীয়তার পরিধি আরো বেড়ে যায় এবং যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলতে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহ্র দেয়া আত্মীয়তার এ পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তির বিধান রয়েছে। আত্মীয়গণের মাঝে একে অন্যের প্রতি সম্পর্ক রক্ষা করতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তিতে আবদ্ধ হয়। সেখানে ভালোবাসা, মায়া, মমতা, হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হয়। কারণ আত্মিক প্রশান্তি লাভের জন্য আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক সুমধুর করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে তা পরিপূর্ণভাবে পালন করার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়তার দুটি ধারা প্রবাহিত করেছেন। এক ধারা পিতার দিক থেকে ও অন্য ধারা মাতার দিক থেকে। দুটি ধারাই প্রত্যেকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার পরেই আত্মীয়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। আত্মীয়দের মাঝে একে অন্যের প্রতি অনেক অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়ের

---

[৪৮৫] আল কুর'আন, সূরা আন নিসা: ১

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে তাদের অধিকার প্রদানের জন্য বলেছেন। আর যারা এই কাজটি সঠিকভাবে করতে পারবে তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "হযরত সালমান বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মিসকীনকে দান করলে একটি সাদকা হয়, আর আত্মীয়দের দান করলে দু'টি সাদকা হয়।"[৪৮৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সর্বদা আত্মীয়তার হক আদায় করতেন, যখন প্রথম ওহী নাযিল হলো এবং তিনি ভয় পেয়ে বাড়িতে গিয়ে খাদীজা (রা.)-কে সব বললেন, তখন খাদীজা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আল্লাহ্‌র কসম। আল্লাহ্ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন এবং অসহায় দুঃস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানকে আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।"[৪৮৭] সেই নবীর উম্মত হিসেবে মুসলিমদের অবশ্যই আত্মীয়দের প্রয়োজনে সহায়তার হাতকে প্রসারিত করতে হবে। কারণ আত্মীয়দের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে আত্মীয়তার হক পালন করা হয় এবং তাদের অধিকার প্রদান করা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়বিচার কায়িম করতে, পরস্পরের প্রতি ইহসান করতে ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায় করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।"[৪৮৮]

আত্মীয়তার অধিকার আদায়ে সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার অবহেলা করা যাবে না। আত্মীয়ের অধিকার বলতে মূলত দরিদ্র আত্মীয়ের কথা বলা হয়েছে। কারণ ধনী আত্মীয়ের সাথে সবাই সম্পর্ক রক্ষা করতে চায়। কিন্তু দরিদ্র আত্মীয়ের সাথে মানুষ সম্পর্ক কম রাখতে আগ্রহী হয়। এজন্য ধনী আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রাখার সাথে সাথে দরিদ্র আত্মীয়দের সাথে বেশি করে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যারা দরিদ্র, অভাবী আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষার পরিবর্তে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হবে না, তাদের আমলও গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তারা কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, "যুবাইর ইবনে মুতয়ীম (রা.) বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে

---

[৪৮৬] মুহাম্মাদ বিন আহমদ আত্ তামীমী ইবনু হিব্বান, *আস্ সহীহ*, ৮ম খণ্ড, বাবু যিকবুল আন বায়ান বিআন্না আসদাকাতা, মুআস্সাসাহ আর রিসালাহ, বৈরুত-১৯৯৩, পৃ. ১৩৩

عن رسول الله: "الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان".

[৪৮৭] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ১ম খণ্ড, কিতাবুল অহী, বাব-কাইফা কানা বাদ'উল অহী ইলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, প্রাগুক্ত

فَقَالَتْ خَدِيجَةُ:" كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ."

[৪৮৮] আল কুর'আন, সূরা আন নাহ্‌ল: ৯০

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

না।"[৪৮৯] আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা রক্ষা করে।"[৪৯০]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মানুষকে সচেতন করেছেন। ইসলাম আগমনের প্রথম যুগে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় যখন ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন তখনও তিনি আত্মীয়তার হক আদায়ের ব্যাপারে মানুষদেরকে নির্দেশ দিতেন। এ সম্পর্কে একটি হাদীস, "ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সুফিয়ান (রা.) তাকে জানিয়েছেন যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে ডেকে পাঠায়। আবূ সুফিয়ান (রা.) বললো যে, তিনি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সালাত আদায় করতে, যাকাত দিতে, পবিত্র থাকতে এবং রক্তের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেন।"[৪৯১]

সচ্ছল আত্মীয়দের দায়িত্ব হলো তারা অভাবী ও দরিদ্র আত্মীয়দের প্রয়োজন পূরণ করা। যদি প্রয়োজন হয় তবে তাদের জন্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা।[৪৯২] প্রয়োজনে আত্মীয়ের জন্য কখনো কখনো ক্ষতি স্বীকার করতেও প্রস্তুত থাকা।[৪৯৩] এভাবে যদি আত্মীয়ের হক সঠিকভাবে আদায় করা হয় তবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "অতএব, আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটি উত্তম।"[৪৯৪] আত্মীয়দের সাহায্য করা আবশ্যিক কর্তব্য। ইসলাম ধনী আত্মীয়দের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে অভাবী, দরিদ্র ও বঞ্চিত আত্মীয়ের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে, যা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয় বরং এটি অবশ্যই পালনীয়। ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য বলেছে এবং সেই সাথে আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তুমি নিজেকে দিয়ে শুরু করো, নিজেকে দান করো, যদি কিছু বাঁচে তাহলে তা নিজ পরিবারের জন্য রাখো। তোমাদের পরিবারের চাহিদা

---

৪৮৯ ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু ইসমিল কাতি'ই, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮৫
هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يدخل الجنة قاطع رحم".

৪৯০ ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু ইকরামিদ দায়ফি ওয়া খিদমাতুহু ইয়্যাহু বি নাফসিহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০৬
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه".

৪৯১ ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ১ম খণ্ড, বাব-কায়ফা কানা বাদ'উল অহী ইলা রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৯ম খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল আদব, বাবু সিলাতিল ওয়ালিদিল মুশরিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫
عن ابن عباس رضي الله عنه، أن هرقل قال: (وَمَا يَأْمُرُكُمْ؛ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ) أي: أبو سفيان (يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ) المعهودةِ (وَالصَّدَقَةِ) المفروضة (وَالْعَفَافِ) والصلة.

৪৯২ ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৪৯৩ ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৪৯৪ আল কুর'আন, সূরা আর রূম: ৩৮
فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ

পূরণ হওয়ার পর যদি কিছু বাঁচে তাহলে তা তোমার আত্মীয়দের জন্য। তোমার আত্মীয়দের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর যদি কিছু বাঁচে তাহলে তা পর্যায়ক্রমে যে যত নিকটের তার জন্য।"[৪৯৫]

দরিদ্র আত্মীয়দেরকে মানুষ বোঝা হিসেবে মনে করে। এজন্য দরিদ্র আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা না করলে যেমন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে, ঠিক তেমনি সম্পর্ক রক্ষা করলে পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আয়ু ও রিযিক বৃদ্ধি করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে এই পুরস্কার দিবেন। এ ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য হাদীস: "আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে লোক তার রিযিক প্রশস্ত করতে এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে।"[৪৯৬] আয়ু ও রিযিক বৃদ্ধি ছাড়াও আত্মীয়তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করলে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, "আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: আমি আল্লাহ্ ও আমি রহমান। আমি রেহেম (আত্মীয়) সৃষ্টি করেছি। আমার নাম থেকেই এ রেহেম শব্দের উৎপত্তি ঘটিয়েছি। যে রেহেম (আত্মীয়) এর সাথে সম্পর্ক রাখবে আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবো। আর যে তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো।"[৪৯৭]

সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, এক পক্ষ সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী হলেও অন্যপক্ষ অনাগ্রহ প্রকাশ করে। তখন যে পক্ষ আত্মীয়তার হক রক্ষা করার ব্যাপারে অগ্রগণ্য হবে, সে পক্ষই সফল বলে বিবেচিত হবে। তারাই আল্লাহ্র নিকট অধিক ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস-

> *"আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলি, আর তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার*

---

[৪৯৫] আল বায়হাকী, *আস সুনান আল কুবরা*, ২য় খণ্ড, বাবুল মুদাব্বির ইয়াজুযু বাই'উহু, মাকতাবতু দারিল মা'আরিফ আন নিযামিয়্যাহ..., (প্রথম প্রকাশ), হায়দ্রাবাদ- ১৩৪৪ হি., পৃ. ৩৩৮

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيئ فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيئ فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا و هكذا.

[৪৯৬] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ২য় খণ্ড, কিতাবুল আদব, বাবু মান বুসিতা লাহু ফির রিযক বিসিনাতির রেহম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أحب أن يبسط له في رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه)

[৪৯৭] ইমাম তিরমিযী, *সহীহ আত্-তিরমিযী*, ৩য় খণ্ড, কিতাব আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলা..., বাবু মাজা' ফী কাতী'আতির রাহিম, দারুল ফিক্র লিততাবা' ওয়াননশ্র, তা.বি., পৃ. ২১১

عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : قال الله تبارك وتعالى : أنا الله وأنا الرحمن ، خلقت الرَّحِم ، وشققت لها من اسمي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها بتَتُّ.

করি, কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি সহিষ্ণুতার সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেই, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খের মতো ব্যবহার করে। (এখন আমি কী করবো?) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি ঘটনা এমনই হয়ে থাকে যা তুমি বলেছো, তাহলে তুমি যেন তাদের উপর উত্তপ্ত ছাই নিক্ষেপ করছো (অর্থাৎ তোমার ধৈর্যের আগুনে তাদেরকে শেষ করে দিবে)। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার সাথে তাদের বিরুদ্ধে একজন সহায্যকারী (ফেরেশতা) মওজুদ থাকবে যতদিন তুমি ঐ ধরনের আচরণ করবে।"[৪৯৮]

সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অভাবী, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের মাঝে দান-সাদকাহ্ করে থাকেন। যদি উক্ত দানকারী ব্যক্তির কোনো আত্মীয় অভাবী হয় বা দান-সাদকাহ্ নেয়ার উপযুক্ত হয়, তবে সেই দান-সাদকাহ্ অবশ্যই উক্ত দরিদ্র আত্মীয়দেরকে দিতে হবে এবং এটিই উত্তম। এ প্রসঙ্গে এক হাদীস, "মাইমুনাহ বিনতে হারিস (রা.) বর্ণিত। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় তাঁর অনুমতি ছাড়াই এক দাসীকে মুক্ত করে দেন। অতঃপর একদা সুযোগমত তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমি আমার দাসীটি মুক্ত করে দিয়েছি। তিনি বলেন অথবা জিজ্ঞেস করলেন- তা করেছ? জবাবে ময়মুনা বললেন-হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তুমি যদি দাসীটি তোমার মামাদের দান করতে, তবে অনেক বেশি সাওয়াব পেতে।"[৪৯৯] অভাবী, দরিদ্র ও বঞ্চিত আত্মীয়দের মাঝে বেশি বেশি দান করার ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, "কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সাদকার সওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো দরিদ্র নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করলে সাদ্‌কা এবং আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পুণ্য অর্জন করা যায়।"[৫০০] তাই সকল অবস্থায় আত্মীয়তার হক আদায় করতে হবে। বিশেষ করে দরিদ্র আত্মীয়রা নিজেদের মাঝে হীনম্মন্যতায় থাকেন। তারা নিজেদেরকে শত অভাব অনাটনের মধ্যেও গুটিয়ে রাখেন। কারণ তাদের জন্য তাদের সম্পদশালী বা প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়দের সম্মানহানি হোক এটা তারা চায় না। এজন্য সম্পদশালী

---

[৪৯৮] ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, কিতাবুল বিররি অসসিলাতি ওয়াল আদাবি, বাবু সিলাতির রাহিম ওয়া তাহরিমি কাতিয়াতিহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৪

وعن أبي هريرة : أَنَّ رجلًا قَالَ: يَا رَسُول اللَّه، إِنَّ لِي قَرابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوني، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِم وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وأَحْلُمُ عنهُمْ وَيَجْهَلُونَ علَيَّ، فَقَالَ " :لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ، وَلا يَزَالُ معكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذلكَ ".

[৪৯৯] ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফযলুন নাফকাতি ওয়াস সাদাকাতি আলাল আকরাবিনা ওয়াযযাওজি ওয়াল আওলাদি ওয়াল অলিদাইনে অলাউ কানু মুশরকীনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته: أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، "قال أو فعلت"؟ قالت: نعم، قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".

[৫০০] আন নাসাঈ, *আস্ সুনান আল কুবরা*, ৫ম খণ্ড, কিতাবুয যাকাহ, বাব আস সাদাকাতু 'আলাল আক্বারিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان".

আত্মীয়দের উচিত দরিদ্র আত্মীয়দের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করা। যদি তা করা হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা করে দিবেন।

ইসলাম সর্বদা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে উৎসাহ প্রদান করে। তাদের সাথে কখনো ঝগড়া-ফাসাদ করতে নিষেধ করে। তাই আত্মীয়দের কোনো প্রকার কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এমনকি কোনো আত্মীয় যদি কষ্ট দেয়ও তবুও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যদি কোনো আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং দুর্ব্যবহার করে, তা হলেও উক্ত আত্মীয়ের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস, "আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) ইবন আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়, বরং আত্মীয়তার হক আদায়কারী সে ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও তা বজায় রাখে।"[৫০১] কোনো আত্মীয় অত্যাচারী হলে তাকে বাধা দিতে হবে। কেননা, যারা সদ্ভাব বজায় রাখে তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা স্বাভাবিক কিন্তু যারা কষ্ট দেয় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যেই প্রকৃত কৃতিত্ব।

ইসলাম আত্মীয়দের দরিদ্রতা, অভাবের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষার জন্য তাদের সামর্থ্যবান আত্মীয়দের সম্পদে তাদের অধিকার রেখেছেন। ইসলাম পরিবারের প্রতি গুরুত্বারোপ করার সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজনের অধিকারকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। সকল অবস্থায় আত্মীয়তার হক আদায় করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "আত্মীয়-স্বজনকে তার হক পরিশোধ কর। মিসকীন ও বিপদগ্রস্ত পথিককে দান কর এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না।"[৫০২] আত্মীয়রা একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাব নিয়ে বসবাস করবে। যাতে করে একে অন্যের যেকোনো প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াতে পারে।[৫০৩] কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধানে একে অন্যের চেয়ে অধিক হকদার।"[৫০৪] আল্লাহ্ তা'আলা অভাবী ও দরিদ্র আত্মীয়দের মাঝে অর্থ-সম্পদ দানের নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ আরো বলেন, "আল্লাহ্ ন্যায়বিচারের ও নিকট আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দেন।"[৫০৫] তাই সকলকেই অভাবী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। কমপক্ষে তাদের সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

---

[৫০১] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৯ম খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল আদব, বাবু লাইসাল ওয়াছিলু বিলমুকাফি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".

[৫০২] আল কুর'আন, সূরা বনী ইসরাঈল: ২৬

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

[৫০৩] ড. ইউসুফ আল-কারদাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

[৫০৪] আল কুর'আন, সূরা আল আনফাল: ৭৫

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

[৫০৫] আল কুর'আন, সূরা আন নাহ্ল: ৯০

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

নবম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের জ্ঞান অর্জনের অধিকার

আল্লাহ্ তা'আলা জগতের সকল জ্ঞানের উৎস। তাঁর দেয়া জ্ঞান থেকে মানবজাতি আলোর দিশা পায়। জ্ঞান অর্জন ব্যতীত কোনো মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। আবার জ্ঞানের আলোয় নিজেকে আলোকিত না করলে সমগ্র জীবন অন্ধকারে পড়ে থাকতে হয়; নিজকে চেনা ও জগৎকে জানা সম্ভব নয়। বুঝতে পারে না তার দায়িত্ব-কর্তব্য এবং জানতে পারে না দীন, দুনিয়া কিছুই। এমনকি মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়ও ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারে না। জ্ঞান অর্জন করতে পড়ালেখা করার প্রয়োজন হয়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনের সর্বপ্রথম যে অংশ নাযিল করেন তা পড়ার নির্দেশ দিয়েই শুরু করেছেন। সেই সাথে আল্লাহ্ তা'আলা জন্মের প্রকৃত উৎস উন্মোচন করে মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়, তোমার পালনকর্তা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।"[৫০৬]

জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। কোনো মানুষ পর্যাপ্ত জ্ঞান ছাড়া সঠিক পন্থায় নিজেকে পরিচালিত করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত জীবনবিধানকে সঠিকভাবে জানতে, মেনে চলতে এবং অন্য মানুষের কাছে তা সঠিকভাবে পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান আবশ্যক। কারণ মানুষ যখন প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় তখন তার থেকে সকল অন্ধকার, অকল্যাণ দূর হয়ে কল্যাণকর মানুষে পরিণত হয়। এজন্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। নবী-রাসূলগণ মানুষদেরকে আল্লাহ্র দেয়া জ্ঞান থেকে শিক্ষা প্রদান করতেন। তাঁরা মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "যেমন আমি তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছি। তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শোনায়। তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে। তোমাদের কিতাব শিক্ষা দেয়, কর্মকৌশল শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা কিছু জানতে না তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়।"[৫০৭]

জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ্ সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করলে আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ব আরো বেশি প্রকাশিত হয়। তখন আল্লাহ্র আনুগত্যে মানুষ বেশি করে নত হয়। এজন্য কুর'আন নিয়ে গবেষণা করা আবশ্যক, আর গবেষণা করতে হলে পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন। অন্যদিকে

---

[৫০৬] আল কুর'আন, সূরা আল 'আলাক: ১-৫
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْوَرَبُّكَالْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

[৫০৭] আল কুর'আন, সূরা আল বাকারাহ্: ১৫১
كما أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

যারা কুর'আন নিয়ে গবেষণা করে না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন, "তারা কি কুর'আন নিয়ে গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহ তালা লাগানো রয়েছে?"[৫০৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমার উপর বরকতময় এক কিতাব নাযিল করেছি, যেন তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে।"[৫০৯] আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানার্জন করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে তারা দীনের জ্ঞান লাভ করে।"[৫১০] এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নর-নারী, ধনী-গরিব ও শিশু-বয়স্ক সকল মানবকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এজন্য প্রত্যেক মানুষের জ্ঞানার্জন করা অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে জ্ঞানহীন ব্যক্তির সাথে তুলনা করে বলেন, "বল! যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?"[৫১১]

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের পরিচয় পবিত্র কুর'আনে দিয়েছেন। পুরুষের শুক্রাণু থেকে মায়ের পেটে কীভাবে ধীরে ধীরে রক্তপিণ্ড এবং রক্তপিণ্ড থকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তারিত হয়, তার বিবরণও দিয়েছেন। মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আল্লাহ্র তা'আলা মানুষের অস্তিত্ব দান করেছেন। সে কিছুই জানতো না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান অর্জন করার শক্তি দিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছিলেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে শুনবার শক্তি দিয়েছেন, দৃষ্টি দিয়েছেন আর দিয়েছেন হৃদয়, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[৫১২]

বাস্তবতার কারণে সমাজে সকলেই জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। দরিদ্রতার কারণে অনেক মানবসন্তান শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। তাই ইসলাম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জ্ঞানার্জনের পরিবেশ সৃষ্টি করে শিক্ষা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। জ্ঞানার্জন করা যে সৃষ্টিগত অধিকার, তাতে কেউ কোনো অবস্থায় হস্তক্ষেপ করার অধিকারী নয় সে কথারও ইংগিত দিয়েছে। অতএব, সামর্থ্যবান সকলের উচিত সকল শ্রেণি পেশার মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো পৌঁছানোর জন্য সঠিক কর্মপন্থা প্রদান করা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সবথেকে বেশি। শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত যেহেতু একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না সেহেতু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার

---

[৫০৮] আল কুর'আন, সূরা মুহাম্মাদ: ২৪

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

[৫০৯] আল কুর'আন, সূরা সোয়াদ: ২৯

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

[৫১০] আল কুর'আন, সূরা আত তাওবা: ১২২

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

[৫১১] আল কুর'আন, সূরা আয যুমার: ৯

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

[৫১২] আল কুর'আন, সূরা আন নাহ্ল: ৭৮

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আল্লাহ্ তা'আলাকে জানবার জন্য এবং তার ইবাদাত করার জন্য শিক্ষা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য দরিদ্র, অভাবী ও সুবিধাবঞ্চিতদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশ্ব যখন শিক্ষার অভাবে কুসংস্কার আর অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্য জ্ঞান চর্চাকে মানবজাতির জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছিলেন। জ্ঞান ছাড়া ব্যক্তি পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত হয় না। তাই মানুষের মাঝে পূর্ণতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের জন্য শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। জ্ঞান ছাড়া মানুষ তার জীবনের কোনো কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না। এজন্য মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জ্ঞানার্জন করা। জ্ঞানার্জনের জন্য জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন হয় এবং সেক্ষেত্রে একজন শিক্ষক অতীব প্রয়োজন। জ্ঞানের আলোয় পৃথিবীকে আলোকিত করার শিক্ষক ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ঘোষণা করেন, "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"[৫১৩] আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং মহান আল্লাহ্ তা'আলা। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলিমের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করাকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "জ্ঞানন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।"[৫১৪]

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আদেশ পেলেন, তখন তিনি জ্ঞানের আলো সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি সক্রিয় পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি শিক্ষা প্রদানের জন্য সর্বপ্রথম শিক্ষকেন্দ্র (আসহাবে সুফফা) প্রতিষ্ঠা করে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুই শিক্ষা দিতেন। সেখানে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য শিক্ষা গ্রহণ উন্মুক্ত ছিল। তিনি সেখানে ধনী, দরিদ্র সকলকে এক সাথে শিক্ষা দিতেন। এছাড়াও মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সার্বক্ষণিক শিক্ষক। তিনি যখন যেখানে থাকতেন সেখানেই তাঁর অনুসারীরা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

---

[৫১৩] ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, ১ম খণ্ড, (অনু: ইফাবা), বাবু ফাদলিল উলামা ওয়াল হাচ্ছি 'আলা তলাবিল 'ইল্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি. পৃ. ১২২

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إنمابعثت معلما.

[৫১৪] ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" طلب العلم فريضة على كل مسلم".

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-এর কার্যক্রম

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠান

প্রথম অনুচ্ছেদঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ সমাজসেবা অধিদপ্তর

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

সপ্তম অনুচ্ছেদঃ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে নিয়োজিত এনজিও ও অন্যান্য সংস্থার তদারকি প্রতিষ্ঠান

প্রথম অনুচ্ছেদঃ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলারিটি অথরিটি

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে কর্মরত উল্লেখযোগ্য এনজিও

প্রথম অনুচ্ছেদঃ বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভ্যান্স কমিটি (ব্র্যাক)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ এ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভ্যান্সমেন্ট (আশা)

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ প্রশিকা

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান

প্রথম অনুচ্ছেদঃ সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও বেকারদের উন্নয়নে ব্যাংক

প্রথম অনুচ্ছেদঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কৃষি প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণভিত্তিক ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প

প্রথম অনুচ্ছেদঃ গ্রামীণ ব্যাংক

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ইসলামী ব্যাংক

সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নে বহুকাল আগে থেকেই এদেশে বেসরকারিভাবে স্বেচ্ছাসেবীদের বিভিন্ন কার্যক্রম চলে আসছিল, যার ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশপূর্ব মুসলিম শাসন আমলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাকাত, ওয়াক্ফ, দান ও অনুদানসহ বিভিন্ন আর্থিক সাহায্য দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে এসেছে। পরবর্তীতে হাজী মুহাম্মাদ মহসীনের দানে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেখানে পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেত। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তুলেছিলেন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রখ্যাত আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তার অর্থায়নে তৈরি একটি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশরা শাসন ক্ষমতা দখল করলে মুসলিমরা সকল দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায়ও কিছু সামর্থ্যবান তাদের যাকাত, ওয়াক্ফ, দান ও অনুদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। এছাড়াও ব্রিটিশ আমল থেকে কিছু খ্রিস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান ও মুসলিম ওয়াক্ফ ট্রাস্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। যার ধারাবাহিকতায় এখনও এদেশে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অনেক দেশি ও বিদেশি বেসরকারি সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

সময়ের ধারাবাহিকতায় বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থার পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার বার্ষিক হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সূচারুরূপে সম্পাদনের প্রয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা ও তদারকির জন্য দু'টি তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে, যা এদেশে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধানে সদা তৎপর রয়েছে। তদারকি প্রতিষ্ঠান দুটি হলো: এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলারেটি অথরিটি। নিম্নে সুবিধাবঞ্চিতদের কল্যাণে নিয়োজিত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হলো–

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে সরকারি প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সার্বিক কল্যাণ করা, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রাণালয়, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। যারা দেশের শহর থেকে শুরু করে গ্রামীণ প্রান্তিক ও

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। এর ধারাবহিকতায় সরকারের যে সমস্ত মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো–

প্রথম অনুচ্ছেদঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সার্বিক কল্যাণ করা, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সুবিধাবঞ্চিত, দুঃস্থ, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, এতিম, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয়ের রয়েছে ব্যাপক বহুমুখী কর্মসূচি।[৫১৫] ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় ১৯৪৩ সালে কিছু এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মূলত এদেশে সরকারিভাবে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিমরা এদেশে শরণার্থী হিসেবে আগমন করে। এর ফলে তৎকালীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকাতে বহু বস্তি গড়ে উঠলে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ কমিটি দুই বছরব্যাপী এখানে গবেষণা পরিচালনা করে। এই গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষিত সমাজকর্মীদের নিয়োজিত করে ১৯৫৫ সালে Dhaka Urban Development Board গঠন করে। সংগঠনের কর্মপরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রথম ঢাকায় Urban Community Development Project (UCDP) (শহর সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম) শুরু করা হয়।[৫১৬] পাশাপাশি বিদ্যমান এ সামাজিক সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ও সংগঠনকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি সরকারি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করা হয়। এরপর ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম, ১৯৬১ সালে সংশোধনমূলক কার্যক্রম এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম, ১৯৬৯ সালে স্কুল সমাজকর্ম চালু করা হয়। (যদিও স্কুল সমাজকর্ম প্রকল্পটি ১৯৮৩ সালে বিলুপ্ত করা হয়।) এ সকল সমাজসেবামূলক কার্যক্রমগুলোকে একটি নিময়-নীতির আওতায় নিয়ে আসার জন্য ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদের অধীনে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমসমূহকে এ পরিদপ্তরের অধীনে স্থানান্তর করা হয়।[৫১৭]

---

[৫১৫] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ সেবা কার্যক্রম*, রোহেল পাবলিকেশনস্, চতুর্থ প্রকাশ, ঢাকা-২০০৮, পৃ. ৭

[৫১৬] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ সেবা কার্যক্রম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[৫১৭] প্রাগুক্ত

এরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে ঐ সময়ে দেশের বাস্তব অবস্থার উপযোগী করে 'শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়' নামে এই মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি ১৯৭৩ সালে নতুন এক রেজল্যুশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' গঠন করা হয়। সদ্য স্বাধীন দেশের সামাজিক সমস্যার টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে 'শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়'-এর অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরকে সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত করা হয় এবং একই বছর হাতে নেয়া পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় সর্বপ্রথম ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদপ্তর' নামে নামকরণ করা হয়।[৫১৮] এ সকল ঘটনা প্রবাহে ১৯৮৯ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে একটি একক ও পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে গঠন করা হয়।

১৯৮৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্র প্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান বাংলাদেশের সমাজকল্যাণে সহায়তার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। সেই প্রদানকৃত অর্থায়নে গঠিত হয় 'শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)', যা পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দ্যা সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট, ১৮৬০ এর আওতায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয়। এরপর ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে দেশের প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের জন্য সরকার ১৯৯০ সলে শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে। পরবর্তীতে এই ট্রাস্টের কাছে মৈত্রী শিল্প কারখানা হস্তান্তর করা হয়। এছাড়াও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন করে এর আওতায় ২০১৪ সালে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়।[৫১৯]

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম জাতি গঠনমূলক মন্ত্রণালয় হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সমাজসেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করছে।

---

[৫১৮] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ সেবা কার্যক্রম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[৫১৯] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, প্রকাশনায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-২০১৮, পৃ. ৩-৪

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন

- উন্নত জীবন ও যত্নশীল সমাজ।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মিশন

- সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি সাধন।[৫২০]

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরণ;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য নিশ্চিতকরণ।
- সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও পুনঃএকত্রীকরণ;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম

- সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত আইন, নীতি বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সকল প্রকার দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়ন;
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষায় প্রতিপালন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
- ভবঘুরে, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন, অবেক্ষণ (প্রবেশন) এবং অন্যান্য আফটার কেয়ার সর্ভিস বাস্তবায়ন;
- টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন ও সহায়তা প্রদান।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহ

- সমাজসেবা অধিদপ্তর;
- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
- শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট;
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন;
- শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট;
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট।[৫২১]

---

[৫২০] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৫২১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ সমাজসেবা অধিদপ্তর

বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে যেসব প্রতিষ্ঠান সুবিধাবঞ্চিত ও সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে তাদের মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর অন্যতম। এ অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধান, প্রতিরোধ ও নিরাময় করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এখানে উল্লেখ্য যে, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশের বেশি লোক সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিড়ে পড়া শ্রেণি। সমাজসেবা অধিদপ্তর সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানসহ আধুনিক সেবা প্রদান করার মাধ্যমে তাদের অধিকার সুরক্ষা করে দারিদ্র্যবিমোচন ও উন্নয়নে সহায়তা করাসহ বিভিন্ন কল্যাণকর কর্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অনেকগুলো প্রশাসনিক কার্যালয় রয়েছে। এ কার্যালয়গুলো সদর, জেলা, উপজেলা, শহর ইত্যাদি ইউনিটে বিভক্ত। এগুলো সদর কার্যালয়সহ ৬৪টি জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, তেজগাঁও সার্কেল, দেশের সকল উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং সকল প্রাতিষ্ঠানিক কার্যালয়ে সুবিস্তৃত।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ইউনিট[৫২২]

ক্রমিক	প্রশাসনিক ইউনিটের নাম	সংখ্যা
১.	সমাজসেবা অধিদপ্তর, সদর ইউনিট	১
২.	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি	১
৩.	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬
৪.	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৪৮৮
৫.	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৮০
৬.	শহর সমাজসেবা কার্যালয়	৯৯

[৫২২] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৭.	চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যালয়	৭০
৮.	প্রবেশন অফিসারের কার্যালয়	২১১
৯.	প্রতিষ্ঠান	১০২০

সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:-

১. লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মদক্ষতা অর্জনসহ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান;
২. দুঃস্থ, অসহায়, এতিম, ভবঘুরে, অপরাধপ্রবণ শিশু, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নীত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ;
৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথা হিজড়া, দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন করে সমাজ উন্নয়নের মূল স্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণ;
৪. লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মদক্ষ করে গড়ে তুলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ;
৫. ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত দরিদ্র হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
৬. চা-শ্রমিকদের বছরের বিশেষ সময়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান;
৭. হাসপাতালে আগত দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা ও সেবা প্রদান;
৮. সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ করা;
৯. সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ, সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং সংস্থাসমূহকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমন্বয়করণ।[৫২৩]

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিসমূহ

সমাজসেবা অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন, চিকিৎসা সেবা প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা প্রদান। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠান সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- **দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি**

দারিদ্র্য বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়। তাই সমাজসেবা অধিদপ্তর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

[৫২৩] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

- **পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমঃ** দেশের অশিক্ষা, কুসংস্কার, বেকারত্ব, ভূমিহীনতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যা জর্জরিত পল্লী এলাকায় বসবাসরত অসহায়, অবহেলিত পশ্চাৎপদ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি পরিবারকে ৫০০০.০০ টাকা থেকে ৩০০০০.০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।
- **শহর সমাজসেবা কার্যক্রমঃ** এ প্রকল্পের কার্যক্রমটি সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত একটি আদি কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় শহরের বস্তি এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের ভাসমান পরিবারের সদস্যদের সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে বাস্তবধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনদের মধ্যে থেকে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত, ছিন্নমূল এ জনগোষ্ঠী শহরের বিভিন্ন স্থানে, আনাচে-কানাচে, ড্রেনের পার্শ্বে, পরিত্যক্ত অস্বাস্থ্যকর ডোবা বা জলাভূমির ধারে জীর্ণ কুটির তৈরি করে বস্তি গড়ে তুলে সেখানে বসবাস করে। এসব কারণে তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতার লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে।[৫২৪]
- **পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রমঃ** ১৯৭৫ সালে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক জনসংখ্যা কার্যক্রমে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্প চালু করা হয়।
- **দগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রমঃ** সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করে উপার্জনমুখী কাজে পুঁজি ও সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা এ প্রকল্পের কাজ। এছাড়াও তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- **আশ্রয়ণ প্রকল্পঃ** আশ্রয়ণ প্রকল্পটি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০০১ সাল হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত ও অভাবী জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করা হয়।[৫২৫]

---

[৫২৪] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[৫২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯

- **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি**

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের পশ্চাৎপদ সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় এনে দারিদ্র্যসীমার হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা। সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি নিম্নে দেয়া হলো:

  - **বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম:** এ কার্যক্রমের আওতায় বয়স্ক ভাতাভোগীদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ভাতার অর্থ গ্রহণের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা মনিটর সেল গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা নীতিমালা যুগোপযোগী করার মাধ্যমে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দ বৃদ্ধির কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে।
  - **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা:** এ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য এবং এর কার্যক্রম সহজ করার জন্য বর্তমানে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ গ্রহণের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটর করার জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা সেল গঠন করা হয়েছে।
  - **অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা:** এই কর্মসূচিতে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ গ্রহণের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা মনিটর সেল গঠন করা হয়েছে। ভাতাভোগীদের মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকা হতে ৩৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
  - **প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি:** প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তিভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। উপবৃত্তির হার: প্রাথমিক স্তর- ৩০০.০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তর- ৪৫০.০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর- ৬০০.০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তর- ১০০০.০০ টাকা। নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব হতে চেকের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ পরিশোধ করা হয়। ভাতা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সদর কার্যালয়ে ভাতা (মনিটর) সেল গঠন করা হয়েছে। [৫২৬]

- **শিশু-কিশোর উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম**

  - **দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:** দুঃস্থ শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য ৩টি কেন্দ্রে মোট ৭৫০টি আসন রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০.০০ টাকা। এখানে শিশুরা নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে সামাজিক অধিকার নিয়ে জীবন গঠনের সুযোগ পাচ্ছে। পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করায় শিশু অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

[৫২৬] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

- **ছোটমনি নিবাস (০-৭ বছর পর্যন্ত):** ৬ বিভাগে ৬টি ছোটমণি নিবাসে ৬০০টি আসন রয়েছে। এখানকার নিবাসীদের জন্য মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০.০০ টাকা।
- **সরকারি শিশু পরিবার:** এ পর্যন্ত মোট ৮৫টি (ছেলেদের জন্য ৪৩টি, মেয়েদের জন্য ৪১টি এবং মিশ্র ১টি) সরকারি শিশু পরিবার রয়েছে, যার আসনসংখ্যা মোট ১০,৩০০টি। এখানে এতিম ও দুঃস্থ শিশুরা শিক্ষা, ভরণ-পোষণ ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে এবং সুশৃঙ্খল জীবন গঠনে আগ্রহী হয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করার সুযোগ পায়। এখানে মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২,০০০.০০ টাকা। এখানকার এতিমদের বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পুনর্বাসন করার চেষ্টা করা হয়।
- **বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট:** ক্যাপিটেশন গ্রান্ট (মাথাপিছু অনুদান) প্রাপ্তির মাধ্যমে ৩,৪৩৯টি নিবন্ধকৃত বেসরকারি এতিম খানায় ৫৯,৩৭৯ জন নিবাসীকে ৬৩ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হচ্ছে। এখনকার নিবাসীদের জন্য মাসিক মাথাপিছু ১,০০০.০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাকে উৎসাহিত ও সহায়তা করা হচ্ছে।
- **দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র:** দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্রে (আজিমপুর, ঢাকা) ৫০টি আসন রয়েছে। এখানে শিশুরা নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে সামাজিক অধিকার নিয়ে জীবন গড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

- **প্রতিবন্ধী উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম**
  - **সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়:** ৫টি সরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ৩৪০টি আসন রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০.০০ টাকা।
  - **সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম:** ৬৪ জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রে ৬৪০টি আসন রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০.০০ টাকা। এখানকার নিবাসীরা কেন্দ্রের পরিচর্চায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদের অধিকার রক্ষা ও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।
  - **মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান:** চট্টগ্রামের রাউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের এ প্রতিষ্ঠানে ৫০টি আসনের মধ্যে ৬৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ২০০০.০০ টাকা।[৫২৭]

[৫২৭] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *সমাজকল্যণ মন্ত্রণালয়: পাঁচ বছরের সাফল্য চিত্র (২০০৯-২০১৩)*, প্রকাশনায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-২০১৪, পৃ. ৫-৮

- **সেবামূলক কার্যক্রম**
    - **হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম:** সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও আর্ত-পীড়িতের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বপ্রথম ১৯৫৮ সালে পূর্ব-পাকিস্তান ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এর উদ্যোগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২ জন চিকিৎসা সমাজকর্মী নিয়োগ করার মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রমটি চালু করা হয়। স্বাধীনতা পবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে এ প্রকল্পটি ৬৪টি জেলায় চালু করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় রাজস্ব ও অস্থায়ী রাজস্ব খাতে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্সে রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন করা হয়। এই কার্যক্রম সফলতার সাথে চলমান রয়েছে। বর্তমানে এ কর্মসূচির সংখ্যা ৫১৮টি।

কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থান

বিভাগীয় শহরে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ, জেলা সদর হাসপাতালসমূহ ও ৫১৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিম্নবর্ণিত বেসরকারি হাসপাতাল:

১) বাংলাদেশ ডায়াবেটিক হাসপাতাল (বারডেম), শাহবাগ, ঢাকা;
২) ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, ফার্মগেইট, ঢাকা;
৩) ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শ্যামলী, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা;
৪) বাংলাদেশ চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাহাড়তলী, চট্রগ্রাম;
৫) ডা: এম আর খান শিশু হাসপাতাল এন্ড ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্থ, মিরপুর, ঢাকা;
৬) ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল, মগবাজার, ঢাকা;
৭) ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা;
৮) বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ধানমন্ডি, ঢাকা;
৯) হলি ফ্যামিলী রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

এ প্রকল্পের রূপকল্প (Vision)

রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা এবং হাসপাতালে আগত ও চিকিৎসারত দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ রোগীদের পরিপূর্ণ ও কার্যকর চিকিৎসা সেবা দিয়ে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে কর্মক্ষম করে তুলে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করাই হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য/লক্ষ্য (Mission)

ক) রোগীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে সহায়তা করা;

খ) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধসহ প্রয়োজনীয় সকল কিছু প্রদান করা হয়। এছাড়াও মৃত ব্যক্তির লাশ পরিবহন ও সৎকার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়;

গ) হাসপাতালে পরিত্যক্ত, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু, নারী ও প্রবীণদের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসন করা হয় অথবা সমাজসেবা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে পুনর্বাসনে সহায়তা করা।[৫২৮]

কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) হাসপাতালে আগত রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদানে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান।

খ) দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য ও সমাজে পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ।

গ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞান দান।

ঘ) দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ রোগীদের প্রয়োজনে আর্থিক ও বস্তুগত সাহায্য প্রদান।

ঙ) সমাজকর্মে নিয়োজিত অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

চ) চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীদের ফলোআপ করা।

ছ) দরিদ্র রোগীদের রক্তের প্রয়োজন হলে সমিতির তহবিল হতে রক্তের ব্যবস্থা করা এবং ব্লাড ব্যাংক হতে রোগীদের বিনামূল্যে রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

জ) কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করা।[৫২৯]

- **রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত কর্মসূচি**

সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রান্তিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিতকরণ ও তাদের জন্য পরিচালিত সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সেবা প্রাপ্তি সহজ করার জন্য জরিপ, ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন এবং দরিদ্রদের ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস রোগীদের আর্থিক সহায়তা ও চা-শ্রমিকদের বিপৎকালীন খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

---

[৫২৮] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[৫২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

- **হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিঃ** হিজড়া সম্প্রদায় সমাজের মূল স্রোত থেকে ভিন্ন এক অনগ্রসর অতি ক্ষুদ্র অংশ। এদেরকে সকল ক্ষেত্রে অধিকার প্রদান করা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সহযোগিতা দিয়ে তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা অতীব জরুরি। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার।[৫৩০] এর মধ্যে স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য ৪ স্তরে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। প্রথমিক স্তরে মাসিক বৃত্তি ৩০০.০০, মাধ্যমিক স্তরে মাসিক ৪৫০.০০, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬০০.০০, উচ্চতর স্তরে মাসিক ১,০০০.০০ টাকা। এছাড়াও ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়েসের অক্ষম ও অসচ্ছল হিজড়াদের বয়স্ক ভাতা/বিশেষ মাসিক ভাতা ৬০০.০০ করে প্রদান করা হচ্ছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হিজড়াদের যোগ্য করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। এছাড়া হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ করা প্রার্থীকে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- **বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিঃ** বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপমতে, বাংলাদেশে দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৬৩ লক্ষ ৭১ হাজার ১০০ জন। এদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বেদে ও অনগ্রসর স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রথমিক স্তরে মাসিক বৃত্তি ৩০০.০০, মাধ্যমিক স্তরে মাসিক ৪৫০.০০, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬০০.০০, উচ্চতর স্তরে মাসিক ১,০০০.০০ টাকা। এছাড়াও ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়েসের অক্ষম ও অসচ্ছল বেদে ও অনগ্রসরদের বয়স্ক ভাতা/বিশেষ মাসিক ভাতা ৫০০.০০ করে প্রদান করা হয়।
- **ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানঃ** ২০১০ সালের আগস্ট মাস থেকে দেশে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের দারিদ্র্য নিরসনে এবং এ অমর্যাদাকর পেশা থেকে বিরত রাখার জন্য 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর আবাসন, ভরণপোষণ এবং বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সহায়তা প্রদান করা। ২০১১ সালে ঢাকা মহানগরের ১০ জোনে ১০টি এনজিও এর মাধ্যমে এক দিনে প্রায়

[৫৩০] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১০ হাজার ভিক্ষুকের উপর জরিপ পরিচালনা করে এর তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করার ভিত্তিতে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।[৫৩১]

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- **মহিলাদের আর্থ সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ** মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এবং তাদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার জন্য ১৯৭৩ সালে ঢাকার মিরপুরে ও রংপুরের শালবনে দু'টি আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়।
- **দুঃস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্রঃ** গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়াস্থ বাস্তুহারা পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন ও ভূমিহীন বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ জন দুঃস্থ বেকার মহিলাকে সংগঠিত করে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়।[৫৩২]

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে এবং এ কার্যক্রমে অন্যদের উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতাসহ অন্যান্য সহযোগিতা করতে সমাজকল্যাণ পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই প্রতিষ্ঠানটি পাকিস্তান শাসন আমলে National Council of Social Welfare এবং East Pakistan Social Welfare Council নামে কার্যক্রম পরিচালনা করতো এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তা নাম পরিবর্তন করে Bangladesh National Social Welfare Council নামে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৫৩৩]

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গার ফলে ভারত থেকে নির্যাতিত মুসলিমরা জীবন রক্ষার জন্য ঢাকা শহরে চলে আসে।[৫৩৪] এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালের ২ জানুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করে। পূর্ব-পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদই স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ

---

[৫৩১] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫০

[৫৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[৫৩৩] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ সেবা কার্যক্রম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

[৫৩৪] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *স্বেচ্ছাসেবিতা ও বাংলাদেশের এনজিও*, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স (পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ), ঢাকা-২০১৮, পৃ. ৭৯

করে।[৫৩৫] এ পরিষদ সমাজের অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, অসহায় ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে। আর উন্নত, যত্নশীল ও নিরাপদ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণে কর্মসূচি গ্রহণ ও প্রকল্প প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে। এছাড়াও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানসহ তাদের স্বীকৃতি প্রদান করে। এক্ষেত্রে তারা সামাজিক সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের উপায় নির্ধারণে গবেষণা পরিচালনা করে।[৫৩৬]

এ পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) লক্ষ্য

- যত্নশীল নিরাপদ ও উন্নত সমাজ গঠন।

খ) উদ্দেশ্য

- সমাজকল্যাণমূলক নীতি নির্ধারণে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যার কারণ এবং প্রতিকারের উপায় নিরূপণে গবেষণা পরিচালনা ও গবেষণায় সহায়তা প্রদান এবং নতুন ধারণা, উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন;
- সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক, কারিগরি ও পরামর্শমূলক সহায়তা, অনুদান ও স্বীকৃতি প্রদান;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক কার্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং তথ্য, কৌশল, কর্মপন্থা বিনিময়; ও
- সমাজের সুবিধাবঞ্চিত বা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।[৫৩৭]

সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রম

- **জাতীয় পর্যায়ে সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেয়া**

  সুবিধাবঞ্চিত, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের কল্যাণার্থে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেয়।

---

[৫৩৫] বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬*, প্রকাশনায় বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, তা.বি., পৃ. ৮

[৫৩৬] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, রোহেল পাবলিকেশনস্, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ১৪০

[৫৩৭] বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

- **মানবসম্পদ উন্নয়ন (সমন্বয় পরিষদ, শহর সমাজসেবার মাধ্যমে) অনুদান প্রদান**

  সারাদেশে জেলা পর্যায়ে ৮০টি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ রয়েছে। এ পরিষদের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত, স্বল্প সুবিধাভোগী ও গরিবদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

- **সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে অনুদান দেয়া**

  নিবন্ধনকৃত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে থেকে কাজ করে যাচ্ছে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সীমিত পরিসরে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এর সাথে জড়িয়ে আছে দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ মানুষ ও সমাজকর্মী। এ সংস্থাগুলো সরকারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে থাকে, বিশেষত বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘুর্ণিঝড়, অগ্নিকাণ্ড, দুর্ঘটনা মহামারী ইত্যাদি পরিস্থিতি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

- **বিশেষ অনুদান দেয়া**

  বিদ্যমান নীতিমালায় দরিদ্র, অসহায়, দুঃস্থ, সাধারণ মানুষদের বিশেষ করে দুঃস্থ অসহায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা, লেখাপড়া, বিয়ে, পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন খাতে এ অনুদান দেয়া হয়।[৫৩৮]

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভিশন

বাংলাদেশের সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ সুরক্ষা।

মিশন

ক) আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও সেবা মানের আলোকে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities), প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ ও নিউরো ডেভেলেপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ এর আলোকে বাংলাদেশের সব ধরনের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবন-যাপনে সহায়তা, সমমর্যাদা, অধিকার,

[৫৩৮] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮১

থেরাপি সেবা ও পুনর্বাসনে সহায়তাপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং একীভূত সমাজব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

খ) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধন।

গ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

- অটিজম ও এনডিডি (Neuro-Developmental Disabilities) কর্ণার সেবা
- প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে সেবা
- অটিজম রিসোর্স সেন্টার
- ক্ষুদ্রঋণ ও অনুদান কার্যক্রম
- স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম
- কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে আইন প্রণয়ন
- পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস
- দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থোরাপি সর্ভিস (মোবাইল বা ভ্রাম্যমান ভ্যান এর মাধ্যমে)
- অটিস্টিক সন্তানদের পিতামাতা/অভিভাবক ও কেয়ারগিভারদের প্রশিক্ষণ
- জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র
- প্রতিবন্ধীতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা
- প্রতিবন্ধীতা উত্তরণ মেলা।[৫৩৯]
- জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স
- প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কপপ্লেক্স।[৫৪০]

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

১৯৮৪ সালের মে মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান বাংলাদেশ সফর করেন। এ সফরকালে এদেশের অসহায় এতিম শিশুদের

[৫৩৯] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭৩
[৫৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

কল্যাণে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে তিনি বাংলাদেশে 'শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট' গঠনে সহায়তা করেন।

এ ট্রাস্টের লক্ষ্য

পারিবারিক পরিবেশে মাতৃস্নেহ, ভালোবাসা ও যত্নের সাথে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র শিশুদের লালন-পালন করে তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করা এবং উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন করা।

এ ট্রাস্টের উদ্দেশ্য

ক) ট্রাস্টের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও আয় বৃদ্ধির জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

খ) ট্রাস্টের নিজস্ব আয়ে এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

গ) দেশের যেকোনো স্থানে আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের শাখা স্থাপন করা;

ঘ) ট্রাস্টের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ চাঁদা আদায়, দান ও অনুদান গ্রহণ করা;

ঙ) যুগের সাথে সংগতি রেখে সমাজের অবহেলিত এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণের জন্য যেকোনো যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা;

চ) ট্রাস্ট এর উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যেকোনো সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, দেশি-বিদেশি সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও গ্রহণ; এবং

ছ) ট্রাস্টের তহবিল বৃদ্ধির জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে বিনিয়োগসহ আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।[৫৪১]

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

প্রতিবন্ধীদেরকে সামাজিক সুরক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট। এই ট্রাস্টকে সরকার নিয়ন্ত্রিত মৈত্রী শিল্প প্রতিষ্ঠানটি দেয়া হয়েছে। এখানে ওয়াটার প্লান্টে ৯টি সাইজের বোতলে মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার (খাবারের পানি) এবং প্লাস্টিক কারখানায় নিত্য ব্যবহার্য জগ, মগ, বালতি, গামলাসহ ৭০ ধরনের নিত্য ব্যবহার্য মৈত্রী সামগ্রী প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদন করা হয় ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাজারজাত করার ব্যবস্থা করা হয়।

[৫৪১] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮

এ ট্রাস্টের রূপকল্প

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা।

এ ট্রাস্টের লক্ষ্য

ক) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা।

খ) প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম জোরদার করা।

গ) মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী এবং মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন ও বিপণন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ও মৈত্রী শিল্পের আধুনিকায়ন করা।

ঘ) মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার সরকারি আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ প্রান্তিক ভোক্তাদের মাঝে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

এ ট্রাস্টের কার্যাবলি

- জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদেরকে দক্ষ মানব সম্পদে উন্নীতকরণ;
- শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্যসামগ্রী এবং বিশুদ্ধ মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার বিপণনের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন করা।[৫৪২]

সপ্তম অনুচ্ছেদঃ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) একটি সরকারি উন্নয়ন সংস্থা, যা ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৪৩] এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও বেকারদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৫৪৪] এ দেশের সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পাকিস্তান শাসন আমল থেকে সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করাসহ বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। ফলে স্বাধীনতার পর পরই দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এবং টেকসই আর্থিক সেবা প্রদানের জন্য একাধিক পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এর ধারাবাহিকাতায় ১৯৮৪

---

[৫৪২] সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৯

[৫৪৩] Qazi Kholiquzzaman Ahmad, *Empowerment is key to Poverty Eradication and Human Dignity (A New Holictc PKSF Approach: ENRICH)*, Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), Dhaka-2015, P. 7

[৫৪৪] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, প্রকাশনায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা-২০১০, পৃ. ১

সালের শুরুতে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প (Poverty Alleviation and Rular Employment Project) শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পল্লী কর্মসংস্থান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত।[৫৪৫] পরবর্তীতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিশেষজ্ঞদের সুপারিশসমূহের সমন্বয়ে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে মে ২, ১৯৯০ সালে Registrar of Joint Stock Compaines এর দপ্তর হতে companies Act, ১৯১৩ এর অধীনে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সংস্থাটি নিবন্ধন লাভ করে।[৫৪৬]

সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্রদের জন্য আর্থিক ও কারিগরি সেবাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প কার্যক্রমে জড়িত রয়েছে প্রায় এক লক্ষ পেশাজীবী এবং প্রায় ১.২০ কোটি দরিদ্র পরিবার। এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই তার সকল কর্মকাণ্ড সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত এর সহযোগী অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র ২৩টি। এখন পর্যন্ত ২৬৩টি প্রতিষ্ঠান এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বর্তমানে ১৯৪টি সক্রিয় সহযোগী সংস্থার ৫৮২৬টি শাখার মাধ্যমে পিকেএসএফ সারা দেশে মাঠ পর্যায়ে দরিদ্র, অতিদ্ররিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণির দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের জন্যে অর্থায়ন করছে।[৫৪৭]

মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র, অতিদরিদ্র, ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের অর্থায়ন করা।[৫৪৮] এ সকল জনগোষ্ঠীকে সম্পদ অর্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং এর মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।[৫৪৯] এ লক্ষ্যে এর উদ্দেশ্যবলী নিম্নরূপ:

১. পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রয়েছে এমন ধরনের বিভিন্ন বেসরকারি, আধা-সরকারি, সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সমিতি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা।

---

[৫৪৫] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

[৫৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৫৪৭] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর দু'দশক*, প্রকাশনায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা-২০১০, পৃ. ১

[৫৪৮] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর দু'দশক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[৫৪৯] Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), *ENRICH A Holistic Approach to Household-focused Poverty Eradication,* A new initiative of PKSF, Dhaka-2014, P. 13

২. সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাঁদের আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করা।

৩. দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা, সমর্থন ও সহযোগিতা করা। ঋণদানের মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে এদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করা।

৪. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা, পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডকে প্রাধান্য দিয়ে অধিক উৎপাদনে সহযোগিতা করা।

৫. পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক, সামাজিক, বাণিজ্যিক, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক কর্মশালা গ্রহণ করে উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতা করা।

৬. পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য উন্নয়ন সহযোগী দেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।

৭. কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা করা। গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহযোগিতা করা। বৃত্তি, ফেলোশীপ প্রদান, সেমিনার, কর্মশালা ও সম্মেলনের আয়োজন করা। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন রিপোর্ট, সাময়িকী, মনোগ্রাফ, বুলেটিন, জার্নাল, বই-পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশ করা।

৮. পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন তৎপরতার নিয়মিত মনিটরিং করা এবং তা মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি গড়ে তোলা।

৯. পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর লক্ষ্য অর্জন ও ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ও সহায়ক আইনানুগ যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[৫৫০]

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর কার্যক্রমসমূহ

প্রতিষ্ঠার পর থেকে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ

[৫৫০] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *ক্রসিয়ার*, প্রকাশনায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), জুলাই-২০০১, পৃ. ২-৩

করেছে। বর্তমানে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কৃষি-শস্যসহ ছোট-বড় সকল খাতে অর্থায়ন করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু গ্রামীণ দরিদ্রদের নিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে অন্তর্ভুক্তিতামূলক অর্থায়ন (Inclusive Finance) কার্যক্রমেও যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে নিম্নোক্ত ৮টি খাতে এ প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন ও কারিগরি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১) অতি দরিদ্রদের জন্য অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম;
২) কৃষি খাত অর্থায়ন কার্যক্রম;
৩) মৌসুমি অর্থায়ন কার্যক্রম;
৪) গ্রামীণ স্বকর্মসংস্থান কার্যক্রম;
৫) ক্ষুদ্র-উদ্যোগ অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম;
৬) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম;
৭) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অর্থায়ন কার্যক্রম; ও
৮) নগর স্বকর্মসংস্থান কার্যক্রম;

পিকেএসএফ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে ঋণ প্রদান করে এবং তা বাস্তবায়ন করে থাকে। এছাড়াও দেশের বিশেষ কোন অঞ্চলের চাহিদা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে পিকেএসএফ বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।[৫৫১]

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অর্থায়নকারী হিসেবে পিকেএসএফ

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনে অবদান রাখার জন্যে পিকেএসএফ-এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম।

- **প্রচলিত ধ্রুপদী ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম**

  পিকেএসএফ জন্মলগ্ন থেকে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পল্লী এলাকার সুবিধাবঞ্চিত, বিত্তহীন-ভূমিহীনদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ শুরু করে। এ কার্যক্রমটি পিকেএসএফ-এর সর্বাধিক পুরাতন ও সর্ববৃহৎ কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় গ্রামের দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে মহিলারা বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের জন্য ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

দরিদ্রদের জন্য আর্থিক পরিসেবার বৈচিত্রায়ন

- **ক্ষুদ্র উদ্যোগ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম**

  এ প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ ২০০১ সাল থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। যার মাধ্যমে উদ্যোক্তার নিজের এবং

[৫৫১] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর দু'দশক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩

পরিবারের অন্য সদস্যের কর্মসংস্থান হয় এবং এর পাশাপাশি পরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য ব্যক্তিদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

- **অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম**

ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন নিয়ম-নীতির কারণে বিভিন্ন সময় সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী ঋণ সেবা থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়। এজন্য পিকেএসএফ তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে।

- **প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য ঋণ কার্যক্রম**

বাংলাদেশের কৃষকদের জন্য প্রচলিত সাধারণ ঋণ কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত সফলতা পায় নি। এ প্রেক্ষাপটে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের মৌসুমি ঋণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়ানোসহ পাক্ষিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক অথবা এককালীন পদ্ধতিতে সার্ভিস চার্জসহ সমুদয় ঋণ একবারে পরিশোধের সুযোগ রাখা হয়েছে।

- **মৌসুমি ঋণ প্রকল্প**

এ প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতাদেরকে প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি কৃষি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র উৎপাদনশীল কার্যক্রমে মৌসুমভিত্তিক ঋণ প্রদান করে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণে আগ্রহী করা হয়। তাদের মধ্যে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা, আয়ের উৎস সৃষ্টি করা, আর্থিক ঝুঁকি হ্রাস করা, সর্বোপরি, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা এ মৌসুমি ঋণ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।

- **কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি**

এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের বিশেষায়িত কৃষি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চাহিদামাফিক ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক করিগরি জ্ঞান প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষির বিকাশ ঘটানো হয় এবং কৃষক পরিবারের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করা হয়।

- **প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রকল্পসমূহ**

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সকল কর্মকাণ্ডকে দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি টেকসই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য এ প্রকল্প ঋণ সহায়তা প্রদান করে।

- **মঙ্গা নিরসন কর্মসূচি**

  এ প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগপ্রবণ উত্তরবঙ্গে মঙ্গাক্রান্ত পরিবারগুলোর জন্য বছরব্যাপী মজুরিভিত্তিক ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মঙ্গাক্রান্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ভোক্তা ঋণসহ অতি সহজ পদ্ধতির ক্ষুদ্রঋণ, রেমিট্যান্স সেবা, কাজের বিনিময়ে অর্থ, কারিগরি সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়।

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি**

  এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে।[৫৫২]

- **সমৃদ্ধি কর্মসূচি**

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১০ সালে তৃণমূল পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারগুলোর সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে 'দরিদ্র পরিবারের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি চালু করে। যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, একটি পরিবারের বর্তমান সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। এই কর্মসূচিতে দরিদ্র পরিবারের জন্য একটি সমন্বিত সহায়তা প্যাকেজের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধনের বিষয়কেও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।[৫৫৩]

কর্মসূচির রূপরেখা

কর্মসূচির শিরোনাম হচ্ছে, "দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)"।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

"সমৃদ্ধি" কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো:

- কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবারগুলোকে ক্ষমতায়িত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

---

[৫৫২] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *একুশ পূর্তিতে পিকেএসএফ*, প্রকাশনায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা-২০১১, পৃ. ৫-১১

[৫৫৩] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) একটি মানবকেন্দ্রিক কর্মসূচি*, প্রথম সংস্করণ, প্রকাশনায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা-২০১৭, পৃ. ৯

- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পুষ্টিতে দরিদ্রদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে নারী ও শিশুর প্রতি বিশেষ নজর দেয়া।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং দুর্যোগপরবর্তী পুনর্বাসনে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র পরিবারগুলোর যথাযথ অবদান রাখার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে দারিদ্র্য হ্রাস ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সরকারি-এনজিও/বেসরকারি সহযোগিতার বিকাশ ঘটানো।[৫৫৪]

কর্মসূচির প্রক্রিয়া

- দরিদ্র পরিবারগুলোর বিদ্যমান সম্পদ ও সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহার।
- দরিদ্র পরিবারগুলোর সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহারে সহায়তা করা।[৫৫৫]

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চলমান কার্যক্রমসমূহ

- শিক্ষা কার্যক্রম;
- ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম;
- স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম;
- বয়স্কদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি;
- আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম;
- বসতবাড়িতে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমৃদ্ধ বাড়ি গড়া;
- অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা কার্যক্রম;
- পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা;
- শতভাগ স্যানিটেশন ও হাত ধোয়া কার্যক্রম;
- সৌরবিদ্যুৎ কার্যক্রম;
- বন্ধুচুলা কার্যক্রম;
- আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম;
- বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম
- সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি গঠন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্র স্থাপন;

---

[৫৫৪] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *সমৃদ্ধি*, প্রকাশনায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা-২০১০, পৃ. ৩-৪

[৫৫৫] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *সমৃদ্ধির পথে ২য় বছর*, প্রকাশনায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা-২০১১, পৃ. ২

- ঔষধি গাছ 'বাসক' চাষাবাদ কার্যক্রম;
- বসতবাড়িতে সবজি চাষ কার্যক্রম;
- কেঁচোসার উৎপাদন ও ব্যবহার কার্যক্রম;
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম;
- কৃমিনাশক ট্যাবলেট বিতরণ;
- যুব উন্নয়ন কার্যক্রম (যুব প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান);
- সামাজিক উন্নয়ন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ।[৫৫৬]

সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ ক্ষুদ্রঋণভুক্ত না হওয়ায় অধিকাংশকে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য পিকেএসএফ ২০০২ সালে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় "হতদরিদ্রদের জন্য আর্থিক সেবা প্রকল্প (Financial Services for the Poorest-FSP)" শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেয়। যা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বাধা হলো সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্রদের অনিশ্চিত আয় ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, সমিতির সভায় নিয়মিত উপস্থিতিতে অনীহা, ঋণ ব্যবহারে অদক্ষতা, নিজের উপর আস্থার অভাব ইত্যাদি। আর তাই ক্ষুদ্রঋণের প্রচলিত শর্তের বাইরে সহজ শর্তে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হলে সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্ররা বেশি আকৃষ্ট হয়।

কার্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

পিকেএসএফ-এর "অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম" পরিচালানার জন্য ২০০৪ সালে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৬ সালে এ নীতিমালাটি পরিমার্জন করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ব্যক্তিবর্গ হলো:-

- লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী;
- ভিক্ষুক, ভ্রাম্যমাণ যৌনকর্মী, ভবঘুরে এবং পথকলি;
- বস্তিবাসী, বাস্তুহারা, মৌসুমি শ্রমজীবী ও নদীভাঙন এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী ও প্রান্তিক চাষী;
- নারী-প্রধান পরিবার যেটি অন্যের দয়ার উপর নির্ভরশীল;
- ভূমিহীন এবং অন্য লোকের আশ্রয়ে বসবাসরত অদক্ষ লোক;
- দাসত্ব শ্রম এবং গৃহভৃত্য;
- বৃদ্ধ, দৈহিকভাবে প্রতিবন্ধী, এসিডদগ্ধ এবং যার আর কোনো আয়ের উৎস নেই;
- দৈনিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি; ও
- পরিবারে কর্মক্ষম সদস্য নেই এমন পরিবারের প্রতিনিধি।[৫৫৭]

---

[৫৫৬] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) একটি মানবকেন্দ্রিক কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে নিয়োজিত এনজিও ও অন্যান্য সংস্থার তদারকি প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নে নিয়োজিত এনজিও ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের প্রকৃতি, ধরন ও কার্যক্রমসমূহ নিম্নে দেয়া হলো:-

প্রথম অনুচ্ছেদঃ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান কয়েক বছর আগে থেকেই বেশ সফলতার সাথে কাজ করে আসছে।[৫৫৮] এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও তাদের কার্যক্রমকে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার আওতায় এনে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকার মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠা করে। এটি সরকার কর্তৃক 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন ২০০৬' এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করার উদ্দেশ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসূহকে সনদ প্রদান করে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট লোকবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্রঋণ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে এ সংস্থা।

এ প্রতিষ্ঠানের ভিশন

স্বচ্ছতা ও জাববাদিহিতামূলক ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন।

এ প্রতিষ্ঠানের মিশন

ক্ষুদ্রঋণ খাতকে কার্যকর ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সহায়ক ও সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি।[৫৫৯]

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির কার্যক্রম

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ক্ষুদ্রঋণ সেক্টর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি সনদ প্রদানের পাশাপাশি বিধি-বিধান তৈরি, বিভিন্ন নির্দেশনা জারিসহ সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন ও মনিটরিং করে আসছে। এর নিয়মিত কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে।

---

[৫৫৭] পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ*, প্রকাশনায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা-২০১১, পৃ. ৪-৫

[৫৫৮] Md. Abdul Hamid Miah, *Islamic Microfinance*, ibid, p. 36

[৫৫৯] মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬, প্রকাশনায় মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, তা.বি. পৃ. ৩

- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সনদ প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য নীতি নির্ধারণ;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অফ-সাইট সুপারভিশন ও মনিটরিং;
- ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন;
- ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতার স্বার্থ সংরক্ষণ;
- ক্ষুদ্রঋণ খাতের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য অথরিটির গবেষণা ও প্রকাশনা;
- ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডকে যুগোপযোগী ও গ্রাহক বান্ধবকরণ।[৫৬০]

২০১৬ সাল পর্যন্ত মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (এমআরএ) সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত গ্রাহকের সংখ্যা ২ কোটি ৭৬ লক্ষ জন। এই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মরত জনবল রয়েছে ১ লক্ষ ২২ হাজার জন। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারাদেশে মোট ৬৮০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ১৬২০৪টি শাখা অফিস রয়েছে।[৫৬১]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে অভাবী, দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে মূলত বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে এনজিওগুলো কাজ করে আসছে। বৈদেশিক অনুদান নেয়া এবং এ কাজে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য এনজিওগুলোকে সরকারের অনুমোদন নেয়ার প্রয়োজন হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও তদারকির জন্য প্রথমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের একটি সেলের মাধ্যমে এনজিওগুলোর পক্ষে বৈদেশিক অনুদানের অর্থছাড় করা হতো। পরবর্তীতে এ কাজকে আরো বেশি সহজ ও দ্রুত করার জন্য ১৯৭৮ সালে The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 ও The Foeirgn Donations (Voluntray Activities) Regulation Rules, 1978 এবং ১৯৮২ সালে The Foreign Contributions (Regulation) Ordinance,

[৫৬০] মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
[৫৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

1982 জারি করে এবং এর আলোকে এনজিওগুলোর অনুমোদন, পরামর্শ, কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করা হয়।[৫৬২] পরবর্তীতে এ কাজে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের জন্য ১৯৯০ সালে প্রথমে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের অধীনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সৃষ্টি হয়।[৫৬৩] যা ঢাকার রমনায় মৎস্য ভবনে ভাড়া জায়গায় এর কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে এ কাজে আরো গতিশীল করার জন্য ১৯৯১ সালে এ দপ্তরকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে আনা হয়।[৫৬৪] পরবর্তীতে বর্ণিত আইন ও বিধিমালা ছাড়া ২১ মে ২০০১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের জন্য অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে পূর্বের পরিপত্রটি সংশোধন করে নতুন করে পরিপত্র জারি করা হয়।[৫৬৫] বর্তমানে এক ধাপে সেবাদান কেন্দ্র হিসেবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সার্বিক কার্যক্রম (বৈদেশিক অনুদান আইনে এনজিও নিবন্ধন, নিবন্ধন নবায়ন, প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন, অর্থছাড়, অডিটসহ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্ব আগারগাঁওস্থ ব্যুরোর নিজস্ব ভবন (প্লট-ই-১৩/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা) হতে সম্পাদিত হচ্ছে।[৫৬৬] এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সমগ্র বাংলাদেশে সকল এনজিওকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যদিও মাঠ পর্যায়ে তদারকির জন্য তাদের কোনো অফিস নেই। এক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ মাঠ পর্যায়ের এনজিওদের কার্যক্রম তদারকি, পর্যালোচনা ও সমন্বয় করেন।[৫৬৭]

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর লক্ষ্য

দেশের সুবিধাবঞ্চিত পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত এনজিওসমূহকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সার্বিক সহায়তা প্রদান।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উদ্দেশ্য

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মূল উদ্দশ্যসমূহ-

ক) লক্ষ্য অর্জনে এনজিওসমূহের ভূমিকা জোরদার করা;

খ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা; এবং

---

[৫৬২] এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, *এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ২০ বছর*, প্রকাশনায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা-২০১১, পৃ. ২১

[৫৬৩] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

[৫৬৪] এনজিও বিষায়ক ব্যুরো, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, প্রকাশনায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা-২০১৮, পৃ. ৩

[৫৬৫] এনজিও বিষায়ক ব্যুরো, *এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ২০ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[৫৬৬] এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৫৬৭] মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, *বাংলাদেশে এনজিও'র গঠন পরিচালক ও বিকাশ*, সেবা প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৬, পৃ. ১৩

গ) বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিওসমূহের কার্যক্রমের সুষ্ঠু সমন্বয় ও প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এনজিওসমূহকে সুবিধা দান করা।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মূল্যবোধ

বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বিশেষ কিছু মূল্যবোধকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যেমন-

ক) বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত এনজিওসমূহকে এক ধাপে সেবাদান (One-stop-service);

খ) সকল প্রকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এনজিওসমূহকে সহায়তা প্রদান;

গ) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা, পরিধি, যথার্থতা ইত্যাদির উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের অভিজ্ঞ/টেকনিক্যাল মতামত ও নির্দেশনা গ্রহণ;

ঘ) সম্প্রীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় অনুভূতি বজায় রেখে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করে এনজিওসমূহের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা;

ঙ) এনজিওসমূহের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর নিকট তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ;

চ) নতুন নতুন বিষয় ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিওদের প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান;

ছ) উপকারভোগীদের সর্বোচ্চ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

জ) অধিকতর আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে এনজিও এবং দাতা সংস্থাসমূহকে উৎসাহ প্রদান;

ঝ) মাঠ প্রশাসনের দ্বারা পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন এবং স্থানীয়ভাবে সমন্বয় এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

ঞ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে দুর্লভ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

ট) জিও-এনজিও সমন্বয় কাউন্সিলের মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ ও নির্দেশনা প্রদান এবং

ঠ) সিটিজেন চার্টার মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকার সেবাদান নিশ্চিতকরা।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কার্যাবলী

সংশ্লিষ্ট আইন, অধ্যাদেশ, বিধি এবং পরিপত্র অনুসরণ করে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এনজিওসমূহকে কাজের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহে যেতে হয় না। অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও দূতাবাস, দাতা সংস্থার সাথে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে যোগাযোগ

করে সেবা প্রদান করা হয়। নিম্নে এনজিও বিষয় ব্যুরোর প্রধান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:-

ক) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিও নিবন্ধন এবং নবায়ন প্রদান;

খ) এনজিও কর্তৃক দাখিলকৃত বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহের অনুমোদন ও অর্থছাড়;

গ) এনজিওসমূহের বিদেশি/পরামর্শক নিয়োগের অনুমতি প্রদান ও নিয়োগের মেয়াদ নির্ধারণ;

ঘ) এনজিও কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন ও অডিট প্রতিবেদন পরীক্ষা ও মূল্যায়ন;

ঙ) এনজিও কার্যক্রমের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন;

চ) সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত বিভিন্ন ফি/সার্ভিস চার্জ আদায়;

ছ) মাঠ পর্যায়ে ব্যুরোর নিবন্ধিত এনজিওদের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষণ;

জ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং দাতা সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;

ঝ) এনজিওসমূহের হিসাব নিরীক্ষার জন্য চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্মস তালিকাভুক্তকরণ;

ঞ) এনজিওসমূহের ও অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের এককালীন অনুদান গ্রহণ অনুমোদন;

ট) উপর্যুক্ত বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ;

ঠ) এনজিও সংক্রান্ত কাজে এনজিও প্রতিনিধিদের বিদেশ ভ্রমণ প্রক্রিয়াকরণ;

ড) বিভিন্ন ইস্যুতে এনজিওদের সাথে দ্বিপাক্ষিক সভা-সেমিনার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং

ঢ) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিও কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য সকল বিষয় সম্পাদন।[৫৬৮]

এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর চলমান সেবা কার্যক্রম

ক) সিটিজেন চার্টার

খ) সেবা প্রদানের অঙ্গীকার

গ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

ঘ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো

ঙ) এনজিও পরিদর্শন

জ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

ঝ) তথ্য অধিকার আইন

[৫৬৮] এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, *এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ২০ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

ঞ) মানি লন্ডারিং

ট) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ই-গভর্নেন্স উন্নয়ন

ঠ) ইনোভেশন

ড) ই-নথি

ঢ) অটিজম

ন) Annuaal Performance Agreement (APA)

প) এপিএ বাস্তবায়নের ফলাফল

ফ) এপিএ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা

ব) এপিএ বাস্তবায়ন বিবরণ

ভ) সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশে নিবন্ধিত এনজিও এর সংখ্যা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত জুন ২০১৭ পর্যন্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত এনজিও সংখ্যা ২৫৫৪টি।[৫৬৯] তন্মধ্যে দেশি এনজিও ২৩০১টি এবং বিদেশি এনজিও ২৫৩টি। নিবন্ধিত এনজিওসমূহের মধ্যে সর্বাধিকসংখ্যক এনজিও ঢাকা বিভাগে, সংখ্যা ১৩৮২টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২২৫টি, রাজশাহী বিভাগে ১৯৯টি, খুলনা বিভাগে ৩২৩টি, বরিশাল বিভাগে ১২১টি, সিলেট বিভাগে ৫৯টি, রংপুর বিভাগে ১৭৫টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ৭০টি এনজিও তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৫৭০]

এনজিওসমূহের কার্যক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশে এনজিওগুলোর উদ্ভব হয়েছে মূলত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে, কিন্তু সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এ সকল এনজিওএর কর্মপরিধির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনে। এ সকল এনজিও দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। এনজিওগুলোর কার্যক্ষেত্র নিম্নরূপ-

- ক্ষুদ্রঋণ
- দারিদ্র্য দূরীকরণ
- শিক্ষা

[৫৬৯] এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৫৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

- স্বাস্থ্য
- দুর্যোগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, গৃহায়ন
- নারী উন্নয়ন
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- কৃষি উন্নয়ন
- পরিবেশ সংরক্ষণ
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
- রোহিঙ্গা পুনর্বাসন ও প্রত্যাবাসন কার্যক্রম
- বৃক্ষরোপণ ও সামাজিক বনায়ন
- সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি
- জলাশয় ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য চাষ
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম
- নির্বাচন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র
- পরিবার পরিকল্পনা
- স্থানীয় সরকার
- আইন ও সুশাসন
- বিদ্যুৎ জ্বালানি
- যুব ও সংস্কৃতি
- নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী
- তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি
- ধর্ম
- অন্যান্য[৫৭১]

[৫৭১] এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নে নিয়োজিত উল্লেখযোগ্য এনজিওসমূহ

বাংলাদেশে এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার সঠিক দিনক্ষণ পাওয়া না গেলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এগুলোর কার্যক্রম মূলত সতেরো ও আঠারো শত দশকে শুরু হয়েছিল। সে সময় কার্যক্রম শুরু করে অনেক এনজিও। কিন্তু বিভিন্ন কারণে পরবর্তীতে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে নি। যদিও স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড এই এলাকায় প্রাচীনকাল থেকেই অত্যন্ত সফলতার সাথে চলে আসছে।[৫৭২] বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে এখনো কর্মরত রয়েছে এমন খুবই অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো হচ্ছে বাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি, যা ব্রিটিশ ভারতে ১৭৯৪ সালে তার কার্যক্রম শুরু করেছিল। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্তমান পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান রেখে চলেছে ক্রিষ্টিয়ান মিশন হাসপাতাল এবং কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।[৫৭৩] এছাড়ও মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ১৮৬৩ সালে, ব্রাহ্মণ সমাজ ১৮২৮ সালে, রামকৃষ্ণ মিশন ১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৭৪]

ব্রিটিশ শাসন শেষে পাকিস্তান স্বাধীন হলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নকল্পে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেজন্য তারা ১৯৫৩ সালে Village Agricultural and Industrial Development Programme (VAIDP) প্রতিষ্ঠা করে। যে প্রকল্পটি বহুল পরিচিতি VAID প্রকল্প নামে পরিচিতি পেয়েছিল। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কৃষি, প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন, সমবায়, কুটির শিল্প, সেচ, সড়ক নির্মাণ, যুব ও মহিলা উন্নয়নসহ সামাজিক ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। কিন্তু বিভিন্ন ব্যর্থতা ও প্রকল্প জটিলতার কারণে এ প্রকল্প তেমন কোন ভালো ফলাফল দিতে পারেনি।[৫৭৫] এছাড়াও বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি (১৯৫৩) এবং রেডক্রস সমিতি ১৯৫৪ সনে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৬২ সালে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।[৫৭৬] তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কুমিল্লাতে ১৯৫৯ সালের মে মাসে এদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন মডেল (Bangladesh Academy for Rural Development) প্রতিষ্ঠা করে, যা চারটি মডেলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মডেলগুলো ছিলঃ (এক) প্রতি থানায় Thana Training & Development Centre (TTDC) প্রতিষ্ঠা করা, (দুই) প্রতি থানায় সড়ক-ড্রেন-বাঁধ ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ করার লক্ষ্যে

---

[৫৭২] আনু মাহ্‌মুদ, *বাংলাদেশে এনজিও*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা-২০১১, পৃ. ১৩
[৫৭৩] আনু মাহ্‌মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা-২০১১, পৃ. ১১
[৫৭৪] আনু মাহ্‌মুদ, *বাংলাদেশে এনজিও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
[৫৭৫] আনু মাহ্‌মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
[৫৭৬] আনু মাহ্‌মুদ, *বাংলাদেশে এনজিও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Rural Works Programme চালু করা, (তিন) প্রতিটি থানায় বিকেন্দ্রিত সেচ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে কৃষকদের সেচ সুবিধা দেয়া এবং কৃষক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা। (চার) প্রতিটি থানায় Thana Central Cooperative Association (TCCA) প্রতিষ্ঠা করা।[৫৭৭] পরবর্তী সময়ে ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর তারিখের প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী দুর্গত মানুষের ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের লক্ষ্যে এদেশে নতুন করে কিছু এনজিও গড়ে উঠে।[৫৭৮]

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নতুন দেশ ও জাতির সূচনায় এনজিও-র কার্যক্রম শুধু পুনর্বাসনের মধ্যে সীমিত ছিল। কারণ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত দারিদ্র্যক্লিষ্ট একটি দেশ। যেখানে লুণ্ঠিত মানবতার কারণে স্রোতের ন্যায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাই দরিদ্র মানুষদের সহযোগিতার জন্য এবং বিধস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশ পুনর্গঠনের জন্য সরকারি পর্যায় ছাড়াও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠে। আর এ সকল সংস্থাসমূহ তাদের কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি করতে থাকে।[৫৭৯] এছাড়াও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এদেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুবৃত্তায়নের ফলে দেশের সকল পর্যায়ে দুর্নীতি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে একদিকে অবৈধভাবে সম্পদশালী মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে, অন্যদিকে বাড়তে থাকে অভুক্ত মানুষের সংখ্যা। এর ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এবং দেখা দেয় মানবিক বিপর্যয়। আর সেই মানবিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র সুবধিাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আরো অনেক বেসরকারি সংস্থা তাদের কার্যক্রম শুরু করে। তার ধারাবাহিকতায় আশির দশকের শেষ ও নব্বই দশকের শুরুতে এদেশে এনজিও কার্যক্রমের পরিধি আরো বিস্তৃত হয় এবং একই সাথে এনজিও'র সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বেশিরভাগ এনজিও ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করলেও সময়ের প্রয়োজনে এদের ভূমিকা ও কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

এনজিওগুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে সম্পদে পরিণত করার প্রক্রিয়ায় তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, সামাজিক ও আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার কর্মকাণ্ড চালু রেখেছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এনজিওগুলো আর্ত মানুষের পাশে এসে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে চলেছে। শুধু ত্রাণ কার্যক্রমেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ না রেখে দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনমূলক

---

[৫৭৭] আনু মাহ্মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

[৫৭৮] আনু মাহ্মুদ, *বাংলাদেশে এনজিও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৫৭৯] আনু মুহাম্মাদ, *বাংলাদেশ এনজিও : দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৯

কর্মসূচির মাধ্যমে এনজিওগুলো কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭৪, ১৯৮৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় এবং ১৯৮৫, ১৯৮৮ ও ১৯৯১ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে এনজিওগুলো আর্ত-মানবতার সেবায় এবং পুনর্বাসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।[৫৮০]

বর্তমানে এনজিওর কর্মক্ষেত্র দেশব্যাপী ব্যাপক বিস্তৃতি পেয়েছে। বড় বড় এনজিওগুলো মূলত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন, দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি এবং তাদের কর্মসংস্থানের জন্য এনজিওদের বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এনজিওসমূহ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষিত এবং সংগঠিত করে তাদের ক্ষমতানুযায়ী তাদেরকে ঋণ প্রদান করে। মূলত দারিদ্র্যই সুবিধাবঞ্চিতদের সকল সমস্যার মূল এবং এ কারণেই তারা মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত। এজন্যই এনজিওগুলো মূলত তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণকল্পে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রধানত কৃষিনির্ভর অর্থনীতির একটি দেশ। বর্তমানে এ দেশ কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি উৎপাদনমুখী বিভিন্ন শিল্প নির্ভর অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য একদিকে কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন করতে হবে, অন্যদিকে শিল্পভিত্তিক উন্নয়নও করতে হবে। দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলে বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। তাই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এ দুটি শিল্পকেই এগিয়ে নিতে হবে। এই অবস্থায় অনেক এনজিও কৃষিভিত্তিক কর্মসংস্থান করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এনজিওগুলো বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী তাদের দরিদ্রতা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সকল যোগ্যতা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। ফলে তারা দক্ষ হয়ে সামাজিক উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য, কৃষি, বৃত্তিমূলক ও আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণ, মধুচাষ, রেশম চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু প্রতিপালন, সামাজিক বনায়ন, কারিগরি প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গ্রহণ করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হন।

বর্তমানে এনজিওগুলো দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তারা ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাতেও ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত দেশি ও বিদেশি এনজিওসহ বহু সংস্থা সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে মার্চ ২০১৯ সাল পর্যন্ত ২৩৯১টি দেশি এনজিও এবং ২৬৫টি বিদেশি এনজিও কাজ করছে।[৫৮১] এছাড়াও এদেশে কিছু আন্তর্জাতিক এনজিও তাদের কান্ট্রি অফিসের মাধ্যমে

---

[৫৮০] আনু মুহাম্মাদ, *বাংলাদেশ এনজিও : দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৫৮১] http://www.ngoab.gov.bd, ২৯-০৩-২০১৯

নিজেরাই সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। আবার কোনো কোনো বিদেশি এনজিও তারা পার্টনার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এদেশে কাজ করে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু সংগঠনের পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো:

প্রথম অনুচ্ছেদ: বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভ্যান্স কমিটি (ব্র্যাক)

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হলো ব্র্যাক। এটি বর্তমানে বিশ্বের মধ্যেও বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা।[৫৮২] এই সংস্থাটি প্রধানত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এবং বাংলাদেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭০ সালে স্যার ফজলে হাসান আবেদ-এর উদ্যোগে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্তদের সাহায্য করার মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির শুভ সূচনা হয়েছিল।[৫৮৩] দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজনে জার্মানির এ ব্রেড ফর দি ওয়ার্ল্ড নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিদেশি অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলে একটি সংগঠন স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে সে সময় ফজলে হাসান আবেদ সভাপতি হয়ে মার্থা আল্টার চেন, ক্যান্ডি রোড ও ভিকারুল ইসলাম চৌধুরীকে সদস্য করে HELP (Heartland Emergency Lifesaving Project) নামক একটি সংগঠন গঠন করেন।[৫৮৪] ফজলে হাসান আবেদ বিদেশে বসেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত ভুক্তভোগীদের সাহায্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচলানার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এরপর বিদেশি সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে তিনি 'Action Bangladesh' নামক একটি সংস্থা গঠন করেন।[৫৮৫] স্বাধীনতার পর সিলেটের সাল্লা গ্রামে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি Bangladesh Rehabilitaion Assistance Committee (BRAC) নামক সংস্থা গঠন করেন। এই দিনটিই মূলত ব্র্যাকের আনুষ্ঠানিক জন্মদিন।[৫৮৬] উক্ত সংগঠনের মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে বাড়ি-ঘর নির্মাণের জন্য তিনি ত্রাণসামগ্রী বিতরণের চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে সংস্থাটি Bangladesh Rural Advancement Committee বা সংক্ষেপে BRAC নামে কার্যক্রম শুরু করে।[৫৮৭] আর ব্র্যাক প্রতিষ্ঠার পর থেকে

---

[৫৮২] গোলাম মোর্তোজা, *ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০৬, পৃ. ৯

[৫৮৩] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, জমজম প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৩, পৃ. ১২২

[৫৮৪] ফারুক চৌধুরী, সুবলকুমার বণিক, সাজেদুর রহমান, *ব্র্যাক উন্নয়নের একটি উপাখ্যান*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০০৯, পৃ. ১৫

[৫৮৫] গোলাম মোর্তোজা, *ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৫৮৬] ফারুক চৌধুরী, সুবলকুমার বণিক, সাজেদুর রহমান, *ব্র্যাক উন্নয়নের একটি উপাখ্যান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৫৮৭] আনু মাহ্মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪-১১৫

সুবিধাবঞ্চিত, দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র জনগণের (বিশেষ করে মহিলাদের) দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়নকে মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি চালিয়ে আসছে।[৫৮৮] বর্তমানে ব্র্যাক বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ব্র্যাকের রূপকল্প: এমন একটি পৃথিবী গড়া যেখানে কোনো প্রকার শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না এবং প্রতিটি মানুষের নিজস্বতা বিকাশের সুযোগ থাকবে।

ব্র্যাকের লক্ষ্য: দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ব্যাধি এবং সামাজিক অবিচার দূরীভূত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের পথকে এগিয়ে নেয়া এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে বড়মাপের ইতিবাচক পরিবর্তন এনে সমাজের সকল নারী ও পুরুষের সম্ভাবনার বিকাশ সাধন।

ব্র্যাকের মূল্যবোধসমূহ

- সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব
- সততা ও নিষ্ঠা
- সর্বজনীনতা
- কার্যকারিতা

ব্র্যাকের উদ্দেশ্যসমূহ

১. গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের কারণ সম্পর্কে সচেতন করা;

২. গ্রামীণ মহিলাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা;

৩. দরিদ্রদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সক্ষম করে তোলা;

৪. বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাবলম্বন অর্জন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে অনুঘটক/প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন;

৫. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি এবং সম্পদ অর্জন প্রক্রিয়ায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা;

৬. উন্নয়নের গতিধারাকে গতিশীল করা।[৫৮৯]

ব্র্যাক তার উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় গ্রামের ৩৫-৪০ জন মহিলা সদস্যকে সংগঠিত করে গঠন করে গ্রাম সংগঠন। ব্র্যাকের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে গ্রামসংগঠনগুলো খুবই কার্যকর। এখানে

---

[৫৮৮] ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *স্বেচ্ছাসেবিতা ও বাংলাদেশের এনজিও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

[৫৮৯] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

ব্র্যাক তার সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপযোগী করে তোলে। ৫৭০০০ নিয়মিত কর্মী ও ৬৩৯৩২ খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়ে ব্র্যাক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এই কার্যক্রমে মোট ১১০ মিলিয়ন জনসংখ্যা এর কর্মসূচির আওতায় এসেছে।[৫৯০]

ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচি

ব্র্যাক দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্রদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সামগ্রিকভাবে, ব্র্যাকের কর্মসূচিসমূহকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা হলো:

- পল্লী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি
- শিক্ষা কর্মসূচি
- স্বাস্থ্য কর্মসূচি
- সহায়ক কর্মসূচি

ক. পল্লী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

গ্রামীণ ভূমিহীন, দুঃস্থ, দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ব্র্যাকের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্নস্তরের কর্মীদের অভিজ্ঞতার আলোকে এ কার্যক্রমের কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম কয়েকটি খাতে বিভক্ত:

১. সেচ
২. রেশম
৩. মৎস্য চাষ
৪. পশুপালন ও হাঁস-মুরগির খামার
৫. পশম শিল্প
৬. গ্রামীণ প্রশিক্ষণ
৭. গ্রামীণ পরিবহন
৮. সামাজিক বনায়ন
৯. খাদ্য ও গুদাম[৫৯১]

---

[৫৯০] BRAC AT A GLANCE, November 2008, Public Affairs & Communications
[৫৯১] আনু মাহ্মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২৩

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি

ব্র্যাক শুরু থেকেই বাংলাদেশের নারীদের দুর্দশা ও বঞ্চনার বিষয়টি উপলব্ধি করে। গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্রদের বিশেষত মহিলাদের নিয়ে এ কর্মসূচি শুরু করে। বস্তুত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের ন্যূনতম জীবনমানের নিশ্চয়তা, আত্মনির্ভরতা অর্জন ও মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিয়ে নিজেদের জীবন পরিচালনা করার সামর্থ্য অর্জনে সহায়তা করাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য।

- **গ্রাম সংগঠন কর্মসূচি:** পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য ব্র্যাক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের বিশেষত মহিলাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্ষুদ্রঋণ ও দলগতভাবে সংগঠিত হবার সেবা প্রদান করে।
- **ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি:** দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়নের জন্য ব্র্যাক তার বৃহৎ এ কর্মসূচির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের ব্যাংক ঋণ পাওয়া সহজলভ্য না হওয়ায় ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ব্র্যাক সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্রদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলছে।

১. **ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সহায়তা কর্মসূচি:** ক্ষুদ্র ব্যবসা কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন ও বিদ্যমান ক্ষুদ্র ব্যবসায় ২০টি নির্ধারিত খাতে ব্র্যাক ঋণ সুবিধা ও কারিগরি সহায়তা দেয়। ঋণ সুবিধা ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হয়। এজন্য ব্র্যাক ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করে।[৫৯২]

গ. সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্র্যাক সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে।

- **গ্রাম সভা:** গ্রামের মহিলা সদস্যরা মাসে একবার এ গ্রাম সভাতে আসে। এখানে মহিলারা সৃজনশীল অংশগ্রহণমূলক কার্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতামত, আলোচনা, পর্যালোচনা করে জ্ঞান লাভ করেন এবং তারা নিজেদের ব্যাপারে সচেতন হচেছন।[৫৯৩]
- **ইউনিয়ন সমাজ:** ইউনিয়ন পরিষদকে অধিক জনমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং সরকারি সম্পদের যথাযথ বণ্টনের জন্য ব্র্যাক পল্লী সমাজকে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে প্রসারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

---

[৫৯২] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮১

[৫৯৩] আনু মাহ্মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

- **সামাজিক সমাবেশঃ** ব্র্যাক ১৯৯৮ সালে ওয়ার্ড স্তরে গ্রাম সংগঠনের প্রতিনিধি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি চালু করে। সামজিক সমাবেশের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করে যৌতুক, বহু বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, বাল্য বিয়ে, দুর্নীতি, অবিচার ইত্যাদির মোকাবেলা করে এবং সমাজে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজের নেতাদের নিয়েও কর্মশালার ব্যবস্থা করে।[৫৯৪]
- **মানবাধিকার ও আইনি সহায়তাঃ** ব্র্যাক সমাজের ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় মানবাধিকার ও আইনি সহায়তা প্রদান করে।[৫৯৫]

ঘ. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির মাধ্যমে এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ব্র্যাকের স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো দরিদ্র মানুষের মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা পূরণ করা। এ কর্মসূচির অধীনে নিম্নোক্ত কার্যক্রম চালু রয়েছেঃ-

- **সুযোগভিত্তিক সেবাঃ** ব্র্যাকের আওতায় চালুকৃত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ-

  স্বাস্থ্যসেবাঃ গ্রামীণ দরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার লক্ষ্যে ব্র্যাক কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবিকার মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করে। এ সেবা কেন্দ্রগুলোতে বহিঃরোগী-আন্তঃরোগী সেবা সুবিধা ও ল্যাবরেটরি সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। আর এখানে নিরাপদ সন্তান জন্মদানসহ স্বাস্থ্য, মা, নবজাতক ও শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, প্রজননজনিত সেবা, স্যানিটেশন, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ ও টিকাদানে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে সেবা দেয়া হয়।

  শারীরিক অঙ্গ সংস্থাপন কেন্দ্রঃ ব্র্যাক বিকলাঙ্গ মানুষদেরকে সহযোগিতা করার জন্য ২০০০ সাল থেকে শারীরিক অঙ্গ সংস্থাপন কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

  সরকার ও ব্র্যাক যৌথ কর্মসূচিঃ স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে ব্র্যাক সরকারের সাথে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তিনটি (পুষ্টি কর্মসূচি, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ ও টিকা সেবা) কার্যক্রম চালু করেছে।

  পাইলট কর্মসূচি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য উদ্যোগঃ ব্র্যাক তার নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি কিছু পাইলট কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে।[৫৯৬]

---

[৫৯৪] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

[৫৯৫] আনু মাহ্‌মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

[৫৯৬] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

ঙ. ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি

ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচি ১৯৮৫ সাল হতে চালু রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পটি ২২টি এক কক্ষ বিশিষ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হয়।[৫৯৭]

- **উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা:** ব্র্যাকের এই কার্যক্রমটি সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এ কর্মসূচিতে প্রায় ৩৫ হাজার উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলে প্রায় ১২ লক্ষের বেশি দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থী রয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগই মেয়ে শিশু। এই কার্যক্রমে মূলত বিভিন্নভাবে ঝরে পড়া শিশুরা অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫৯৮]
- **কিশোর-কিশোরী বিকাশ কর্মসূচি:** এ কর্মসূচির মাধ্যমে কিশোরদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সহায়তা করা হয়।
- **স্থানীয় উপজাতী শিশুদের শিক্ষা:** এ কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয় উপজাতী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।
- **আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়:** ১৯৯৯ সালে ১১টি আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে ব্র্যাক এ কার্যক্রমটি শুরু করে।[৫৯৯]

চ. ব্র্যাকের সমর্থনমূলক কর্মসূচি

ব্র্যাক তার উপরোক্ত কর্মসূচিগুলোকে জোরদার করতে কতগুলো সমর্থনমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে। সমর্থনমূলক কর্মসূচিগুলো নিম্নরূপ:-

- কর্মী উন্নয়নের জন্য ব্র্যাক প্রশিক্ষণ বিভাগ
- বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের কর্মসূচি
- চলমান কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পানার জন্য গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ
- প্রকাশনা ও অডিও ভিজুয়াল কর্মসূচি
- ব্র্যাক মানবাধিকার ও এডভোকেসি ইউনিট
- পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ও যোগাযোগ বিষয়ক কর্মসূচি
- নির্মাণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি
- আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ, ফাইন্যান্স ও একাউন্টস বিষয়ক কর্মসূচি
- বিশেষ প্রকল্প; যেমন- ব্র্যাক কমিউনিটি সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান; যথা- আড়ং, ব্র্যাক ডেইরী ও ফুড প্রকল্প, ব্র্যাক ব্যাংক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।[৬০০]

---

[৫৯৭] আনু মাহ্‌মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

[৫৯৮] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

[৫৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬

[৬০০] আনু মাহ্‌মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ এ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভ্যান্সমেন্ট (আশা)

বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত একটি সুপরিচিত বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) হলো এ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভ্যান্সমেন্ট (Association for Social Advancement) বা সংক্ষেপে আশা (ASA)। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ আত্মনির্ভরশীল ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালে কয়েকজন উন্নয়নকর্মীকে সাথে নিয়ে মোঃ সফিকুল হক চৌধুরী মানিকগঞ্জের টেপরা গ্রামে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্রদের সংগঠিত করে দারিদ্র্য মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে এ সংস্থাটি চালু করেন।[৬০১] এটি ১৯৭৮ সালে জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এণ্ড ফার্মস, বাংলাদেশ, ১৯৮২ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং ২০০৮ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি থেকে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করে।

আশা'র ভিশনঃ দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।

আশা'র মিশনঃ সমাজের দরিদ্র, অনগ্রসর ও প্রান্তিক শ্রেণির নারী ও পুরুষের আর্থিক ক্ষমতায়ন।

আশা'র লক্ষ্যঃ আর্থিক সেবা তথা ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

আশা'র উদ্দেশ্যঃ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা, নারীর ক্ষমতায়ন, পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ/আপদ-বিপদের ঝুঁকি মোকাবেলায় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, উদ্যোক্তা বিকাশে সহায়তা করা, নিজস্ব পুঁজি বিকাশে সহায়তা করা, আয়-ব্যয় হ্রাসে সহায়তা করা (বিশেষ করে স্বাস্থ্য খাতে) এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।[৬০২]

আশা'র সাংগঠনিক কাঠামো

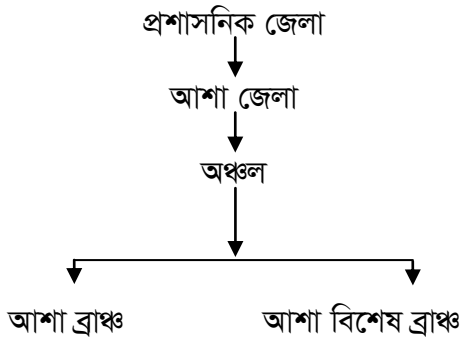

[৬০১] আশা, *নিউ ভিশন*, আশা এর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত, জানুয়ারি-জুন ২০১৮, পৃ. ৪

[৬০২] আশা, *আশা ম্যানুয়াল*, দশম সংস্করণ, আশা এর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত, ঢাকা-২০১৩, পৃ. ৩

আশা'র লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী: আশার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবেন,

- বাংলাদেশের অধিবাসী সেই সব প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ যারা বছরে ৬ মাস কায়িক শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন;
- প্রান্তিক ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষ;
- ছোট ও মাঝারি ব্যবসার সাথে জড়িত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা।[৬০৩]

আশার কার্যক্রম

একটি কল্যাণময় সমাজ গঠন করার জন্য আশা ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সামাজিক ও আইনি কার্যক্রমে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত আশা আয় বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সময় দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে স্বাস্থ্যের উন্নতি, পুষ্টি, শিক্ষা, স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৯৯২ থেকে এ পর্যন্ত সদস্যদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আশা একটি পূর্ণাঙ্গ ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প গ্রহণ করে। অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় আশা ২০০১ সাল থেকে দাতাসংস্থার দান গ্রহণ বন্ধ রেখেছে। ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত আশা তার কার্যক্রম এ দেশের ৬৪ জেলায় ৫১১ উপজেলায় এবং ৬৪৪৪৭ গ্রামে ২৯৫৯টি শাখার মাধ্যমে চালিয়ে যাচ্ছে।[৬০৪]

আশা'র কর্মসূচিসমূহ

- সঞ্চয় কর্মসূচি: এটি আশা'র একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে আশা'র লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী টাকা সঞ্চয় করতে শিখে।
    ১. নিয়মিত সপ্তাহিক/মাসিক সঞ্চয়
    ২. স্বেচ্ছা সঞ্চয়
    ৩. দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয়
- সদস্যদের ঋণ ও নিরাপত্তা কর্মসূচি
    ১. ঋণ ও বীমা কর্মসূচি
    ২. সদস্য নিরাপত্তা তহবিল
- স্বাস্থ্য সহায়তা কর্মসূচি
    ১. সদস্য চিকিৎসা সহায়তা অনুদান

[৬০৩] আশা, *আশা ম্যানুয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৬০৪] ASA, *Annual Report 2016-2017,* Pbulished by ASA, Dhaka, n.d., P. 45

২. কর্মী কল্যাণ তহবিল

৩. কর্মী পরিবার কল্যাণ তহবিল

- রেমিটেন্স কর্মসূচি
- প্রাথমিক শিক্ষা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য কর্মসূচি।[৬০৫]
- ফিজিওথেরাপি সেবা কর্মসূচি
- সেনিটেশন সেবা কর্মসূচি
- তথ্য অধিকার সেবা কর্মসূচি[৬০৬]
- আশার অর্থনৈতিক সেবা কর্মসূচি

আশা এর প্রধান কর্মসূচি হচ্ছে ঋণদান কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করা হয়। প্রাথমিক ঋণ : আশার ঋণের পরিমাণ প্রাথমিকভাবে ঋণ সর্বনিম্ন ৫০০০.০০ টাকা থেকে ৩৫০০০.০০ টাকা পর্যন্ত। মাঝারি ঋণের পরিমাণ ৫১ হাজার টাকা থেকে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। দফাভিত্তিক ঋণ ৫০ হাজার টাকা হতে ১ লক্ষ টাকা, এভাবে ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। আশা সাধারণত গরিব মহিলাদেরকে ঋণ প্রদান করে। সাধারণত: একটি গ্রুপে ১৫-৩০ জন সদস্য থাকে। আশা সদস্যদেরকে জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে থাকে। এখানে সদস্যদের নিবন্ধনের পর ঋণ পাওয়ার জন্য মাত্র ৭ দিন অপেক্ষা করতে হয় এবং প্রথম কিস্তি সার্ভিস চার্জসহ জমা রাখা হয়।

১. ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি (মহিলা)

এটা আশার অন্যতম একটা মৌলিক ঋণ কর্মসূচি। যেসব মহিলার ০.৫ একরের কম চাষযোগ্য জমি এবং মাসিক আয় ৫০০০ টাকার কম সাধারণত তারা এই ঋণ পাওয়ার যোগ্য হয়। গরিব মহিলারা ঋণের টাকা নিয়ে তাদের পছন্দ অনুসারে ধান ভানা, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন হস্তশিল্প ইত্যাদি কাজ করে থাকে। অবস্থানগত কারণে ঋণের পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে।

২. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান কর্মসূচি

এই কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ৫০,০০০ থেকে ৩০০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা যেন তারা

---

[৬০৫] আশা, *আশা ম্যানুয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৬০৬] আশা, *নিউ ভিশন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

তাদের ব্যবসায় উন্নতি করতে পারে এবং ছিন্নমূল দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। এই ঋণের মেয়াদ হলো ১ বছর, ১ বছর ৬ মাস ও ২ বছর।

৩. তথ্য প্রযুক্তি ঋণ

তথ্য প্রযুক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হওয়ায় এই খাতে বেকার যুবকরা আগ্রহী হয়ে উঠছে। তাই সার্বিক বিবেচনায় ২০০৬ সালে আশা বেকার যুবকদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য এই প্রকল্প চালু করে। এই ঋণের মেয়াদ হলো ১ বছর, ১ বছর ৬ মাস ও ২ বছর। ঋণ প্রদানের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১০০,০০০ টাকা।

৪. কৃষিনির্ভর ব্যবসা ঋণ

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির একটি দেশ, কিন্তু এ দেশের জিডিপিতে কৃষি মাত্র ১৫ শতাংশ অবদান রাখছে। কৃষি খাতে কোনো না কোনোভাবে এ দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ জড়িত রয়েছে। কৃষির উন্নয়নের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন প্রকল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি প্রকল্প, ক্ষুদ্র দুগ্ধ খামার, মৎস্য প্রকল্প, পাওয়ার টিলার স্কিম, মাশরুম চাষ প্রকল্প এবং কমলা চাষ সাহায্য প্রকল্পে ঋণ দেয়া হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে আশা এ সকল প্রকল্পে ২৯২,২৮৬ জন কৃষক এবং কৃষি উদ্যোক্তাকে ৩,৯৫৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে এবং সেই সাথে ১২,০০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।[৬০৭]

৫. স্বল্প মেয়াদী ঋণ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জরুরি প্রয়োজন মেটানো এবং প্রতিষ্ঠানের অলস টাকা সদ্ব্যবহারের জন্য ডিসেম্বর ২০০৬ সালে এই কর্মসূচি চালু করা হয়। এই ঋণের মেয়াদ হলো ৩ মাস। ঋণ প্রদানের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১০০,০০০ টাকা। এ ঋণের টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়।

৬. আশা সহজ ঋণ প্রকল্প

এই কর্মসূচিটি চরম দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত গ্রাহকদের জন্য বিশেষভাবে নেয়া হয়েছে। গ্রাহকরা বঞ্চিত অবহেলিত হওয়ায় ঋণের মেয়াদ ও ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি খুবই সহজ করা হয়েছে। সাধারণত: এনজিওর সব সদস্যকে প্রতি সপ্তাহে সঞ্চয় করতে হয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তাদের জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারে না। সেবামূলক সঞ্চয় ও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পের গ্রুপ সদস্যরা প্রয়োজনে তাদের সঞ্চয়কৃত টাকা উত্তোলন করতে পারে। বিভিন্ন

[৬০৭] ASA, *Annual Report 2016-2017,* ibid, P. 32

প্রকল্পের জন্য সঞ্চয়ের বিভিন্ন পরিমাণ রয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত সদস্যদেরকে প্রতি সপ্তাহে ১০ এবং ২০ টাকা করে জমা করতে হয়।[৬০৮]

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ প্রশিকা

বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রশিকা বৃহত্তম একটি সংস্থা। 'প্রশিকা' এর প্রথম অক্ষর 'প্র' এর পূর্ণরূপ হলো, প্রশিক্ষণ, 'শি' এর পূর্ণরূপ- শিক্ষা ও 'কা' এর পূর্ণরূপ- কাজ। প্রশিকা মানবিক উন্নয়নমূলক কেন্দ্র হিসেবে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সংস্থাটি বেসরকারি সাহায্য সংস্থা হিসেবে '১৮৬০ সালের সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইন' এর অধীনে এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত হয়। এই সংস্থাটি তাদের কার্যক্রম শুরু করার পর থেকে দরিদ্রদের উন্নয়নে বহুমুখী কাজ করে আসছে। মানব উন্নয়নকেন্দ্র "প্রশিকা" বাংলাদেশে একটি অন্যতম বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় কাজ শুরু করে পর্যায়ক্রমে দেশের প্রায় প্রতিটি এলাকাতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রশিকা পরিচালনার জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ, নির্বাহী পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটিই প্রশিকার সার্বিক নীতি নির্ধারণ করে থাকে। প্রশিকা দরিদ্রদের কার্যকর অংশগ্রহণ, লিঙ্গীয় সমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীল সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহুমুখী উন্নয়ন কৌশল পরিচালনা করছে।[৬০৯]

প্রশিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রশিকার লক্ষ্য হলো "দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি নিবিড় সম্প্রসারিত অংশগ্রহণমূলক স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা।" প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সমাজের দরিদ্র, অসুবিধাগ্রস্ত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যেই এ সংস্থা কাজ করে। নিচে প্রশিকার কর্মসূচিসমূহের উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরা হলো:-

১. কাঠামোগত দারিদ্র্য বিমোচন;

২. পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনঃউন্নয়ন;

৩. নারীর মর্যাদার উন্নয়ন;

৪. সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;

---

[৬০৮] আশা, *আশা ম্যানুয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৬০৯] আনু মাহ্মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

৫. গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার ও দায়িত্ব অর্জন ও প্রয়োগে জনগণের যোগ্যতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।[৬১০]

প্রশিকার কার্যক্রম

স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রশিকা বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা বিস্তার, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করছে। নিম্নে প্রশিকার কার্যক্রমসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

- **দরিদ্রদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তোলা**

  প্রশিকার অন্যতম প্রধান কর্মসূচি হলো ভূমিহীন, সুবিধাবঞ্চিত, ক্ষুদ্র কৃষক ও বস্তিবাসীদের সংগঠিত করে ২০-২৫ জন সদস্য নিয়ে প্রাথমিক দল বা সমিতি গঠন করা। এ সমিতির মাধ্যমে প্রশিকা ক্ষুদ্রঋণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও কারিগরি সহায়তা করে থাকে। এসব সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রশিকা গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, শহরে বস্তি, ওয়ার্ড ও এলাকাভিত্তিক গ্রুপ ফেডারেশন গঠন করে।

- **মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি**

  এ কর্মসূচির আওতায় দলের সদস্যদের দারিদ্র্যের কারণ বিশ্লেষণ, উৎপত্তি, প্রভাব, ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে এর থেকে মুক্তি লাভে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

- **সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচি**

  প্রশিকা সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে এই কর্মসূচি চালু করে। প্রশিকা বয়স্ক শিক্ষা, ৮-১০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে।

- **শহর দরিদ্র উন্নয়ন কর্মসূচি**

  মৌলিক চাহিদা হতে বঞ্চিত শহরের বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

---

[৬১০] সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশে এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

- **সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি**

  পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রশিকার রয়েছে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি। দরিদ্র সদস্যদের সামাজিক বনায়নের সুযোগ করে দিয়ে আয় বৃদ্ধিতে প্রশিকা সাহায্য করছে।

- **পরিবেশগত কৃষি কর্মসূচি**

  রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উর্বরতা হ্রাস ও পরিবেশের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য প্রশিকা বিকল্প পরিবেশ বান্ধব কৃষি কর্মসূচি চালু করেছে।

- **পশু সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি**

  স্বল্প পুঁজি ও স্বল্প সময় নিয়ে পশু পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের এ কর্মসূচি খুবই জনপ্রিয় কর্মসূচি। এ কারণে প্রশিকার এ কর্মসূচি দলীয় সদস্যদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

- **মৎস্য চাষ উন্নয়ন কর্মসূচি**

  মৎস্য চাষ উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র গরিব জেলে ও মৎস্য খামার চাষীরা আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখতে পারে।

- **কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি**

  কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়নের জন্য এ কর্মসূচিতে কম পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনের জন্য প্রশিকা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

- **গৃহায়ন কর্মসূচি**

  এ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে সাশ্রয়ী, স্থায়িত্বশীল ও পরিবেশ বান্ধব বিকল্প প্রযুক্তিতে প্রশিকা গৃহায়ন কর্মসূচি চালু করেছে।

- **স্বাস্থ্য অবকাঠামোগত গঠন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি**

  দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে রোগের প্রাদুর্ভাব ও সংক্রমণ হ্রাস করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ নিরাপদ পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা এ কর্মসূচির লক্ষ্য।[৬১১]

[৬১১] আনু মাহ্‌মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫-২৪৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান

সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য দেশে প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অল্প কিছু যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে। তারা ইসলামের নির্দেশিত বিধানের আলোকে যাকাতকে সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নে এবং সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন করে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রথম অনুচ্ছেদঃ সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) প্রতিষ্ঠানটি রহিম আফরোজ বাংলাদেশ লিমিটেডের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি মানবকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। মূলত এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ২১ মার্চ ১৯৯৩ সালে যাকাত ফোরাম নামে শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মূল ভিত্তি হলো কুর'আন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে যাকাত আদায় করে তা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচন করা। এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের ১২ বছর পর এটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের লক্ষ্যে পরিকল্পিত প্রকল্প শুরু করা হয়। ২০০৫ সালে ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জ জেলায় প্রায় ১০০ দরিদ্র পরিবারকে যাকাত দানের মাধ্যমে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে দেশি-বিদেশি ইসলামিক চিন্তাবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং যাকাত প্রদানকারীদের নিয়ে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) নামক প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।[৬১২] সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই একটি দরিদ্র বান্ধব মানবকল্যাণমূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সকলের কাছে যাকাতের তাৎপর্য তুলে ধরে যাকাত তহবিল সংগ্রহ করে, যা পরবর্তীতে শরী'আহ'র নির্দেশ মোতাবেক নিজস্ব উদ্ভাবিত কৌশল প্রয়োগ করে যোগ্য প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়।[৬১৩] এক্ষেত্রে তারা পরিকল্পিত তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে গ্রুপভিত্তিক ঘূর্ণায়মান তহবিল[৬১৪] গঠন করে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[৬১৫]

সিজেডএম এর ভিশনঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত বাধ্যতামূলক যাকাতের বিধান প্রচার ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

---

৬১২ Center for Zakat Management (CZM), *Annual Report 2014*, Published by Center for Zakat Management (CZM), Dhaka-2015, P. 9

৬১৩ ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবকল্যাণে যাকাত সিজেডএম-এর ব্যবস্থাপনা কৌশল*, সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম), তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০১৮, পৃ. ৩

৬১৪ দলগতভাবে ৬ লাখ টাকা সদস্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ করে পরবর্তীতে শুধু মূলধনের সমপরিমাণ অর্থ ফেরত দেয়। এই টাকাটি গ্রুপের সকল সদস্য একসাথে অথবা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করতে পারে।

৬১৫ ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবকল্যাণে যাকাত সিজেডএম-এর ব্যবস্থাপনা কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

সিজেডএম-এর প্রত্যাশা: ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক একটি সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা।[৬১৬]

সিজেডএম-এর উদ্দেশ্য

- ইসলামের বিধি-বিধান অনুসারে যথাযথ যাকাত আদায়ের বিষয়ে বিত্তবান মুসলমানদের মধ্যে সচেতনা সৃষ্টি করা;
- পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহর নির্দেশনার আলোকে যাকাত তহবিল সংগ্রহ করে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর বিতরণ ও সদ্ব্যবহার করা;
- যাকাতকে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম কার্যকর কর্মকৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
- যাকাত আদায়, বিরতণ ও সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্লাটফর্ম গড়ে তোলার জন্য কাজ করা।[৬১৭]

সিজেডএম কর্তৃক গৃহীত কর্মকৌশল

- সম্পদের সুষম বণ্টনের উদ্দেশ্যে যাকাত, সাদকা/অনুদানভিত্তিক তহবিল গড়ে তোলার জন্য সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ;
- যাকাত ও অনুদান ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সুফল লাভের জন্য সমন্বিত সুপরিকল্পিত কর্মকৌশল গ্রহণ;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা-সহ যাকাত সংগ্রহ, বিতরণ ও কার্যকরভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।[৬১৮]

সিজেডএম কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- **জীবিকা (জীবনমান বিকাশ কার্যক্রম)**

  জীবিকার উদ্দেশ্য: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচি।

  জীবিকার কর্মকৌশল: প্রাথমিক পর্যায়ে জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের মধ্য থেকে ২৫-৩০ জন যাকাত গ্রহণকারীকে নিয়ে এক একটি তৃণমূল সংগঠন গঠন করা হয়। এরপর এ সদস্যদের মধ্য থেকে একটি যৌথ ব্যাংক হিসাব খোলার পর উক্ত সদস্যদেরকে প্রাথমিকভাবে পরিবার প্রতি ২০,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়।

---

[৬১৬] Center for Zakat Management (CZM), *10 Years of CZM*, Published by Center for Zakat Management (CZM), Dhaka, P. 2

[৬১৭] Center for Zakat Management (CZM), *CZM Brochure*, Published by Center for Zakat Management (CZM), Dhaka, P. 4

[৬১৮] Center for Zakat Management (CZM), *Annual Report 2014*, ibid, P. 13

পাশাপাশি তাদেরকে একটি সঞ্চয় তহবিল গঠনে সহায়তা ও পরামর্শ দেয়া হয়।[৬১৯] এছাড়াও দলগত ব্যাংক হিসাবের ঘূর্ণায়মান তহবিলের ৬ লক্ষ টাকা থেকে তারা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগের জন্য গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে এই হিসাব থেকে গৃহীত মূলধন পরবর্তীতে উক্ত তহবিলে তারা ফেরত দেয়।[৬২০]

জীবিকার কার্যক্রম: দলের সদস্যরা পরামর্শের ভিত্তিতে নিজস্ব গ্রুপ তহবিল থেকে কোন সার্ভিস চার্জ ছাড়া ঋণ নিয়ে তা কোনো উপযুক্ত ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে উপার্জিত মুনাফা পরবর্তীতে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এছাড়াও সমন্বিত এ কর্মসূচির আওতায় সদস্যদেরকে স্বাস্থ্যসেবা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পানি, শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়। এভাবে সকলে সম্মিলিতভাবে একটি সৌহার্দ্যময় সমাজ গঠনে সচেষ্ট হয়।[৬২১] জীবিকা কার্যক্রম মূলত দরিদ্রদের দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্র্য বিমোচনের একটি প্রকল্প। যার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সাথে তাদেরকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মানবিক সাহায্য দেয়া হয়। এ পর্যন্ত ১২০০০ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় সাহায্য করা হয়েছে।[৬২২]

- **মুদারিব (ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি)**

মুদারিবের উদ্দেশ্য: এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।[৬২৩] এ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা, পরামর্শ দিয়ে সফল উদ্যোক্তা তৈরি করা।

মুদারিবের কর্মকৌশল: জীবিকা প্রকল্পের সদস্যদের মধ্য থেকে অধিকতর যোগ্য লোকদের বাছাই করা হয়। এরপর তাদের নিয়ে একটি উদ্যোক্তা গ্রুপ গঠন করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা ও পরামর্শ দেয়া হয়।

মুদারিবের কার্যক্রম: এ সকল উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ তহবিল দেয়ার মাধ্যমে গাভী পালন, গরু মোটা-তাজাকরণ, বাণিজ্যিক কৃষি-খামার, হাঁস-মুরগির খামার, কৃষি যন্ত্রপাতি ভাড়া, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদিতে সহযোগিতা করা হয়।[৬২৪]

---

[৬১৯] Hossain Zillur Rahman, *Poverty Graduation Through Zakat-Based Programs, Center for Zakat Management (CZM),* Published by Center for Zakat Management (CZM), Dhaka-2018, P. 25

[৬২০] ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবকল্যাণে যাকাত সিজেডএম-এর ব্যবস্থাপনা কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[৬২১] Center for Zakat Management (CZM), *CZM Brochure,* ibid, P. 7

[৬২২] Center for Zakat Management (CZM), *10 Years of CZM,* ibid, P. 17

[৬২৩] ibid, P. 20

[৬২৪] Center for Zakat Management (CZM), *CZM Brochure,* ibid, P. 8

- **নৈপুণ্য বিকাশ (দরিদ্র বেকার যুবকদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি)**

  নৈপুণ্য বিকাশের উদ্দেশ্য: সমাজের সুবিধাবঞ্চিত বেকার যুবক ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই কর্মসূচি।

  নৈপুণ্য বিকাশের কর্মকৌশল: আর্থিক সংকটের কারণে পড়ালেখা বন্ধ হওয়া কম শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত যুবক ও যুব মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া।

  নৈপুণ্য বিকাশের কার্যক্রম: সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট ঢাকা, ফরিদপুর ও ঠাকুরগাঁও তিনটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এই প্রকল্পের আওতায় পুঁজি সরবরাহ করা হয়।[৬২৫]

- **জিনিয়াস (স্নাতক পর্যায়ের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষর্থীদের জন্য বৃত্তি) কর্মসূচি**

  জিনিয়াসের উদ্দেশ্য: এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজগুলোতে অধ্যয়নরত অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাসিক ২৫০০-৩০০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করে পড়ালেখা ও যোগ্যতা বিকাশে সহায়তা করা।[৬২৬]

  জিনিয়াসের কর্মকৌশল: শিক্ষার্থীদের আর্থিক অবস্থা ও অন্যান্য ঝুঁকিগুলো বিবেচনায় রেখে সঠিকভাবে প্রার্থী বাছাই, তাদেরকে প্রয়োজন মতো আর্থিক সহায়তা করা এবং ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক কোর্স পরিচালনা ও কাউন্সেলিং করা।

  জিনিয়াসের কার্যক্রম: স্নাতক পর্যায়ে প্রথম দুই বছর বৃত্তি প্রদান করা, উপযুক্ত ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ও কাউন্সিলিং করা। এছাড়াও তাদের জীবনমান উন্নয়নে বাস্তবায়নাধীন সিজেডএম প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা ও মানবসেবায় উৎসাহিত করা।[৬২৭]

- **গুলবাগিচা (সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা ও পুষ্টি সহায়তা) কর্মসূচি**

  গুলবাগিচার উদ্দেশ্য: সুবিধাবঞ্চিত ও হতভাগ্য শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচি।

---

[৬২৫] Center for Zakat Management (CZM), *CZM Brochure*, ibid, P. 13

[৬২৬] ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবকল্যাণে যাকাত সিজেডএম-এর ব্যবস্থাপনা কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৬২৭] Center for Zakat Management (CZM), *CZM Brochure*, ibid, P. 11

গুলবাগিচার কর্মকৌশলঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষালাভের উপযোগী শিশুদেরকে নৈতিক ও শিশু-শিক্ষা প্রদান করে তাদের পুষ্টির অভাব পূরণের লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করা।

গুলবাগিচার কার্যক্রমঃ রাজধানী ঢাকাসহ দেশের পল্লী এলাকায় মানবেতর জীবনযাপনকারী ২৫-৩০ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণ ও পোশাক দিয়ে একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে একজন শিক্ষক শিক্ষাদান করেন। এছাড়া উক্ত শিশুদের পুষ্টির অভাব পূরণের জন্য খাবার দেয়া হয়। পাশাপাশি শিশুদের অভিভাকদেরকে নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সচেতনতা বৃদ্ধির পরামর্শ দেয়া হয়।[৬২৮]

- **ফেরদৌসি (দুঃস্থ নারী ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা) কর্মসূচি**

ফেরদৌসির উদ্দেশ্যঃ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা লাভ করা প্রতিটি মানুষের অন্যতম একটি মৌলিক অধিকার। এই মৌলিক অধিকার প্রদান করার লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিতদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

ফেরদৌসির কর্মকৌশলঃ অবহেলিত নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বিনামূল্যে বা স্বল্প খরচে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি পয়ঃনিষ্কাশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ফেরদৌসির কার্যক্রমঃ ফেরদৌসি কার্যক্রমটি মহিলা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য চালু করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পেশাদার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-সহকারী নিয়োগ করে মানসম্মত সেবা প্রদান করা। বিশেষ করে গর্ভবতী মা ও বুকের দুগ্ধ প্রদানকারী দরিদ্র মহিলা এবং শিশুদেরকে চিকিৎসা সেবা অগ্রাধিকার দেয়া। এছাড়াও বিশুদ্ধ খাবার পানির নিশ্চয়তার জন্য নলকূপ স্থাপন ও নিরাপদ টয়লেটের ব্যবস্থা করা।[৬২৯]

- **ইনসানিয়াত (জরুরি মানবিক সহায়তা) কর্মসূচি**

ইনসানিয়াত-এর উদ্দেশ্যঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রোগ-শোকসহ নানাবিধ আকস্মিক বিপদ-আপদে আক্রান্তদের সহায়তার লক্ষ্যে ইনসানিয়াত কর্মসূচি।

ইনসানিয়াত-এর কর্মকৌশলঃ এ কর্মসূচির আওতায় বিপদগ্রস্ত মানুষকে জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা, পুনর্বাসন ও ঋণ পরিশোধে সহায়তা করাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে আর্থিক বরাদ্দ দেয়া হয়।

---

[৬২৮] Center for Zakat Management (CZM), *CZM Brochure,* ibid, P. 12

[৬২৯] ibid, P. 9

ইনসানিয়াত-এর কার্যক্রম: ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে সহায়তা করা, অসচ্ছল ও জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীকে সুচিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালে প্রেরণ করা, শিশুদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুনর্বাসন সহায়তা করা, ঝুঁকি দূরীকরণে সহায়তা করাসহ বিভিন্ন খাতে যাকাতের অর্থ বিতরণ করা হয়।[৬৩০] এছাড়াও বৃদ্ধ, পঙ্গু-প্রতিবন্ধী, এতিম, বিধবা ইত্যাদি অসহায় দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় শীতবস্ত্র, কুরবানীর গোশত বিতরণও অন্যতম। আর বধির শিশুদের জন্য হিয়ারিং এইড, তালু ও ঠোঁট কাটা অপারেশন, চক্ষু অপারেশনসহ এরকম বিভিন্ন রোগে আক্রান্তদের সহায়তা করা হয়।[৬৩১]

- **দাওয়াহ: সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি**

উদ্দেশ্য: দাওয়াহ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হলো যাকাত ও ইসলামের অন্যান্য মৌলিক ইবাদাত সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং যাকাতের হিসাব সঠিকভাবে নিরূপণ করে শরী'আহ সম্মতভাবে সুষ্ঠু পদ্ধতিতে বিতরণের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা, যাতে যাকাত দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারে।

কর্মকৌশল: যাকাতের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে আধুনিক সব মাধ্যম ব্যবহার করে প্রচারণা চালানো।

কার্যক্রম: দাওয়াহ কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে যাকাত ফেয়ার, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, কর্পোরেট মিটিং ইত্যাদি আয়োজন করা। এছাড়াও চিঠি ও ই-মেইল বার্তা, ওয়েবসাইট, লিফলেট, বিলবোর্ড, টিভি ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে যাকাত সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা।[৬৩২]

---

[৬৩০] Center for Zakat Management (CZM), *CZM Brochure*, ibid, P. 10

[৬৩১] ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবকল্যাণে যাকাত সিজেডএম-এর ব্যবস্থাপনা কৌশল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৬৩২] Center for Zakat Management (CZM), *CZM Brochure*, ibid, P. 14

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিত ও বেকারদের উন্নয়নে ব্যাংক

সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এনজিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অনেক ব্যাংকও বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাংকের কার্যক্রমের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো:-

প্রথম অনুচ্ছেদঃ কর্মসংস্থান ব্যাংক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পেশায় দেশের বেকার যুবকদেরকে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে 'কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮' (১৯৯৮ সনের ৭নং আইন) দ্বারা কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এবং ৬ মে ১৯৯৮ তথা ২৩ বৈশাখ ১৪০৫ তারিখে উক্ত আদেশটি গেজেট আকারে প্রকাশ করে।[৬৩৩] কর্মসংস্থান ব্যাংক একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সরকার ৩০ জুন, ১৯৯৮ মোতাবেক ১৬ আষাঢ়, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ তারিখে 'কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন' পাস করে। এরপর ২২ সেপ্টেম্বের ১৯৯৮ তারিখে ব্যাংকের প্রধান শাখা হতে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে এই ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করে।[৬৩৪] ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ৪টি মহাবিভাগ ও ১২টি বিভাগের মাধ্যমে ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট ২৩৭ শাখার মধ্যে জেলা পর্যায়ে ৬৪ এবং উপজেলা পর্যায়ে ১৭৩টি শাখা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[৬৩৫] ব্যাংক সহজ শর্তে স্বল্প ও সরল সুদে উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তা প্রদান করে। ঋণের মেয়াদের মধ্যে উদ্যোক্তার অকাল মৃত্যুতে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক মৃত্যু ঝুঁকি স্কীমের আওতায় মৃত্যু পরবর্তী ঋণের দায় হতে ঋণগ্রহীতার উত্তরাধিকারদের অব্যাহতি প্রদান করে। ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্যাংক ৩৭৭ জন ঋণগ্রহীতার ২.৯৭ কোটি টাকা মৃত্যু পরবর্তী ঋণের দায় সমন্বয় করেছে। বেকার যুবকদের সহায়তা করার জন্য এই ব্যাংক সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ব্যাংক বেকার যুবকদের মাঝে ৬২১.৯৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। শুরু থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যাংক মোট ৪,৬৬,৮০৭ জন উদ্যোক্তাকে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মোট ১৬,৮৫,১৭৩ জনের কর্মসংস্থান করেছে।[৬৩৬]

ব্যাংকের ভিশনঃ দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ।

---

[৬৩৩] কর্মসংস্থান ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭*, কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, তা.বি., পৃ. ১২

[৬৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[৬৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[৬৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

ব্যাংকের মিশন

- সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা;
- ঋণগ্রহীতাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা;
- যুবকদের মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণপূর্বক আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- ঋণগ্রহীতাদের ব্যবস্থাপনা, বিপণন, কারিগরী ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে কম খরচে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কোনো দাতা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ অথবা অনুদান গ্রহণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সঞ্চয় সংগ্রহ;
- ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে এজেন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনাপূর্বক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)-এর পরিধি বিস্তৃতকরণ;
- দেশে কর্মসংস্থান, বিশেষ করে আত্ম-কর্মসংস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ করা;
- দেশের সকল অঞ্চলে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় শাখা খোলা;
- দেশের অভ্যন্তরে অর্থ এবং সিকিউরিটিজ গ্রহণ, সংগ্রহ, প্রেরণ ও পরিশোধ করে অর্থনীতিতে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন এবং এক্সেস-টু-ইনফরমেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকের যাবতীয় কাজ কম্পিউটারাইজেশন এর আওতায় আনা;
- বেকারদের প্রশিক্ষণ, কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও পরিচালনা;
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণসহ কুটিরশিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে বেকার যুব সমাজকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা;
- সকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।[৬৩৭]

[৬৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

ব্যাংকের বর্তমান কার্যক্রম

বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে অথবা জামানত ব্যতীত সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করে। এছাড়াও সরকারের বিশেষ কর্মসূচির আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে "ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প" "শিল্প কল-কারখানার স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি", অর্থ-মন্ত্রণালয়ের অধীনে "কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি" এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের "মৎস্য ও প্রাণিজ সম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচি" ও "দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম"-এ ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[৬৩৮]

ব্যাংকের ঋণ কর্মসূচিসমূহ

ক) নিজস্ব কর্মসূচি: দেশের বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কর্মসূচি;

খ) ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ কর্মসূচি: দেশের বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ কর্মসূচি;

গ) বিদেশের কর্মসংস্থানে ঋণ কর্মসূচি: বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিদেশ গমনেচ্ছুক বেকার যুবকদের মাঝে ঋণ প্রদান কর্মসূচি;

ঘ) সরকারের বিশেষ কর্মসূচি: ১) কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ প্রদান কর্মসূচি; ২) শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা-অবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মসংস্থানে জামানত ব্যতীত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কর্মসূচি; ৩) বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনকল্পে ঋণ প্রদান কর্মসূচি।

ঋণের খাতসমূহ

- মৎস্য সম্পদ: কর্প জাতীয় মাছ চাষ, পাঙ্গাস ও চিংড়ি চাষ, রেনু পোনা উৎপাদন (পুকুরে), মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ, মিশ্র মাছ চাষ, থাই কৈ মাছ চাষ।
- প্রাণি সম্পদ: দুগ্ধ খামার, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল/ভেড়া/মহিষ পালন, ব্রয়লার মুরগির খামার, লেয়ার মুরগির খামার।
- শিল্প কারখানা: মাছ হ্যাচারি, পোল্ট্রি হ্যাচারি, প্রাণি খাদ্য তৈরির কারখানা, মাছ খাদ্য তৈরির কারখানা, চিড়া/মুড়ি কল/শিল্প, ধানের চাতাল/রাইস মিল/বেকারি শিল্প, অয়েল মিল, স'মিল, ফলজাত খাদ্য শিল্প (জ্যাম, জেলি, জুস, আচার শরবত, সিরাপ, সস),

[৬৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, গুড়া মসলা উৎপাদনের শিল্প, সুগন্ধি চাল উৎপাদনকরণ, ডাল প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা, সুষম সার প্রস্তুত শিল্প, আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ, ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যার, স্টার্চ, গ্লুকোজ উৎপাদনের শিল্প, চামড়া শিল্প।

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: রেশম বস্ত্র উৎপাদনের শিল্প, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি, মোমবাতি/আগরবাতি/গোলাপজল/দাঁতের মাজন/কয়েল তৈরি, বাঁশ ও বেত শিল্প, যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা, ক্ষুদ্র প্রিন্টিং এবং সাইনবোর্ড তৈরি, চামড়াজাত শিল্প, শুটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণ, মৃৎ শিল্প, কামারের কাজ, ব্লক-বাটিক প্রিন্টিং, গ্রামীণ, স্যানিটারি-ল্যাট্রিন তৈরি, তাঁত শিল্প, কাঠের/স্টিলের আসবাবপত্র তৈরি, আইসক্রিম/বরফকল।

- অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রকল্প: ফল চাষ, মৌমাছি চাষ, নকশিকাঁথা তৈরি, পান বরজ, মাশরুম চাষ, সবজি চাষ, সেরিকালচার (রেশম চাষ), নার্সারি ফল চাষ।

- সেবা খাত: শিক্ষা সেবা (কোচিং সেন্টার/ কিন্ডার গার্টেন), ক্যাবল অপারেটরস, জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ, কমিউনিটি সেন্টার, বিনোদন পার্ক, আবাসিক হোটেল, পর্যটন কটেজ, সোলার পাওয়ার, সাইবার ক্যাফে, সেলুন/লন্ড্রি, বিউটি পার্লার এবং হারবাল ট্রিটমেন্ট, পাওয়ার টিলার, কম্পিউটার সেবা, ফটোকপি সেবা, টিভি/বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/মোবাইল ফোন মেরামত, গ্রামীণ যানবাহন, সেলাই মেশিন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং/গাড়ি মেরামত ওর্য়াকশপ, ডায়াগনস্টিক সেন্টার/ক্লিনিক/দন্ত চিকিৎসা ও স্টুডিও।

- বাণিজ্যিক খাত: ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, ঔষধ ব্যবসা, শুঁটকি ব্যবসা, পাথর উত্তোলন ও বিক্রয়, বালি ক্রয়/বিক্রয় ব্যবসা, পুরাতন লোহালক্কর (স্ক্রেপ/ভাঙারি) ব্যবসা, জুতার ব্যবসা, ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়, হার্ডওয়ার ব্যবসা, হোটেল/রেষ্টুরেন্ট ব্যবসা, আসবাবপত্র বিক্রয়, মুদি/মনোহারী, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, কাপড়ের ব্যবসা/তৈরি পোশাক ব্যবসা, প্রাণি খাদ্য/মৎস্য খাদ্য বিক্রয়, ধান/চাল/অন্যান্য কৃষি পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, সার/বীজ/কীটনাশক ব্যবসা, পার্টসের দোকান, ইলেকট্রিক সামগ্রী, অন্যান্য ব্যবসা/ বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা।[৬৩৯]

---

[৬৩৯] কর্মসংস্থান ব্যাংক, *কর্মসংস্থান ব্যাংকের সিটিজেন চার্টার (KAF-0077)*, কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, তা.বি. পৃ. ৫

ঋণের সীমা

কর্মসংস্থান ব্যাংক বিভিন্ন পরিমাণ টাকা ঋণ বিতরণ করে। এক্ষেত্রে তারা ১০০,০০০.০০ (এক লক্ষ টাকা) পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করে। ১০০,০০০.০০ (এক লক্ষ টাকা)-এর অধিক হলে জামানত প্রয়োজন।[৬৪০]

বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

কর্মসংস্থান ব্যাংক নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিশেষ কর্মসূচিসমূহের আওতায় ব্যাংক ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:[৬৪১]

- শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত/চাকরিচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি: সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় উল্লিখিত কর্মসূচির বিপরীতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৩৮৪ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ২.১৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

- বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন প্রকল্প: United States Agency for International Development (USAID)-এর সহায়তায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় এবং এর বরাদ্দকৃত তহবিল প্রদান করা হয় ৩.৬৫ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৪.১২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি: বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তার অধীনে উল্লেখিত কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৩৪১৮ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৭.৩৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম: বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের অধীন উল্লিখিত কর্মসূচির ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৬০৪ জন ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৭.৩৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

- সুদের হার: অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কর্মসংস্থান ব্যাংক কম সুদে ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যাংক উৎপাদনমুখী, বাণিজ্যিক ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বার্ষিক ৫ শতাংশ হতে ১৩ শতাংশ পর্যন্ত সুদে ঋণ প্রদান করে।[৬৪২]

---

[৬৪০] কর্মসংস্থান ব্যাংক, *কর্মসংস্থান ব্যাংকের সিটিজেন চার্টার (KAF-0077)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৬৪১] কর্মসংস্থান ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[৬৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

এ ব্যাংক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ঋণ সহায়তার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যথাক্রমে ৪৬৬,৮০৭ জন ও ১,২১৮,৩৬৬ জন মোট ১,৬৮৫,১৭৩ জনের কর্মসংস্থান করেছে। জানুয়ারি ৩০, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যাংকে মোট ১৩৯০ জন জনবল রয়েছে।[৬৪৩] এই ব্যাংক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট ৫০৯৭২ জন ঋণগ্রহীতার মাঝে ৬২১.৯৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।[৬৪৪]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কৃষি প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশ আবহমানকাল থেকে কৃষি প্রধান অর্থনীতির একটি দেশ। এদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদান প্রায় ১৫ শতাংশ (২০০৫-০৬ অর্থবছরে স্থির মূল্য)। দেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ প্রত্যক্ষভাবে এবং জনসাধারণের প্রায় ৮৫ শতাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে কৃষির সাথে জড়িত রয়েছে। খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি পুষ্টি সমস্যা সমাধান, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি, দেশের অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদান বৃদ্ধিতে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষি খাতের উন্নয়ন আবশ্যক।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিক ও উন্নত করা প্রয়োজন। কৃষিব্যবস্থাকে উন্নত করা গেলে দেশের প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষির ক্ষেত্রে যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে কৃষির যে ধারাবাহিক উন্নয়ন হচ্ছে তার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দারিদ্র্য বিমোচন কিছুটা সহজতর হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে কৃষিব্যবস্থাকে প্রযুক্তিগত ও কারিগরি ক্ষেত্রে আরো উন্নত করা প্রয়োজন। কৃষি খাতকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে।[৬৪৫]

প্রান্তিক এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে ২০৪০০ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এ নীতিমালার আওতায় পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ০৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ০২টি ব্যাংক, ৩৯টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ০৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে মোট ২১৩৯৩.৫৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে। ঋণ বিতরণের এ পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৬-২০১৭) তুলনায় ৩৯৪.৮৫ কোটি টাকা বেশি। এছাড়াও Bangladesh Rural Development (BRDB) কর্তৃক ২০১৭-২০১৮

---

[৬৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৬৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

[৬৪৫] বাংলাদেশ ব্যাংক, *২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতমালা ও কর্মসূচি*, বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, তা.বি., পৃ. ৯

অর্থবছরে ৯৬১.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে কয়েকটি ব্যাংক ইতোমধ্যে আলাদা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিভাগ বা উপবিভাগ গঠন করে দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।[৬৪৬]

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে মোট ৩৯৬২৫০৮ জন কৃষক কৃষি ও পল্লী ঋণ পেয়েছেন। যার মধ্যে ব্যাংকের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ও Micro Finance Institutions (MFI) এর মাধ্যমে ১৫৭৬১৩৭ জন নারী বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ৬৩০৯.৫৮ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৩০৭৩১৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ১৫,৯০২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন। এই অর্থবছরে চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকার ৮,৩৩৯ জন কৃষকের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ৩০.৪৭ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিরতণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসহ অন্যান্য তফসিলী ব্যাংকগুলোতে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ৯২.২২ লক্ষ হিসাব খোলা হয়।[৬৪৭] কৃষি ও পল্লী ঋণের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে ব্যাংকসমূহ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২১৮০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।[৬৪৮]

- কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত খাত/উপ-খাতসমূহ নিম্নরূপ

  ক) শস্য/ফসল;

  খ) মৎস্য সম্পদ;

  গ) প্রাণি সম্পদ;

  ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি

  ঙ) সেচ যন্ত্রপাতি

  চ) বীজ উৎপাদন;

  ছ) শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ (শুধু নিজস্ব উৎপাদিত ফসল গুদামজাত ও বাজারজাতকরণ);

  জ) দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসকারী কর্মকাণ্ড (পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় উৎসকারী কর্মকাণ্ডে প্রদত্ত ঋণ);

  ঝ) অন্যান্য (ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত হয়নি এমন অপ্রচলিত ফসল চাষ/কৃষিতে প্রদত্ত ঋণ)।[৬৪৯]

---

[৬৪৬] বাংলাদেশ ব্যাংক, *২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতমালা ও কর্মসূচি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৬৪৭] প্রাগুক্ত

[৬৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৬৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের নির্ধারিত যে লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয়েছে নিম্নে তা দেয়া হলো: রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি ব্যাংক থেকে মোট ৬,৬৮০ কোটি টাকা। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড থেকে মোট ৩১৯৫ কোটি টাকা। বিদেশি ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টাড, ব্যাংক আল-ফালাহ, কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন, সিটি ব্যাংক, এন এ, হাবিব ব্যাংক, এইচএসবিসি, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ও উরি ব্যাংক মোট ৫৮১ কোটি টাকা। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, এবি, আল-আরাফাহ্ ইসলামী, ব্যাংক এশিয়া, বাংলাদেশ কমার্স, ব্রাক, ঢাকা, ডাচ্-বাংলা, ইস্টার্ন, এক্সিম, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী, আইএফআইসি, ইসলামী, যমুনা, মার্কেন্টাইল, মিউচুয়াল ট্রাস্ট, ন্যাশনাল, এনসিসি, ওয়ান, প্রাইম, প্রিমিয়ার, পুবালী, শাহজালাল, সোস্যাল ইসলামী, সাউথইস্ট, স্টান্ডার্ড, দি সিটি, ট্রাস্ট, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল, উত্তরা, ইউনিয়ন, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচারাল এন্ড কমার্স, এনআরবি কমার্সিয়াল, মেঘনা, মিডল্যান্ড, এনআরবি, মধুমতি, এনআরবি গ্লোবাল এবং সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড থেকে মোট ১১৩৪৪ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২১৮০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৬৫০]

[৬৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প

সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সেই সাথে কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাথে সাথে ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। নিম্নে তাদের পরিচয় ও কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো:-

প্রথম অনুচ্ছেদঃ গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংক একটি ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংকের আগে সম্ভবত পৃথিবীতে কোথাও ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক কোনো ব্যাংক ছিল না। এই ব্যাংকই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্রঋণের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংক এবং এই ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মাদ ইউনূস গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক ধারণার উদ্ভাবন করেন। তিনি শুরুতেই ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটবর্তী জেবরা গ্রামের ভূমিহীনদের উপর গবেষণা করে উপলব্ধি করেন যে, গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের ক্ষুদ্র পুঁজি যোগান দিলে তারা স্বাবলম্বী হতে পারে। এর প্রেক্ষাপটে তিনি সেই সময় উক্ত গ্রামে ৮৫৬ টাকা ঋণ দিয়ে এই প্রকল্প শুরু করেন। তিনি পুঁজি গঠনের জন্য দরিদ্র কৃষকদের ঋণদান ও তাদের উৎপাদনব্যবস্থা পরীক্ষা করে গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প নামে একটি পাইলট প্রকল্প চালু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের শর্তযুক্ত সহযোগিতায় ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে টাঙ্গাইলে প্রায় ৫শত জন ভূমিহীনদের মাঝে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে এই প্রকল্পের গ্রাহক ২৮ হাজারে উপনীত হয় এবং যার মধ্যে ১১ হাজারই মহিলা।[৬৫১] এর পরিপ্রেক্ষিতে বেশি বেশি ঋণ বিতরণের ফলে টাকার প্রয়োজন হওয়ায় বিভিন্ন প্রচেষ্টার ফলে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ঋণের টাকার সংস্থান হয় এবং ১৯৮২ সালে ৫টি জেলায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প বিস্তৃত হয়।[৬৫২] এসবের প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সহায়তায় সরকার ও গ্রামীণ ব্যাংক গ্রাহকদের মাঝে ৬০:৪০ আনুপাতিক হারে ব্যাংক মালিকানা নির্ধারণ করে 'গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ' জারি করে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশেষ অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৬৫৩] এরপর ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ সংশোধন করে সরকার ও ব্যাংক গ্রাহকদের মালিকানা ২৫:৭৫ আনুপাতিক হারে ব্যাংক মালিকানা নির্ধারিত হয়।[৬৫৪] বর্তমানে

---

[৬৫১] মুহাম্মাদ ইউনূস, *গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন*, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা-২০০৪, পৃ. ১৩১

[৬৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

[৬৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

[৬৫৪] আনু মাহ্মুদ, এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের শেয়ার হলো ৯৫ শতাংশ এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ শেয়ার হলো সরকারের।[৬৫৫]

গ্রামীণ ব্যাংক একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এর মধ্যে ড. মুঃ আঃ হামিদ এর মতে, "গ্রামীণ ব্যাংক মূলত দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান।"[৬৫৬] জনাব মুহাম্মাদ নূরুল আমিন এর মতে, "গ্রামীণ ব্যাংক হচেছ পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত ভূমিহীন বিশেষ করে মহিলাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত একটি বিশেষ ব্যাংক।"[৬৫৭] জনাব আতিকুর রহমান এর মতে, "গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে পল্লীর ভূমিহীন দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নীকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর লক্ষ্য হলো বিনা জামানতে গরিবদের কাছে ব্যাংকের ঋণ সুবিধা এনে দেয়া যাতে তারা মহাজনের অর্থনৈতিক অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এবং নিজেদের আয়ের পথ নিজেরা বের করতে পারেন।"[৬৫৮] ডঃ অতিউর রহমান এর মতে "দারিদ্র্য দূর করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। দরিদ্রদের যদি চলতি মূলধন দেয়া যায় তাহলে সেটি কাজে লাগিয়ে তারা আত্মনিয়োজিত থাকতে পারবে এবং বাইরের সাহায্য ছাড়াই উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে– এ ধারণা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ ব্যাংকের সৃষ্টি।"[৬৫৯] আর ড. মুহাম্মাদ ইউনুস এর মতে, "গ্রামীণ ব্যাংক হলো গ্রামীণ ভূমিহীনদের জন্য, ভূমিহীনদের নিয়ে এবং ভূমিহীনদের মালিকানায় বা পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান।"[৬৬০]

গ্রামীণ ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

১. গ্রামীণ ব্যাংক শুধু গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্রদের মধ্যে ঋণ প্রদান করে। ভূমিহীন বলতে তাদেরকেই বোঝায়, যাদের আধা একর জমি বা এক একরের সমান সম্পদ নেই। যে পরিবারের আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৫০ শতাংশের কম সে পরিবারের সদস্যরাই ভূমিহীন বলে গণ্য হবে।

২. গ্রামীণ ব্যাংক সব ধরনের আয় উৎপাদনমুখী কাজে ঋণ দিয়ে থাকে।

৩. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় অবশ্যই তিনজন মহিলাকর্মী থাকতে হবে।

৪. ঋণ পাওয়ার জন্য কমপক্ষে পাঁচজনের দল গঠন করতে হয়।

---

৬৫৫ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *স্বোচ্ছাসেবিতা ও বাংলাদেশের এনজিও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৬৫৬ ড. মুঃ আঃ হামিদ, *পল্লী উন্নয়ন বাংলাদেশ*, মুহাম্মাদ ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১৯৮৮, পৃ. ১৭৩

৬৫৭ মুহাম্মাদ নূরুল আমিন, *গ্রামীণ ব্যাংক ঃ একটি পর্যালোচনা*, সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৭, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-২০০৭, পৃ. ৩২

৬৫৮ আতিকুর রহমান, *বাংলাদেশে এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, অনার্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ১১৬

৬৫৯ ড. আতিউর রহমান, *"সমাজের গভীরে মুক্তি পিয়াসী আলোড়ন-গ্রামীণ ব্যাংকের এক দশক"*, সাপ্তাহিক অর্থনীতি, ২য় বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ঢাকা-১৯৮৭

৬৬০ Muhamad Younus, *Grameen Bank at a Glance,* Grameen Bank Book, Dhaka-2004, P. 1

৫. ঋণ পরিশোধে শুধু ঋণগ্রহীতা দায়ী থাকে না দলের অন্য সদস্যরাও দায়ী থাকে।

৬. ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাদের ব্যাংকের কাছে যাওয়া লাগে না।

৭. গ্রামীণ ব্যাংকের দলীয় সঞ্চয় আছে, সেখানে প্রতি সপ্তাহে ১ টাকা চাঁদা দিতে হয়।

৮. পুরুষ ও মহিলা নিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক কাজ করে।

৯. ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতারাই ব্যাংকের মালিকও।

১০. ঋণ প্রদান করে গ্রামীণ ব্যাংক পূর্ণ তদারকি করে।

১১. একটি ঋণ শোধ হয়ে গেলে পরবর্তী ঋণের জন্য কোন ঝামেলা বা সময় লাগে না।

১২. গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য হওয়ার জন্য পড়ালেখা সংক্রান্ত কোনো শর্ত নেই।

১৩. বীমা সুবিধা হিসেবে ব্যাংক ভূমিহীনদের জন্য একটি জরুরি ফান্ড সৃষ্টি করে।

১৪. গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ পেতে কোন জামানতের প্রয়োজন হয় না।

১৫. ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে শুধু ঋণগ্রহীতাই নয়, দলের সকল সদস্য যৌথভাবে দায়ী থাকেন।[৬৬১]

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মাদ ইউনূস বলেন, "Grameen Banks objective is to bring financial services to the poor, particularly and the poorest to help them fight poverty, stay profitale and financially sound. It is a composite objective, coming out of social and economic vision."[৬৬২] এছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংকের বিশেষ কিছু অবদান রয়েছে যা নিম্নে দেয়া হলো:-

১. গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্রদেরকে গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ হার সুদে ঋণ নেয়া থেকে বিরত রেখে তাদেরকে শোষণমুক্ত হওয়ার জন্য কাজ করে।

২. অব্যবহৃত মানবসম্পদকে স্বনিয়োজিত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে।

৩. বেকার ও পরনির্ভরশীলদেরকে দক্ষতা অনুযায়ী লাভজনক কাজে নিয়োজিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

৪. ব্যাংকিং সুবিধা নারী-পুরুষদের মধ্যে বৃদ্ধি করে।

৫. মূলধন অভাবীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাজ করে।

৬. দরিদ্র শ্রেণিদের শ্রমের সঠিক মূল্য প্রদানে গ্রামীণ ব্যাংক ব্যবস্থা করে।

---

[৬৬১] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *স্বেচ্ছাসেবিতা ও বাংলাদেশের এনজিও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬-১০৭

[৬৬২] Muhamad Younus, *Grameen Bank at a Glance*, ibid, P. 30

৭. দরিদ্র ভূমিহীনদের জীবনমানের উন্নয়নে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলে।

৮. ধনিক শ্রেণি ও মহাজনদের কবল থেকে গ্রামীণ নিঃস্ব ও ভূমিহীনদের রক্ষা করে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ড. ইউনূস ব্যাংকের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কর্মপন্থা উদ্ভাবন করেন যা নিম্নরূপ:-

- **গ্রুপ গঠনের নিয়মাবলী:** ৫ জন সদস্য মিলে একটি গ্রুপ গঠিত হয়। এক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা হলো–

  ক) যেসব ব্যক্তি এর আওতাভুক্ত হবে তারা ভূমিহীন এবং তারা ৫ শতাংশের বেশি জমির মালিক হবে না।

  খ) সম-অর্থনৈতিক শ্রেণির সদস্যদের সমন্বয়ে এক একটি গ্রুপ তৈরি করা হয়।

  গ) মহিলা ও পুরুষদের আলাদা আলাদা গ্রুপ তৈরি করা হয়।

  ঘ) গ্রুপ সদস্যদের মধ্য থেকে ১ জন চেয়ারম্যান ও ১ জন সেক্রেটারি নির্বাচন করতে হয়। এদের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যাংক এবং দলের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন, ঋণ আনয়নে সহায়তা দান, ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না তা তদারকি করা।

- **ঋণের ব্যবহার ও কিস্তি পরিশোধের নিয়মাবলী:** এক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা হলো-

  ক) সদস্যরা যে প্রকল্পের জন্য ঋণ গ্রহণ করে থাকে তা ১ সপ্তাহের মধ্যে ব্যবহার করতেই হবে।

  খ) ঋণের কিস্তি সাপ্তাহিক হারে পরিশোধ করতে হবে।

  গ) যদি গ্রুপের সদস্যরা কেউ ব্যাংকের নিয়মাবলী ভঙ্গ করে তা হলে গ্রুপ সদস্যদের সাথে আলোচনাপূর্বক তার উপর জরিমানা ধার্য করা বা গ্রুপ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

  ঘ) ঋণকৃত টাকা থেকে যে টাকা আয় করবে ঋণ পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত সেই টাকার মালিক ব্যাংক হবে।

- কেন্দ্র গঠনের ক্ষেত্রে পালনকৃত নিয়মাবলী: এক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তা হলো-

  ক) ছয়টি দলের সমন্বয়ে (৫ x ৬ = ৩০ জনের) একটি কেন্দ্র গঠন করা হয়। চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে একজন করে কেন্দ্র প্রধান এবং সহকারী কেন্দ্র প্রধান মনোনীত করা হয়।

  খ) এ কেন্দ্র প্রধানগণ সাপ্তাহিক সভা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন।

গ) কেন্দ্র প্রধানগণের দায়িত্ব ঋণ প্রদান, ঋণ আদায় (কিস্তি পরিশোধ) এবং সঞ্চয় আদায় করা। সাপ্তাহিক বৈঠকের মাধ্যমে এটি নির্ধারিত হবে।

ঘ) যদি কেন্দ্র প্রধানগণ দেড় মাস কোনো সাপ্তাহিক বৈঠক পরিচালনা না করেন অথবা দশ সপ্তাহের মধ্যে কোনো যোগাযোগ না রাখেন তবে ঐ কেন্দ্র প্রধানকে বাদ দিয়ে নতুন কেন্দ্র প্রধান নির্বাচিত করা হয়।[৬৬৩]

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলী

গ্রামীণ ব্যাংক জন্মলগ্ন থেকে গ্রামীণ সুবিধাবঞ্চিত ভূমিহীন ও দরিদ্র লোকদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য সহজ শর্তে ঋণ দানের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন, মৎস্য চাষ, কুটির শিল্প, গ্রামীণ যানবাহন, কৃষিকাজ, গ্রামীণ শিল্পখাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে পল্লীবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ ব্যাংক বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে তার যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে। কমপক্ষে দুটি ইউনিয়ন নিয়ে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপন করা হয়। প্রতিটি শাখার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ১ জন করে ম্যানেজার, ৩ জন মহিলা ও ৩ জন করে পুরুষ ব্যাংক কর্মী নিয়োগ করা হয়। শাখা অফিসের মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের মূল কাজ হলো ঋণ বিতরণ ও কিস্তি আদায় করা।

জাতীয় উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা

- দরিদ্রদের গৃহায়ন সুবিধা: বাংলাদেশে গৃহায়ন সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। এ সমস্যা নিরসনে গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৪ সাল থেকে গৃহঋণ কর্মসূচি চালু করে। গ্রামীণ বাস্তুহারা মানুষের কাছে এই কার্যক্রমটি খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ছোট একটি টিনশেড গৃহ নির্মাণের জন্য সদস্যরা ১৫,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ৮ শতাংশ সুদে ৫ বছরের কিস্তিতে পেতে পারে।
- উচ্চ শিক্ষা ঋণ: গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ১৯৯৭ সাল থেকে উচ্চ শিক্ষা ঋণ কর্মসূচি চালু করে। যা এই ব্যাংকের সদস্যদের সন্তানেরা যারা মেডিকেল, বিশ্ববিদ্যালয়সহ কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ালেখা করে তারা মাত্র ৫.৫ শতাংশ সুদে ঋণ পেয়ে থাকে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঋণ: ক্ষুদ্র ব্যবসা ঋণ নামে গ্রামীণ ব্যাংক জমি, ফার্নিচার, স-মিল, ফার্মেসি, ডেইরি ফার্ম, অটো-রিকশা ইত্যাদিতে এই ঋণ প্রদান করে।
- গ্রামীণ সদস্যদের সন্তানদের বৃত্তি: ছাত্র ঋণ ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ সদস্যদের ছেলে মেয়েদের পড়ালেখায় বৃত্তি প্রদান করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ বৃত্তি দেয়া হয়।

---

[৬৬৩] আনু মাহমুদ, *এনজিও দরিদ্রতা: উন্নয়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

- জীবন বীমা: প্রতি বছর গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের মধ্য থেকে মৃত ঋণ গ্রহীতাদের পরিবর্গকে ১৭ মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত জীবন বীমা-(লভ্যাংশ) হিসেবে প্রদান করে।
- গ্রামীণ ফোন: বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক ২০১১ সাল পর্যন্ত ৪৬৩৭৪১ জন গ্রহীতাকে মোবাইল ফোন এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করেছে।
- ভিক্ষুকদের সদস্য হিসেবে গ্রহণ: ভিক্ষাবৃত্তি একটি অসম্মানজনক পেশা হওয়ার পরও কিছু ব্যক্তি নিজেদের অক্ষমতার কারণে এবং চরম দারিদ্র্যের কারণে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে। এই ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদের মাঝে আবার রয়েছে বিভিন্ন প্রতিবন্ধী। তাই গ্রামীণ ব্যাংক ২০০২ সাল থেকে একটি নতুন কর্মসূচি চালু করে, যার মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বিনা সুদে ঋণ প্রদান করা হয়। যার মাধ্যমে তারা অতি ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে জীবন নির্বাহ করতে পারে।[৬৬৪]
- দরিদ্রদের নিয়ে ক্ষুদ্র দল গঠন: দরিদ্রদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র দল গঠন করা হয়। তারা দলগতভাবে ঋণ গ্রহণ করে কোনো প্রকল্পে দলগতভাবে বিনিয়োগ করে এবং সময়মতো কিস্তি পরিশোধ করে।
- উন্নয়ন সহায়ক কাজ: গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ গ্রহণ-বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখে। এতে ঋণ গ্রহীতা ও সঞ্চয়কারী সদস্য নিজেদের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন করতে সফল হয়।
- সাংগঠনিক উন্নয়ন: সংঘবদ্ধ করে সংগঠন উন্নয়নের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্রদের দক্ষ হতে সহায়তা করছে।[৬৬৫]

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যবলী

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন শাখা অফিসকে প্রাতিষ্ঠানিক কিছু কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। যেমন-

প্রথমত: শাখা অফিসের ম্যানেজার ও কর্মীরা প্রকল্প এলাকায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঋণ পাওয়ার যোগ্য সদস্যদের নির্বাচন করেন।

দ্বিতীয়ত: অফিসের তত্ত্বাবধানে দল গঠন করে একটি কেন্দ্র গঠন করা হয় এবং ঋণ পাওয়ার যোগ্য সদস্যদের মধ্য থেকে সমমনা ৫ জনের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করে একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদক নির্বাচন করা হয়।

তৃতীয়ত: দশ-বারোটি দল গঠন করে একটি কেন্দ্র গঠন করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রের সদস্যরা একজন কেন্দ্রপ্রধান এবং একজন সহযোগী কেন্দ্রপ্রধান নির্বাচন করে। কেন্দ্রপ্রধান সপ্তাহের

---

৬৬৪ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *স্বেচ্ছাসেবিতা ও বাংলাদেশের এনজিও*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৮

৬৬৫ সৈয়দ শকতাতুজ্জামান, *বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

কোনো নির্দিষ্ট দিনে একটা সাধারণ সভা আহ্বান করেন। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীগণ উক্ত সভায় ঋণ বিরতণ ও কিস্তি আদায় করেন।

চতুর্থত: সাপ্তাহিক কিস্তি জমার সময় ব্যাংক অফিস প্রতি ঋণগ্রহীতা থেকে ১ টাকা বেশি জমা রাখে। উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিপদ-আপদের জন্য জমা রাখা হয়, যাতে সে বিপৎকালীন সংকট দূর করার প্রয়োজনে আরো অতিরিক্ত ঋণ নিতে পারে।

পঞ্চমত: ব্যাংকের সদস্যরা নিজেরা একটি আপৎকালীন ফান্ড গঠন করেন। কোনো সদস্য দুর্ঘটনাজনিত কারণে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে এ তহবিল থেকে তাকে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ইসলামী ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশে বেসরকারি অঙ্গনে সবথেকে বড় ব্যাংক। ব্যাংকটি ইসলামী শরী'আহভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ ও বৃহত্তম ব্যাংক। ইসলামী জীবনদর্শনে উদ্বুদ্ধ দেশি ও বিদেশি কিছু উদ্যোক্তা একত্রিত হয়ে মানুষদেরকে সুদমুক্ত অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার জন্য ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ ব্যাংকটি অনুমোদন লাভ করে।[৬৬৬] যা ইসলামী অর্থব্যবস্থার জন্য এক মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে দেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করে দেশের জনসাধারণের আস্থা অর্জন করেছে। আর আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং অঙ্গনে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে তাদের অগ্রযাত্রাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে সমাজজীবন ও অর্থনীতিতে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

ইসলামী ব্যাংকের Rual Development Scheme (RDS) ও Urban Poor Development Scheme (UPDS) প্রকল্প

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এদেশের দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, বিশেষত পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' নামক এক কল্যাণমুখী প্রকল্প চালু করে। যে প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জনাব আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৯৯৫ সালের ৩১ জুলাই এর

[৬৬৬] Islami Bank Bangladesh Limited, *Annual Report 2017,* Published by Islami Bank Bangladesh Limited, Dhaka, n.d. P. 37

আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পটি প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ২০টি শাখার মাধ্যমে ২০টি গ্রামে তার কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে এ প্রকল্পের আওতায় সর্বপ্রথম বিনিয়োগ বিতরণ কার্যক্রমের সূচনা হয়।[৬৬৭] Rual Development Scheme (RDS) প্রকল্পটি গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আর Urban Poor Development Scheme (UPDS) প্রকল্পটি শহরের বস্তি এলাকায় সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য পরিচালিত হয়। ২০১৭ সালে ডিসেম্বর মাসের হিসেবে অনুযায়ী RDS এর ব্রাঞ্চের সংখ্যা ২৪৭টি এবং UPDS এর ব্রাঞ্চের সংখ্যা ২৪টি। সমগ্র দেশে মোট ২৭১টি ব্রাঞ্চ ৬৪টি জেলার ৪৯০টি উপজেলায় ২০৬৫৩টি গ্রামে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।[৬৬৮] ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সালের তথ্য অনুযায়ী RDS ও UPDS প্রকল্পে মোট সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ১০৭৬২৯৭ জন এবং ৩২৪১৩ জন। এ প্রকল্প দুটিতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭৩২৩২৭ মিলিয়ন ও ১১০৯৮৭ মিলিয়ন টাকা।[৬৬৯]

ক্ষুদ্র অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যবস্থা হিসেবে এ দু'টি প্রকল্প ব্যতিক্রমধর্মী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি। এর লক্ষ্য হলো, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একটি বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে এনে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ও আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভশীল করে গড়া এবং পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পকে সঠিক প্রয়োগ করে একটি টেকসই স্বনির্ভর কর্মসূচি গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে প্রান্তিক অঞ্চলে ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে আয় বৈষম্যকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখা। এই লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী ব্যাংকের আরডিএস ও ইউপিডিএস প্রকল্পের কর্মীরা ইসলামী অর্থব্যবস্থার নিয়ম-নীতির আলোকে ক্ষুদ্র ঋণ বিরতণ করে প্রান্তিক দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এই প্রকল্পের প্রধানত উদ্দেশ্যবলি নিম্নরূপ:

- বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের কৃষিজ ও অকৃষিজ খাত সম্প্রসারণ করা।
- কর্মসংস্থান ও আয় বর্ধক খাতে সুবিধাবঞ্চিত ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনিয়োগ করে কর্মহীন বিপন্ন ব্যক্তি ও তরুণদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

---

[৬৬৭] আইবিবিএল জনসংযোগ বিভাগ, *ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন বার্তা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ১

[৬৬৮] Md. Abdul Hamid Miah, *Islamic Microfinance*, ibid, P. 170

[৬৬৯] ibid, P. 171

- গ্রামীণ জনপদে সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ গৃহনির্মাণ, সোলার বৈদ্যুতিক পদ্ধতি গ্রহণ এবং বায়োগ্যাস প্লান্টে বিনিয়োগ প্রদান।
- সুবিধাবঞ্চিত এবং গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিশুদ্ধ নিরাপদ পানি, সেনিটেশন এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

নির্ধারিত এরিয়ায় গ্রাম নির্বাচন ও জরিপ পরিচালনা

প্রতিটি নির্ধারিত শাখা তার ১০ (দশ) কিলোমিটার পরিসীমার মধ্যে এলাকা নির্ধারণ করে। গ্রাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখা হয়:-

- সহজ যোগাযোগব্যবস্থা সম্বলিত গ্রামসমূহ।
- যেসব এলাকায় কৃষি ও অকৃষি কাজের সুযোগ ও সহজলভ্যতা আছে।
- নিম্ন আয়ের লোকের আধিক্য ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকা।
- বস্তি এলাকা যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সহজলভ্যতা রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে প্রকল্প এরিয়া ঠিক করে সেখানে প্রাথমিক জরিপ পরিচালনা করার পর সেখানকার সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীদেরকে আরডিএস ও ইউপিডিএস প্রকল্পের আওতায় সদস্য করা হয়।[৬৭০] প্রতিটি সদস্যকে আরডিএস প্রকল্পে প্রাথমিকভাবে ১০ টাকা সঞ্চয় খাতে জমা দিয়ে সদস্য হতে হয়। এরপর প্রতি সপ্তাহে ৩০ টাকা করে আবশ্যিকভাবে জমা দিতে হয়, আর ইউআরডিএস প্রকল্পে প্রতি সপ্তাহে ৫০ টাকা করে জমা দিতে হয়।[৬৭১]

যারা বিনিয়োগ পাওয়ার যোগ্য

- কৃষি কাজে নিয়োজিত কৃষক, যার জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ০.৫ একর ও বর্গাচাষী।
- অকৃষি কাজে নিয়োজিত ভূমিহীন বা সর্বোচ্চ ০.৫ একর জমির মালিক।
- বিপন্ন ব্যক্তি, যিনি কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করেন।
- গ্রাহকের বয়স হবে ১৮ থেকে ৫০ বছর।
- নির্বাচিত ব্যক্তি বা গ্রাহককে নির্বাচিত এলাকার বাসিন্দা হতে হবে।
- অন্য ব্যাংক বা সংস্থার ঋণ-গ্রহীতাগণ এই প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ সুবিধা পাবেন না।[৬৭২]

---

[৬৭০] Md. Abdul Hamid Miah, *Islamic Microfinance*, ibid, P. 172

[৬৭১] ibid, P. 174

[৬৭২] Islami Bank Bangladesh Limited, *Rural Development Scheme (RDS)*, Published by Public Relations Division, Islami Bank Bangladesh Limited, Dhaka-2017, P. 6

গ্রুপ গঠন

গ্রুপ নির্ধারণ করা হচ্ছে এই প্রকল্পের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমন্বিত পরামর্শকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। নিম্নে গ্রুপের অবস্থান বর্ণনা করা হলো:-

- ছোট ছোট গ্রুপ গঠন করার ক্ষেত্রে একই পেশার ৫ জন করে সদস্য নিয়ে গ্রুপ গঠন করার জন্য গুরুত্ব দেয়া হয়।
- প্রতিটি গ্রুপের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন করে দলনেতা ও একজন উপ-দলনেতা ঠিক করা হয় সমন্বয় করার জন্য।

দলনেতা নিম্নলিখিত শর্তে গ্রুপে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করবেন-

১. সদস্যদের নামে অন্য কোনো ব্যাংক বা সংস্থায় কোনো দায়-দেনা আছে কি না এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

২. কৃষিজ ও অকৃষিজ খাতে নিয়োজিত সদস্যদের তালিকা করে তাদের গ্রুপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

৩. সদস্যদের মধ্যে বিনিয়োগের জন্য ফিল্ড অফিসারের সাথে গ্রুপ লিডার যোগ্য গ্রাহক নির্বাচন, বিনিয়োগ প্রদান ও আদায়ে পূর্ণ ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

৪. নির্বাচিত সদস্যদের বিনিয়োগ প্রাপ্তি ও তা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত কিস্তির বিষয়গুলো দলনেতা তদারকি করবেন। তিনি তার দলের প্রত্যেক সদস্যদেরকে সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত করবেন এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করবেন। গ্রুপ নির্বাচনের চার সপ্তাহ পর প্রাথমিকভাবে (২) দুই জন সদস্য উক্ত গ্রুপ থেকে বিনিয়োগ প্রাপ্তির জন্য মনোনীত হবেন। আর এক মাসের মধ্যে গ্রুপের বিনিয়োগ প্রাপ্ত দুই সদস্য তাদের কিস্তি ঠিকমতো পরিশোধ করলে গ্রুপের অন্য সদস্যরা বিনিয়োগ প্রাপ্তির জন্য মনোনীত হবেন।[৬৭৩]

কেন্দ্র গঠন

- একটি কেন্দ্র গঠন করা হবে কমপক্ষে ২ এবং সর্বোচ্চ ৮ টি গ্রুপ নিয়ে। প্রতিটি কেন্দ্রের কাজ সমন্বয় করার জন্য কেন্দ্রের দলনেতা ও উপ-দলনেতাদের মধ্যে থেকে একজন করে কেন্দ্র নেতা ও কেন্দ্র উপনেতা মনোনীত করা হবে ।
- প্রতিটি কেন্দ্রে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সাপ্তাহিক সভাগুলো নির্ধারিত স্থানে ও দিনে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে।
- কেন্দ্র সভাগুলোর প্রতিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষর সম্বলিত সভার কার্যবিবরণী থাকতে হবে এবং কেন্দ্র সভার উপস্থিতি স্বাক্ষর বিনিয়োগ প্রাপ্তির জন্য বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হবে।

[৬৭৩] Islami Bank Bangladesh Limited, *Rural Development Scheme (RDS)*, ibid, P. 7

- কেন্দ্রসভাগুলো সাপ্তাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে।[৬৭৪]

এ উন্নয়ন প্রকল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা

- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।
- গ্রামীণ অর্থনীতির অকৃষিজ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।
- ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত আলোকিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা।
- দরিদ্র জনগণকে মুক্ত জীবনযাপনের এবং শরী'আহ সম্মত লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা।
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনেতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান নিশ্চিত করা।
- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মতো নিরাপদ খাতে ব্যাংকের বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করা। বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়তা করা।
- গ্রামীণ নারী সমাজকে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।
- গ্রামীণ সমাজের অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকার দূরীভূত করে একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠনে অবদান রাখা।
- গ্রামীণ জনপদে, হস্তচালিত নলকূপ ও গৃহায়নের প্রয়োজনীতার উপর লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা।
- ক্ষুদ্র সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব পুঁজি গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি নিরক্ষরতা দূরীকরণে ভূমিকা রাখা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা।[৬৭৫]

---

[৬৭৪] ibid, P. 8

[৬৭৫] ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪

বিনিয়োগ খাত ও মেয়াদ

বিনিয়োগের খাতসমূহ	মেয়াদ
শস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন/চাষাবাদ	১ বছর
নার্সারি এবং ফুল ও ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদন	১ বছর
কৃষি যন্ত্রপাতি	১ থেকে ৩ বছর
গবাদি পশুপালন	১ থেকে ২ বছর
হাঁস-মুরগি পালন	১ বছর
মৎস্য চাষ	১ থেকে ২ বছর
গ্রামীণ পরিবহন	১ বছর
গ্রামীণ গৃহনির্মাণ	১ থেকে ৫ বছর
বায়োগ্যাস ও সোলার প্যানেল	১ থেকে ৩ বছর
বিবিধ অকৃষি খাত	১ বছর

বিনিয়োগের প্রকার

এই প্রকল্পের আওতায় দুই ধরনের বিনিয়োগ পরিচালনা করা হয়। যথাক্রমে, মাইক্রো বিনিয়োগ ও ম্যাক্রো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকায় (কর্জে হাসানা) লাভহীন ঋণ প্রকল্প রয়েছে দরিদ্র প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য।

১. মাইক্রো বিনিয়োগ

দরিদ্র গ্রহীতার জন্য এই সুদমুক্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সীমা ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা হতে ১০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত এবং সময়মতো কিস্তি পরিশোধ করলে পরবর্তী বিনিয়োগে আরো ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার) টাকা বেশি বিনিয়োগ সুবিধা পাবে।

২. ম্যাক্রো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ

এই প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী সর্বোচ্চ ৫০০,০০০.০০ (পাঁচ লাখ) টাকা বিনিয়োগ সুবিধা পাবেন।

৩. কর্জ প্রকল্প (কর্জে হাসানা)

এই প্রকল্পটি পুরোপুরি লাভহীন প্রকল্প। এই প্রকল্পটি হলো শুধু গ্রহীতা যদি হঠাৎ বিপদগ্রস্ত (যদি পরিবারের আয়কারী ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, তালাক প্রাপ্তা, দুর্ঘটনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি) হয়ে পড়েন তবে তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়।[৬৭৬]

বিনিয়োগ পদ্ধতি

বিনিয়োগের খাত ও ধরনের উপর ভিত্তি করে নিম্নরূপ যেকোনো এক বা একাধিক বিনিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে-

- বাই' মুরাবাহা: মুরাবাহা (مرابحة) শব্দটি আরবি 'রিবহুন' (ربح) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। 'রিবহুন'-এর অভিধানিক অর্থ লাভ (نفع)। পারিভাষিক অর্থে 'প্রথম মূল্যের (ক্রয়মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলা হয়।' ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রি করাকেই বাই' মুরাবাহা বলা হয়। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তার মধ্যে বাই' মুরাবাহা পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ করা হয়। মুরাবাহা মূলত একটি ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি। বাই' মুরাবাহা দুই প্রকার। (এক) মুরাবাহা 'আদিয়া, (দুই) মুরাবাহা লিল্ আমিরি বিশ্ শিরা'।[৬৭৭]

- বাই' মুয়াজ্জল: 'মুয়াজ্জাল' (مؤجل) শব্দটি আরবি 'আজল' (أجل) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। 'আজল' (أجل) শব্দের অভিধানিক অর্থ বিলম্ব, বাকি আর 'মুয়াজ্জাল' অর্থ বিলম্বিত, বিলম্বে পরিশোধযোগ্য, এককথায় বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়। ইসলামী ব্যাংকিং এ বিনিয়োগের আরো একটি মাধ্যম হলো বাই' মুয়াজ্জল। বাই' মুয়াজ্জলের অর্থ হলো বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করা। বাই' মুয়াজ্জালকে আল বাই' ইলা আজাল, আল বাই' বিছ্ ছামানিল আজিল ও বাই'আন্ নাসিয়াও বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে 'বাই মুয়াজ্জাল হলো এমন এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি, যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকিতে (বিলম্বে) পরিশোধ করা হয়।'[৬৭৮]

- বাই' সালাম: বাই' সালাম (بيع السلم)-এর অর্থ হলো অগ্রিম ক্রয়। আরবি ভাষায় সালাম (سلم) অর্থ সমর্পণ করা। বাই' সালাম এর অন্য আরো একটি পরিভাষা হলো বাই' সালাফ (بيع سلف)। অভিধানে সালাম (سلم) অর্থ সমর্পণ করা এবং সালাফ (سلف) অর্থ

---

[৬৭৬] Islami Bank Bangladesh Limited, *Rural Development Scheme (RDS)*, ibid, P. 13

[৬৭৭] মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা-২০১১, পৃ. ১২

[৬৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

পেশ (تقسيم) করা, অগ্রিম প্রদান করা। দুটি পক্ষের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির সময়ই উক্ত স্থানে পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বলে একে বাই' সালাম বলা হয়। ঠিক সেভাবে পণ্যের মূল্য বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদান করা হয় বলে একে বাই' সালাম বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে 'অগ্রিম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বাই' সালাম বলে।'[৬৭৯]

- মুদারাবা: মুদারাবা (مضاربة) শব্দটি 'দারব' (ضارب) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। আরবি ভাষায় শব্দটি প্রহার করা, অন্বেষণ করা, দৃষ্টান্ত দেয়া, পরিভ্রমণ করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলামী পরিভাষায়, 'মুদারাবা এমন ধরনের অংশীদারি কারবার, যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। এক পক্ষ মূলধন সরবরাহ করে এবং অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায়ের লাভ হলে উভয় পক্ষ তা গ্রহণ করে। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী তা বহন করে। এখানে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে বলা হয় সাহিবুল মাল আর ব্যবসা পরিচালনাকারী পক্ষকে বলা হয় মুদারিব।[৬৮০] সুদের বিশুদ্ধ বিকল্প ইসলামী পদ্ধতি হচ্ছে মুদারাবা।[৬৮১]

- মুশারাকা: মুশারাকা হচ্ছে একটি অংশীদারি ব্যবসা। মুশারাকাকে সরাসরি অর্থায়ন পদ্ধতিও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগকারী ব্যবসা করার জন্য ব্যবসা পরিচালনাকারীকে সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান করে। মুশারাকা (مشاركة) আরবি শব্দ। এ শব্দটি শির্‌ক (شرك) শব্দমূল হতে উদ্ভূত। শির্‌ক হচ্ছে অংশীদারিত্ব। আরবি ভাষায় শির্‌ক (شرك) ও শিরকাত (شركة) শব্দ দিয়ে অংশীদারিত্ব বুঝানো হয়।[৬৮২]

- হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক: এই বিনিয়োগ পদ্ধতিটি একটি বিশেষ বিনিয়োগ পদ্ধতি যা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক উদ্ভাবিত নিজস্ব একটি পদ্ধতি। লিজিং-এর ক্ষেত্রে ব্যাংক এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে যৌথভাবে ব্যাংক ও গ্রাহক সম্পদের মালিক হয়। এখানে কোনো সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে ততটুকুর মালিকানা ব্যাংক গ্রহণ করার পর ব্যাংক উক্ত মালিকানা গ্রহীতার কাছে ভাড়া বা কিস্তিতে বিক্রয় করার চুক্তি করে।[৬৮৩]

---

[৬৭৯] মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্‌র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

[৬৮০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

[৬৮১] আল্লামা তকী উসমানী, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা*, আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ১২৪

[৬৮২] মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্‌র নীতিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

[৬৮৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা ও সুবিধাবঞ্চিতদের পুনর্বাসনে প্রস্তাবনা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজের পর্যালোচনা

প্রথম অনুচ্ছেদঃ সমাজসেবামূলক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের পর্যালোচনা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের কাজের পর্যালোচনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের কাজের পর্যালোচনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যালোচনা

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের পুনর্বাসনে প্রস্তাবনা

প্রথম অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংক

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের কার্যক্রম

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের অর্গানোগ্রাম

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের আয়ের উৎস

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের সাধারণ কার্যক্রম

সপ্তম অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের জীবিকা উন্নয়ন (স্বাবলম্বী) প্রকল্প

অষ্টম অনুচ্ছেদঃ বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্য আয়

নবম অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের প্রচার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজের পর্যালোচনা

দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চেষ্টা করে যাচ্ছে। এছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগে অনেক সমিতি, সংস্থা ও এনজিও এ লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার প্রতি বছর সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ধারাবাহিকভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সরকার ৪৫২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। যা মোট বাজেটের ১৩.২৮ শতাংশ এবং ডিজিপির ২.৩১ শতাংশ। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, সুবিধাবঞ্চিত ও অতি দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রায়ন, গৃহায়ন, আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম, ঘরে ফেরা কর্মসূচি অন্যতম।[৬৮৪] সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত সরকারি অনার্থিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব পদ্ধতিসহ ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে, নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং অল্প কিছু প্রতিষ্ঠান যাকাতভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এসব দেশীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এ সকল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু এত কর্মপরিকল্পনা, প্রয়োগ ও ব্যয় সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থেই কী সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের তেমন কোন উন্নয়ন ঘটছে। এই প্রশ্নের উত্তর এক বাক্যে দেয়া সম্ভব হবে না। এর উত্তর পেতে হলে, এ লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর ধরন, পরিচয় ইত্যাদিসহ প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক পরিচালিত কাজের পদ্ধতি এবং পর্যায়ক্রমিক সুবিধাভোগীদের জীবনমানের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এর ফলে হয়ত কিছুটা বাস্তবিক উত্তর পাওয়া যেতে পারে। এসব প্রশ্নের আলোকে নিম্নে সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নে প্রচলিত কাজের পর্যালোচনা করা হলো।

প্রথম অনুচ্ছেদঃ সমাজসেবামূলক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের পর্যালোচনা

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেসব মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে তন্মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ সবথেকে বেশি কাজ করছে। এই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আবার সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের অসহায়, অবহেলিত পশ্চাৎপদ সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিকতর পদক্ষেপ নিয়েছে। এছাড়াও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-সহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের

[৬৮৪] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানসমূহের গৃহীত পদক্ষেপগুলো অবশ্যই অনেক প্রশংসার দাবিদার, কিন্তু তারা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে, সেই পদক্ষেপগুলোকে নিয়ে আরো বেশি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তাদের অনেক প্রকল্পের মধ্যে একটা প্রকল্প রয়েছে যে, সুদবিহীন ঋণ বিতরণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তা করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

এই কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথমত ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি বা পরিবার খুবই প্রান্তিক বা হতদরিদ্র, সেই দরিদ্র মানুষ বা পরিবারটির প্রাথমিক প্রয়োজন হয় মৌলিক চাহিদা পূরণের। আবার মৌলিক চাহিদার মধ্যেও সবার আগে প্রয়োজন খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা, কিন্তু যখন তাদের মৌলিক চহিদাগুলো আগে থেকে পূরণ থাকে না তখন ঋণ পাওয়ার সাথে সাথে তা দিয়েই তাদের প্রাথমিক এই প্রয়োজনগুলো মেটানোর চেষ্টা করে। ঋণের টাকা ব্যবহার করে আয় বর্ধনমূলক কিছু করবার যে চেষ্টা তা আর থাকে না। ঋণ থেকে প্রাপ্ত টাকা তারা প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে খরচ করে ফেলে। ফলে আয় না বাড়ার কারণে পরবর্তীতে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারে না। এজন্য পরবর্তীতে তারা আর এ ধরনের ঋণ পায় না। তাই ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিবেচনায় আনা প্রয়োজন যে, তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা। তারপর ঋণের ব্যবস্থা করা। অন্তত যাদের খাদ্য, বস্ত্র ও থাকার ঘর-বাড়ি নেই, সর্বপ্রথম কোনো প্রকার ঋণ ব্যতীত এককালীন দান বা অনুদানের মাধ্যমে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা বাঞ্ছনীয়। আর যারা কিছুটা কম ঝুঁকিপূর্ণ তাদেরকে কর্মক্ষম করতে এমন কাজে ঋণ দেয়া আবশ্যক, যে কাজে উক্ত ব্যক্তির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা আছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই তাদেরকে সেই পরিমাণ ঋণ এবং পর্যাপ্ত সুযোগ করে দিতে হবে যাতে তারা তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। তাই বাস্তবে দেখা যায়, শুধু প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু পরিমাণ যে অর্থ ঋণ হিসেবে দেয়া হয়, তাতে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষগুলো কিছু দিন ভালো থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা উপকৃত না হয়ে বরং ঋণ শোধ করতে গিয়ে আরো বেশি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হয়, যা পরবর্তীতে তাদের দুর্দশাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারকে প্রাথমিকভাবে ৫,০০০.০০ টাকা ঋণ দানসহ সর্বোচ্চ ৩০,০০০.০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। এক্ষেত্রে দরিদ্রদেরকে বিনা জামানতে যে ঋণ দেয়া হয় তা অবশ্যই ভালো উদ্যোগ, কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, বর্তমান সময়ে মাত্র ৫,০০০.০০- ৬,০০০.০০ টাকা দিয়ে কীভাবে একটি পরিবারের অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব এবং যে টাকাটা অবশ্যই পরিশোধযোগ্য।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষুদ্রঋণ ছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচিতে দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিতদের ভাতা প্রদান করে। এ কর্মসূচিতে ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে তাতে মাসে ৩৫০ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা

করেছে। এছাড়াও আরো অনেক প্রকল্পে সরকারের পক্ষ থেকে ৫০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত ভাতা সহায়তা করা হয়। যেখানে এক কেজি চালের মূল্য ৫০-৭০ টাকা, এক ডজন ডিমের দাম ১০০-১৫০ টাকা, এক কেজি গুরুর গোশতের দাম ৫৫০ টাকার উপরে সেখানে এত অল্প টাকা দিয়ে একজন মানুষের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাদের ভাতা প্রদান করা হয় তারা বয়স্ক এবং রোগগ্রস্ত। তাদের নিজেদের জীবিকা ব্যয় নির্বাহ করার একান্ত খরচ বাদ দিয়ে চিকিৎসা ব্যয় মিটানো কীভাবে সম্ভব। বাস্তবতা হচ্ছে এত অল্প পরিমাণ টাকা দিয়ে একজন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের এক সপ্তাহের শুধু খাদ্যের চাহিদা মেটানোও সম্ভব হয় না। সেখানে পুরো মাসের সকল খরচ বহন কীভাবে সম্ভব। এজন্য সরকারি ভাতা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পরিচালনায় যুক্তদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা প্রয়োজন। শুধু সুবিধাভোগী মানুষের সংখ্যা না বাড়িয়ে বরং ভাতার টাকা বাড়িয়ে সুবিধাভোগীর সেবার মান বাড়ানো প্রয়োজন। তাতেই কেবল সুবিধাবঞ্চিতদের টেকসই উন্নয়ন হবে।

গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ ভাতা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়েছে ২১০০ কোটি টাকা। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান করা হয়েছে ৭৫৯ কোটি টাকা। দরিদ্র মায়ের মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে ৩৬০ কোটি টাকা।[৬৮৫] কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা কর্মসূচিতে ১২০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা প্রদান করা হয়েছে ৬৯৩ কোটি টাকা ও তাদের চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়েছে ৬৫ কোটি টাকা। এতিম শিশুদের প্রতিপালন করার জন্য তাদের ভরণ-পোষণে সরকারিভাবে ব্যয় হয়েছে ৫১ কোটি টাকা ও বেসরকারিভাবে ব্যয় ৮৬.৪০ কোটি টাকা। সামাজিকভাবে অবহেলিত বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ১১.৩৫ কোটি টাকা। দেশের হতদরিদ্র নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য কম মূল্যে খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় করায় ভর্তুকি দেয়া হয়েছে ৭৮০.৪৮ কোটি টাকা। কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচিতে ব্যয় হয়েছে ১৪৫০ কোটি টাকা। Vulnerable Group Development (VGD) কর্মসূচির আওতায় ১৪০৭.৬৫ কোটি টাকা। Vulnerable Group Feeding (VGF) কর্মসূচিতে ১৬৪২.২৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। Gratuitous Relief (GR) কর্মসূচিতে ৪৮৮.৭৬ কোটি টাকা। অতি দরিদ্রদের দারিদ্র্য বিমোচন ও দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপৎকালীন সহায়তার জন্য ১,৬৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হচ্ছে। এভাবে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ৮৩ প্রকল্পে ৯,৯৬৬.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[৬৮৬]

---

[৬৮৫] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

[৬৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

দেশে এতিম শিশু, পথশিশু, হারিয়া যাওয়া শিশুসহ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ সকল শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি শিশু সদন, শিশু আশ্রয় কেন্দ্র ও এতিম খানা রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সরকারি অর্থায়নে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে সদা তৎপর রয়েছে। সেখানে বঞ্চিত ও অবহেলিত অভিভাবকহীন শিশুদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে তাদের পড়ালেখাসহ সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে যদিও অল্প কিছু শিশু পড়ালেখা শিখে বর্তমানে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে বা হচ্ছে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ, কিন্তু বাংলাদেশে যে পরিমাণ পথশিশু, সুবিধাবঞ্চিত ও এতিম রয়েছে সেই পরিমাণ মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বর্তমানে এদেশে জেলাভিত্তিক যে শিশু সদনগুলো রয়েছে, সেগুলোকে আরো বেশি আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। দেশের যে এলাকায় এ শিশুর সংখ্যা বেশি সেই এলাকাগুলোতে আরো বেশি মানসম্পন্ন শিশু আশ্রয় কেন্দ্র করা প্রয়োজন। দেশের বড় বড় শহরের বস্তিগুলোর শিশুরা সব দিক থেকে অবহেলিত। তারা মৌলিক চাহিদা প্রাপ্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আগামীর দেশপ্রেমিক হিসেবে তাদেরকে গড়ে তুলতে হলে বস্তির ঐ জঞ্জাল থেকে বের করে তাদেরকে শিশু আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেখানে তাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে তারা শিক্ষিত ও মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হয়ে দেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

অন্যদিকে দেশে অবহেলিত বয়স্ক মানুষের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। দেশের মানুষের সার্বিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক মানুষের জন্য এখন তাদের সন্তানদের বাড়ি তাদের জন্য আর নিরাপদ থাকছে না। অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো সন্তান নির্যাতন করে পিতামাতাকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। এসব ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এসব বয়স্ক মানুষদের নিরাপদে বেঁচে থাকার জন্য এবং তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। বৃদ্ধদের জন্য এ বৃদ্ধাশ্রমগুলো অনেক ভালো ও কল্যাণমুখী কাজ করে চলেছে। সমাজে সবথেকে অবহেলিত থাকে বৃদ্ধ জনগোষ্ঠী। যে সকল বৃদ্ধদের থাকা-খাওয়ার কোনো জায়গা নেই, তাদের পরিচর্যা ও প্রতিপালনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধাশ্রমগুলো বৃদ্ধদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। যে কারণে এখানে তারা ভালোভাবে তাদের জীবনযাপন অতিবাহিত করতে পারছে। এখানে অনেক বয়স্ক একসাথে থাকার কারণে একে অন্যের দুঃখ, কষ্ট ভাগাভাগি করে নিতে পারছে। এছাড়াও এই বয়স্ক আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে তুলনামূলক সবল ও সুস্থ বয়স্কদের অনেকেই কাজ করতে আগ্রহী হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা কাজ করার সুযোগ পায়। এখনে অনেকেই নিজেদের অর্জিত দক্ষতাগুলো কিছুটা হলে চর্চা করার সুযোগ পায়। যাতে তাদের একাকিত্ব থেকে মুক্ত থাকার একটা সুযোগ সৃষ্টি

হয়। এটি অবশ্যই একটি ভালো ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এক্ষেত্রে নিজ পরিবারকে বৃদ্ধদের জন্য নিরাপদ করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্কুল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও একটি ভালো উদ্যোগ। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত প্রতিবন্ধীরা প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা লাভ করায় নিজেদের অক্ষমতার বাইরে এসে চিন্তা করতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা নিজেদের দক্ষতা প্রকাশ করার সুযোগও পায়, কিন্তু এ সেবামূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে আশ্রয় নেয়া মানুষগুলোর যে মানসম্পন্ন সেবা পাওয়ার কথা, সকল ক্ষেত্রে তা হয় না। এর জন্য যেমন অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি রয়েছে ঠিক তেমনি এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার সাথে জড়িত ব্যক্তির্গের সেবা করার সদিচ্ছা ও যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে। এগুলো হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবাহীনতার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া, অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা। এখানকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রে এটাকে সেবা হিসেবে গ্রহণ না করে বরং তারা এটাকে শুধু চাকরি হিসেবে নিয়েছে। যে কারণে সেবা প্রদানের সময় সেবার মানে ঘাটতি থেকে যায়। এক্ষেত্রে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান বেশিরভাগই সরকারি হওয়ায় সেখানে কর্মকতা কর্মচারীরা এক ধরনের জবাবদিহিতাহীন অবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে ফেলেছে। এ রকম একটা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য তদারকিতে দায়িত্বপ্রাপ্তরা বহুলাংশে দায়ী। কারণ তারা সঠিকভাবে তদারকি ও সঠিক মূল্যায়ন করে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করে না। ফলে এসব নানাবিধ কারণে এখানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সেবার ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকে না। যেখানে অন্যায় ও অদক্ষতার কোনো শাস্তি নেই সেখানে সেবা পাওয়া যায় না। আরো একটা বড় কারণ হলো, এ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রকৃত অর্থে প্রশিক্ষণের খুবই অভাব। এখানে যারা কাজ করে তাদের পেশাগত দক্ষতা যেমন বাড়ানো প্রয়োজন, ঠিক তেমনি তাদের মনোজগতে পরিবর্তন করাও প্রয়োজন। যদি তাদের মনোজগতে সেবা করার আগ্রহ সৃষ্টি করা না যায়, তবে এই সেবামূলক কাজের অগ্রগতি খুব বেশি আশা করা যায় না।

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দকৃত যে হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় তা পুরোপুরি প্রাপ্য হকদারদের জন্য ব্যয় হয় না। এর একটা বড় অংশ প্রকল্পের বিভিন্ন পরামর্শক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্য ব্যয় হয়। এছাড়াও দেশের প্রতিটি কোনায় কোনায় যে দুর্নীতির গ্রাস রয়েছে তার কালো থাবা এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ায় এখানে আশ্রিতরা যথার্থ সেবা পাচ্ছে না। ফলে প্রকৃত প্রাপকগণের জন্য খুবই কম বরাদ্দ অবশিষ্ট থাকে। তাছাড়াও সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তার জন্য সরকারি যে পরিকল্পনা তা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। এ সকল কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও তার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব সমাজে পড়ছে না। সে কারণে সরকারি হিসাবে দারিদ্র্যের হার কম দেখালেও প্রকৃতপক্ষে সুবিধাবঞ্চিতদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই প্রকৃত মূল্যায়নে দেখা যায় সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমানের তেমন কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বরং তারা আরো শোচনীয়, করুণ ও বেদনাদায়ক অবস্থার মধ্যে চলছে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের কাজের পর্যালোচনা

বাংলাদেশের সরকারি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো ব্যাংকগুলোও দেশের প্রান্তিক এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ হিসেবে হাজার হাজার কোটি টাকা বিতরণের মাধ্যমে কাজ করছে। এখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ প্রায় সকল ব্যাংকই দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে হাজার হাজার কোটি টাকার পল্লী ও কৃষি ঋণ প্রদান করছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ সকল ব্যাংকের বরাদ্দকৃত পল্লী ও কৃষি ঋণ প্রকৃত প্রাপকগণ না পেয়ে দেশের ক্ষমতাশীল, দুর্নীতিগ্রস্ত ও সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো পেয়ে থাকে। অথচ এই সকল ঋণ যদি দেশের প্রকৃত দরিদ্র কৃষকগণ পেতেন তা হলে তাদের জীবনমানের যেমন উন্নতি ঘটত ঠিক তেমনি দেশের সমাজব্যবস্থায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হতো।

ব্যাংক খাতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমটি মূলত প্রচলিত হয় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য, যারা সাধারণ ব্যাংকিংব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংকের Rural Development Scheme (RDS) প্রকল্প, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন গৃহীত বিশেষ কর্মসূচি, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ খাত বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

বাস্তবতা হচ্ছে দেশের প্রান্তিক চাষীরা অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ নিতে পারে না। কারণ ব্যাংকিংব্যবস্থার বিভিন্ন জটিলতার কারণে প্রান্তিক চাষীদের ব্যাংকে যাওয়া সম্ভব হয় না। আবার ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ প্রদানের তথ্য অনেক প্রান্তিক চাষী জানেও না। আবার যেসব কৃষক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় তারা ঋণ গ্রহণ করতে গিয়ে বেশ কঠিন সমস্যার সম্মুখিনও হয়। কারণ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করার পদ্ধতি বেশ জটিল ও সময় সাপেক্ষ। সে কারণে প্রান্তিক চাষীরা বেশিরভাগই ব্যাংক থেকে ঋণ না নিয়ে এনজিও থেকে ঋণ গহণ করে। এছাড়াও দেশের প্রান্তিক দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিতরা একান্ত মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কখনো ঋণ নেয়ার চেষ্টা করলেও প্রচলিত ব্যাংক থেকে কোনোভাবেই ঋণ পায় না। কারণ এমন হতদরিদ্র বা সুবিধাবঞ্চিতদের ঋণ দিলে প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণের টাকা ফেরত না পাওয়ার আশঙ্কায় থাকে। এজন্য প্রতিষ্ঠানগুলো কোন ঝুঁকি নিতে আগ্রহী হয় না। এক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক পুরোপুরি ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক ব্যাংক হওয়ায় এবং ইসলামী ব্যাংকের Rual Development Scheme (RDS) ও Urban Poor Development Scheme (UPDS) প্রকল্প প্রান্তিক দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিতরা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশে গৃহায়ন সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। সুবিধাবঞ্চিত অনেকের নিজের কোনো বাড়ি-ঘর নেই। এক্ষেত্রে বাড়ি-ঘর তৈরির জন্য তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে ইচ্ছা করলেও ঋণ পায় না। কারণ ব্যাংকের পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে তাদেরকে ঋণ দেওয়া সম্ভব হয় না। এজন্য দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এসব কাজের জন্য এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ অনেক ঝামেলাহীন ও সহজ। বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংকই একমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান যারা ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সর্বপ্রথম গৃহঋণ কর্মসূচি চালু করে। গ্রামীণ বাস্তুহারা মানুষের কাছে এই কার্যক্রমটি খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ছোট একটি টিনশেডের গৃহনির্মাণের জন্য সদস্যরা ১৫,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ৮ শতাংশ সুদে ৫ বছরের কিস্তিতে পেতে পারে। উদ্যোগটি ভালো, ঘর-বাড়িহীন মানুষদের একটু থাকার পরিবেশ করে দেয়ার জন্য ছোট এক প্রচেষ্টা, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে ১৫,০০০.০০ টাকা দিয়ে একটি মানসম্মত বাড়ি বা ঘর নির্মাণ করা সম্ভব নয়। এই টাকা দিয়ে একজন মানুষ কোনোভাবেই একটি নিরাপদ বাড়ি নির্মাণ করতে পারে না। এজন্য এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণটা বাড়াতে হবে এবং সহজ শর্তে বেশি সময় ধরে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ্রামীণ ব্যাংক মূলত একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। এই ব্যাংকটি ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক ব্যাংক। এটি এনজিওদের মতো করে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে। এখানে ঋণ গ্রহণের জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। এটি খুবই ভালো উদ্যোগ। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের Rural Development Scheme (RDS) ও Urban Poor Development Scheme (UPDS) প্রকল্প একটি ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক প্রকল্প। এই ব্যাংক দু'টি এদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এখানে গ্রামীণ ব্যাংক তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে সুদভিত্তিক আর ইসলামী ব্যাংকের Rural Development Scheme (RDS) ও Urban Poor Development Scheme (UPDS) প্রকল্প তাদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করে ইসলামী শরী'আহভিত্তিক। যদিও দুই প্রতিষ্ঠানে ঋণ প্রদান করার ও লভ্যাংশ গ্রহণ করার পদ্ধতি ভিন্ন, তথাপি দু'টি প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রদানের জন্য সদস্যপ্রতি বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় একই। এ প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে ৬,০০০.০০ থেকে ৮,০০০.০০ টাকা প্রদান করে, যা একজন মানুষ বা একটি পরিবারের জন্য খুবই অপ্রতুল। এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে সংসার ব্যয় মিটিয়ে আবার লভ্যাংশসহ টাকা প্রতিমাসে কিস্তি অনুযায়ী ফেরত দেয়া খুবই দুরূহ। এর ফলে দারিদ্র্য কমেই না বরং তা বেড়েই চলে। এজন্য ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক ব্যাংক বা ব্যাংকের প্রকল্পগুলোকে আরো বেশি বাস্তবমুখী হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রান্তিক এ জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করার জন্য এমন পরিমাণ ঋণ বরাদ্দ দিতে হবে যেন একটি পরিবারের স্বাভাবিক প্রয়োজন মিটে যায় এবং উক্ত ঋণ পরিশোধের পদ্ধতিও এমনভাবে দিতে হবে যেন একজন প্রান্তিক দরিদ্র বা সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তির জন্য গৃহীত ঋণ পরিশোধ করা খুবই সহজতর হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও এনজিও-এর কাজের পর্যালোচনা

বর্তমান বাংলাদেশের বেসরকারি খাত প্রান্তিক পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে সবথেকে এগিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। তারা একেবারে সহায় সম্বলহীন মানুষদেরকে ঋণ প্রদান করে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান ও স্বতন্ত্র এনজিওগুলো যে ঋণ প্রদান করে তা সম্পূর্ণ জামানত বিহীন। এক সময় জামানত ছাড়া প্রচলিত ব্যাংকিংব্যবস্থা থেকে ঋণ পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ঋণের জন্য জামানত দেয়া যাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না, তাদের ব্যাংক ঋণ পাওয়ার কোনো সুযোগও ছিল না। তারা গ্রামের সুদখোর মহাজনদের নিকট থেকে চড়া সুদে ঋণ নিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু হওয়ার ফলে জামানতবিহীন ঋণ দেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন এনজিও থেকে জামানত ছাড়াই ঋণ সহায়তা পাচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি ভালো ব্যবস্থাপনা। যার মাধ্যমে গরিব, দুঃস্থ বা সুবিধাবঞ্চিতদের দারিদ্র্য নিরসন করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাংক ঋণ নেয়ার সুব্যবস্থা না থাকায় তারা এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কারণ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো গ্রামের মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ঋণ বিরতণ করে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষত তারা মহিলাদেরকেই ঋণ প্রদান করে। এনজিও থেকে ঋণ নেয়া অত্যন্ত সহজ ও ঝামেলাহীন। আবার ঋণ পরিশোধের পদ্ধতিও বেশ সহজ, এককলীনের পরিবর্তে এক বছরের সাপ্তাহিক অথবা মাসিক কিস্তিতে হওয়ার ফলে গৃহীত ঋণ সুদ বা লাভসহ ফেরত দেয়ার সুযোগ রয়েছে। ফলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা মহাজনী ঋণের বিপরীতে এবং ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহণ দুরূহ হওয়ায় ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ঋণ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী অতি সহজেই আগ্রহ ভরে গ্রহণ করে। এজন্য যথাযথ তদারকি ও কল্যাণময় শর্তে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে বাংলাদেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। আর তাদের জীবনমান উন্নয়ন হলেই কেবল তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সহজেই সম্ভব হবে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের যাত্রা শুরু হলেও এর পদ্ধতিগত ত্রুটি ও উচ্চ হারে লাভ প্রাপ্তির জন্য ক্ষুদ্রঋণের সুফল প্রকৃত অর্থে নিশ্চিত করা যায় নি। এজন্য সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যের চক্র থেকে রেব করে আনতে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে আত্ম-কর্মসংস্থান ও স্বাবলম্বী করার যে পদক্ষেপ তা প্রকৃত অর্থে সফলতা নিশ্চিত করতে পারে নি। এক্ষেত্রে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত

মানুষদেরকে যে পরিমাণ ঋণ প্রদান করে তা যুক্তিসঙ্গত নয়। ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ প্রাথমিকভাবে সর্বনিম্ন ৫,০০০.০০ টাকা থেকে শুরু হয়ে সর্বোচ্চ ৩৫,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত পেতে পারে। অন্য এক তথ্যে দেখা গেছে, ক্ষুদ্রঋণের পরিমাণ ৫,০০০.০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২০,০০০.০০ পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমকিভাবে ৫,০০০.০০ থেকে সর্বোচ্চ ১৫,০০০.০০ পর্যন্ত টাকা ঋণ দেয়। এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এত অল্প পরিমাণ অর্থ দিয়ে একটি দরিদ্র পরিবার কীভাবে সচ্ছল হয়ে উঠতে পারে। যেখানে ঋণকৃত টাকা নেয়ার শুরু থেকেই সুদসহ তা পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ঋণ হিসেবে যে টাকা কোন ঋণগ্রহীতার জন্য বরাদ্দ করে, তা সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের এই পদ্ধতিটি সহজ, কিন্তু প্রকৃত অর্থে কল্যাণকারী ও উপকারী নয়। এক বছরের জন্য কোনো টাকা ঋণ নিলে উক্ত ঋণ গ্রহণকারীর স্বাভাবিকভাবে এক বছর ভোগ করার অধিকার থাকার কথা, কিন্তু ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে তা হয় না বরং পুরো টাকার উপর এক বছরের সুদ নির্ধারণ করে টাকা প্রাপ্তির পূর্বেই ১ম কিস্তির টাকা সুদসহ কেটে রাখা হয়। এভাবে ধারাবাহিক কিস্তি দেয়ার ফলে ঋণ গ্রহীতা কেবল শেষ কিস্তিটাই একবছর ভোগ করার সুযোগ পান। বাকি সমুদয় টাকা মেয়াদ পূর্তির আগেই সুদসহ পরিশোধ করতে হয়। ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রথম সপ্তাহে আদায়কৃত টাকা পরবর্তীতে আরো এক ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ফলে একই টাকা একাধিক ব্যক্তিকে কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে ঋণ হিসেবে এক বছরের জন্য প্রদান করে এবং এক বছরের সুদ হিসাব করে ঋণ প্রদানের সময় থেকেই সুদসহ টাকা আদায় করে। এভাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ একই পুঁজি প্রায় একই মেয়াদে বিভিন্ন জনের নিকট বার বার বিনিয়োগ করে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকেই একই হিসাবে সুদ আদায় করে থাকে। যা অত্যন্ত যুক্তিহীন ও অবিবেচনাপ্রসূত। এই পদ্ধতিটি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দরিদ্র জনসাধারণের কাছ থেকে ক্ষেত্র বিশেষ প্রায় ৩০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত সুদ নিয়ে থাকে। অন্য গবেষণা বলছে যে, গড়ে প্রদানকৃত ঋণের উপর সুদ প্রায় ২৪ শতাংশ, ক্ষেত্রে বিশেষ সুদের হার প্রায় ২৪-৪০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে যায়। আবার কখনো কখনো সার্বিক দিক মিলিয়ে সুদের হার ৬৫ শতাংশ এর বেশিও হয়ে যায়।

ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মহিলাদেরকেই ঋণ প্রদান করতে আগ্রহী হয়। কারণ মহিলাদের ঋণ দেয়ার ব্যাপারে দু'টি বিষয় তাদের কাছে প্রণিধানযোগ্য হয়। একটি হলো যে, নারীর ক্ষমতায়নের যে স্লোগান নিয়ে এনজিওগুলো কাজ করছে তার একটা ন্যায্যতা তৈরি করা এবং অন্যটি হলো মহিলাদের ঋণ দিলে যেকোনো মূল্যে এবং যেকোনো উপায়ে ঋণ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা। ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশের দরিদ্র নারীরা দলে দলে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু ক্ষুদ্রঋণের জটিল প্রক্রিয়া তাদেরকে নিপতিত করেছে গভীর পারিবারিক ও সামাজিক সংকটে। নারী সদস্যরাই ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ

করে তা সংসারেই ব্যয় করে এবং ঋণের টাকা কিস্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করে। ঋণ পরিশোধের সময় দরিদ্রতার সংসারে পরিবারকে নানা রকম অসৌজন্যমূলক ও অমর্যাদাকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। কারণ এনজিওগুলো বিতরণকৃত ঋণ আদায়ে কখনো কখনো অতি কঠোরতা অবলম্বন করে। এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে সময় মতো কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে ঋণ প্রদানকারী সংস্থার লোকজন ঋণ গ্রহীতাদের উপর অমানবিক চাপ সৃষ্টি করে। যেকোনো মূল্যে তাদের থেকে ঋণ আদায়ের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা ঐ সমিতির[৬৮৭] অন্য সদস্যদের দিয়েও চাপ সৃষ্টি করে। এসব করে যখন তারা প্রদেয় ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয় তখন সমিতির লোকজন ঋণ গ্রহীতার আসবাবপত্র, গাবদি পশু এমনকি ঘরের টিন পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়। কখনো কখনো এমনও খবর হয় যে, ঋণের কিস্তি পরিশোধ করার জন্য নিজের সন্তান পর্যন্ত বিক্রি করেছে।[৬৮৮] এমন অনেক ঘটনাও আছে যে, ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে ঋণ গ্রহীতা আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিয়েছে।[৬৮৯] ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে অনেক সময় ঋণগ্রহীতা ঘর-বাড়ি ফেলে বাড়ি থেকে পালিয়েও যায়। ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিয়মিত ঝগড়া লেগে থাকে। যার প্রভাব পড়ে পুরো সংসারের উপর। সন্তানদের সামনে বাবা-মার মধ্যে মনোমালিন্য তাদের উপর এর বিরাট খারাপ প্রভাব ফেলে। কখনো কখনো এসব কারণে অনেকের সংসার ভেঙেও যাচ্ছে। সামাজিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত ব্যাপক। দেশের গ্রামগঞ্জের মানুষ আবহমানকাল ধরে বিভিন্ন পরিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা করে আসছে, কিন্তু সুদভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এ সকল রীতিনীতি ও মূল্যবোধে কুঠারাঘাত করছে। দরিদ্র পরিবারগুলোতে পরিবারব্যবস্থার যে উন্নত মূল্যবোধ ছিল সমিতির সদস্য হয়ে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করায় তা দিন দিন শিথিল হয়ে পড়েছে। ফলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা এ পরিবারগুলোতে রীতি অনুযায়ী ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিক অনুশাসন মেনে চলার যে স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল তা দিন দিন অবক্ষয়ের দ্বারপ্রান্তে চলে গেছে। এর ফলে আবহমানকালের মূল্যবোধকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় নিয়ে আসা হয়েছে। এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ধর্মভিত্তিক সামাজিক মূল্যবোধের কারণে সুদের প্রতি এদেশের মানুষের স্বাভাবিক একটা ঘৃণাবোধ ছিল। সুদখোরদের সমাজে ঘৃণা করা হতো। মানুষ এমনভাবে তাদের ঘৃণা করতো যে, তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়তেও মানুষ পছন্দ করতো না। অথচ প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণব্যবস্থায় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুদের কারবার ছড়িয়ে দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধে কুঠারাঘাত করা হয়েছে।

---

[৬৮৭] ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়মানুযায়ী ঋণ প্রদানের জন্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে একটি সমতি গঠন করে। পরবর্তীতে কিছু নিয়ম মেনে ঐ সমিতির সদ্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়।

[৬৮৮] jagonews24.com/country/news/616004, ২০/০৩/২০২১

[৬৮৯] bd-pratidin.com/country/2020/10/28/581601, ২০/০৩/২০২১

বর্তমানে দেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসায় আগ্রহী। লাভজনক ব্যবসা হওয়ায় ছোট ছোট অনেক ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। এর মাধ্যমে মূলত দেশের আবহমানকাল থেকে চলে আসা ঋণের মহাজনী প্রথাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে আসা হয়েছে মাত্র। দারিদ্র্যের সুযোগে এ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আইন ও নিয়ম-নীতির আওতায় সমাজে নব্য মহাজন হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। ঋুদ্রঋণের ব্যবসা করা খুবই সহজ একটি কাজ। এর নিবন্ধন পদ্ধতিটা বেশ সহজ। সে কারণে এ ব্যবসায় আগ্রহী কিছু মানুষ কিছু পুঁজি বিনিয়োগ করে সরকারের যেকোনো নিবন্ধন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে একটা নিবন্ধন নিয়েই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। ঝুঁকিহীন ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসায় উচ্চ সুদে ঋণ প্রদান করা হয় এবং সুদের চক্রবৃদ্ধি হারে তা আদায় করা হয়। ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের পদ্ধতি, মান ও কাজের ধরন বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানব সেবার পরিবর্তে শুধু ব্যবসায়িক লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ প্রদানের নামে যে উচ্চহারে সুদ আদায় করছে, তা সামন্তযুগীয় মুনাফাখোরী ও মহাজনী সুদি কারবারে সাথে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাগণ এনজিওগুলোর আর্থিক শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছেন। দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষুদ্রঋণ সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তেমন কোনো অবদান রাখতে পারছে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোথাও দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী এক বা একাধিক ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে কিস্তি চালানোর জন্য অন্য আর এক বা একাধিক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে, ফলে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ আর কোনো প্রতিষ্ঠানের ঋণই সঠিকভাবে পরিশোধ করতে পারে না। তখন ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং আর কখনো দারিদ্র্যের বেষ্টনি থেকে বের হয়ে আসতে পারে না।

সমগ্র বাংলাদেশে হাজার হাজার এনজিও সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন করার মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এতদসত্ত্বেও প্রান্তিক দরিদ্র, বস্তিবাসী, ভাসমান মানুষ ও পথশিশু প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক এনজিওগুলো মূলত ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পে বিনিয়োগ করায় দেশের এ সকল সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বাইরে থাকে। কারণ এ সকল জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিলে তা ফেরত পাবে না এ আশঙ্কায় এনজিওগুলো এদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। তারা মূলত ঐসব মানুষদেরকে ঋণ দেয়, যারা তাদের গৃহীত ঋণ নির্ধারিত লভ্যাংশসহ ফেরত দিতে পারে বা এনজিওগুলো আদায় করতে সক্ষম। মূলত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করার কারণে এদেশের সুবিধাবিঞ্চতদের উন্নয়নে এনজিওগুলো কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখতে পারছে না। এক্ষেত্রে এনজিওদের এই মনোবৃত্তি থেকে রেব হয়ে আসতে হবে। শুধু বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষদের জীবনমান উন্নয়নকল্পে

বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। দেশের এনজিওগুলোকে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থেকে বের হয়ে শুধু সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। এজন্য এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করা এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে এক একটি এলাকাকে নির্ধারণ করে সবাই মিলে সেখানকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করতে হবে। এভাবে সমগ্র বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক দারিদ্র্যের অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প নিয়ে ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নত করতে হবে।

বর্তমানে দেশের সুববিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যে প্রতিষ্ঠানগুলো দেশব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে তাদের কাজের সার্বিক দিক মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, দরিদ্র ও বেকার জনগণের আত্ম-কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি আকর্ষণীয় স্লোগানকে সামনে নিয়ে সাহায্য সংস্থা ও এনজিওগুলো পরিচালিত হলেও প্রকৃত পক্ষে এদের লক্ষ্য এটা নয় যে, দরিদ্রতা একেবারে বিমোচন হয়ে যাক। কারণ প্রকৃত সত্য এই যে, এ প্রতিষ্ঠানগুলো এবং তাদের দাতা সংস্থা দারিদ্র্য নিয়ে বাণিজ্য করে যাচ্ছে। এজন্য এ খাতে অর্থ বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণের যাত্রা শুরু হলেও সময়ের ব্যবধানে তা উচ্চ হারে সুদি কারবারে পরিণত হয়েছে। এখন যদি কোনোভাবে দেশের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রকৃত অর্থে দারিদ্র্য বিমোচন হয়ে যায় এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে এই সেক্টরে এ লাভজনক ব্যবসা করা আর সম্ভব হবে না। তখন এদেশে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর আর কোনো প্রয়োজনও হবে না। কারণ সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র জনগোষ্ঠী যদি না থাকে তবে এ সকল উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কোনো কাজ থাকবে না। তাই একথা বলা যায় যে, এ প্রতিষ্ঠানগুলোর টিকে থাকার জন্য হলেও এদেশে দারিদ্র্যের প্রয়োজন রয়েছে। আর সেভাবেই তারা ঋণ প্রদান এবং সাহায্য-সহযোগিতার নীতি নির্ধারণ করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যালোচনা

বাংলাদেশে যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদেশে যাকাত প্রদান ও যাকাতের অর্থ সংগ্রহের কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। যাকাতভিত্তিক দু'একটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও এগুলোর কার্যক্রম নেই বললেই চলে। বেশিরভাগ মানুষই ব্যক্তিগত উদ্যোগে অপরিকল্পিতভাবে যাকাত প্রদান করে। কোথাও খুবই হাঁক-ডাক করে শাড়ি, কাপড় এবং খুব কম করে নগদ অর্থও যাকাত হিসেবে দেয়। যাকাতের কাপড় আনতে গিয়ে এদেশে পদপৃষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনাও রয়েছে। এদেশে সারকারিভাবে যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান খুব বেশি গড়ে উঠেনি। যাকাত বোর্ড নামে সর্ব সাধারণের কাছে পরিচিতিহীন একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। স্বচ্ছতার অভাবে যাদের কার্যক্রম খুবই সীমিত। আর বেসরকারি উদ্যোগে যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সম্ভবত গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী না হওয়ার কারণে এদেশের মুসলিম জনগণ সালাত, রোযা ও হজের যে গুরুত্ব বুঝে, যাকাতের বেলায় অতটা বোঝে না বা বুঝতে চায় না। কেউ টাকার যাকাত দেন তো ফসলের যাকাত দেন না, আবার স্বর্ণের যাকাত দেন তো ব্যবসার যাকাত দেন না। এসবের মধ্যেও কিছু আশার আলো আছে, বর্তমানে কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তারা তাদের নিজেদের উদ্যোগে মানুষের কল্যাণে যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে, যার মাধ্যমে তারা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বিদেশি কিছু যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা শুধু রিলিফ কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে। যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় বা যুদ্ধবিধ্বস্ত শরণার্থীর আগমন হয়, তখন এ প্রতিষ্ঠানগুলো এ সকল বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। সাধারণত পরবর্তীতে ঐসব ভুক্তভোগীদের নিয়ে তাদের আর কোনো সুদূরপ্রসারী কাজ থাকে না, শরণার্থীরা যতদিন থাকে তত দিন তারা সেখানে সহায়তার হাত প্রসারিত করে, কিন্তু এই শরণার্থীদের দিয়ে আয় বর্ধনমূলক কোনো কাজে তাদের সম্পৃক্ত করে না। এক্ষেত্রে দেশি কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুদান দিয়ে জীবিকায়ন কর্মসূচি শুরু করেছে। এটি একটি ভালো উদ্যোগ। এই প্রতিষ্ঠানগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে প্রচলিত এনজিওর চেয়ে বেশি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। যদিও সেইভাবে এখনো এদেশে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্রদের দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতভিত্তিক কাজগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়ে উঠেনি তবুও কিছু কাজ হচ্ছে, যা অবশ্যই ইতিবাচক এবং ভবিষ্যতে যাকাতভিত্তিক কাজের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষুদ্র পরিসরেও কিছুসংখ্যক উপকারভোগীদের হতদরিদ্রের হাত থেকে আপাতত রক্ষা করতে পারছে। এ সকল প্রকল্পে উপকারভোগীদের মাঝে এমন অনেকে আছেন যারা প্রচলিত সুদভিত্তিক এনজিও থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করে বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন, এখন যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য নিয়ে দায় শোধ করেছেন এবং নিজেকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক পেশায় নিয়োজিত করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। যাকতভিত্তিক এ প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা কর্মসূচি, জীবিকায়ন কর্মসূচি, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, পুনর্বাসন সেবা কর্মসূচিসহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে

দীর্ঘ মেয়াদী হলেও দারিদ্র্য বিমোচন করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজের মাধ্যমে আস্তে আস্তে মানুষের আস্থা অর্জন করছে। তারা অনেক প্রান্তিক দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনে সহায়তা করে যাচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান অনেক মানুষের স্বপ্ন পূরণের সাথী হিসেবে কাজ করছে। তাদের বিভিন্ন প্রকল্পে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সুবিধাভোগী হচেছ। এক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানগুলো যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা অবশ্যই ভালো ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এতদসত্ত্বেও যাকাতভিত্তিক কল্যাণময় এ টেকসই প্রকল্প দিয়ে যে পরিমাণ দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করার সুযোগ ছিল তা করতে প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। এর একটি বড় কারণ এদেশের যাকাত প্রদানকারী মানুষের কাছে যাকাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো অপরিচিত এবং এগুলো সেভাবে আস্থা অর্জন করতে পারে নি। এছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানগুলোর আহ্বান খুব বেশি মানুষের কাছে তারা পৌঁছাতেও পারে নি এবং তারা যে পদ্ধতিতে তাদের প্রকল্পগুলো পরিচালনা করে সেগুলোর মধ্যে আকর্ষণীয় কোনো পদ্ধতি বা প্রকল্প এখানো সেভাবে প্রকাশ বা চালু করতেও পারেনি। ফলে যাকাত প্রদানকারীরা এখনো এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত দিতে আগ্রহী হচ্ছে না। যাকাতভিত্তিক এ প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত তাদের কাজের ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু কাজের পদ্ধতির সাথে মিল রেখে আরো কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করে তাদের কর্মসূচিগুলো পরিচালনা করছে। তারা দারিদ্র্য বিমোচনে নুতনত্বের মাধ্যমে টেকসই কোনো প্রকল্প এখনো চালু করতে পারেনি, যা দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য খুবই উপকারী হয় এবং সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগাতে পারে। তাই এ ব্যাপারে যথেষ্ট গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ সুবিধাবঞ্চিতদের পুনর্বাসনে প্রস্তাবনা

আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের মধ্যে রয়েছে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণি। এই দুই শ্রেণির মানুষের মধ্যে সামাজিক অবস্থানেও ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান। এই ব্যবধান কমিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করার জন্য এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একটি জীবনব্যবস্থা নির্ধারণ করে বলেছেন, "নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত জীবনবিধান।"[৬৯০] এই ইসলামী জীবনবিধানে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের দিক-নির্দেশনা সর্বোত্তমভাবে দেয়া হয়েছে। এখানে মানুষের প্রয়োজনীয় সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থাসহ সব বিষয়ের বর্ণনা সুস্পষ্ট করা হয়েছে।[৬৯১] পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ধনী-দরিদ্রের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবধান প্রয়োজন। এই ব্যবধান না থাকলে এবং অর্থনৈতিকভাবে সবাই সমান হলে মানুষ মানুষের প্রয়োজনে এগিয়ে আসত না; একে অন্যের কাছাকাছি এসে মমতা, ভালোবাসা, প্রীতি ও বন্ধনে আবদ্ধ হতো না। একে অপরের অধীনে চাকরি করত না, একে অপরের দারস্থ হতো না। সমাজব্যবস্থায় প্রকৃতভাবে ভারসাম্য থাকত না।[৬৯২] এজন্য মানবজাতির কল্যাণের প্রয়োজনে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষের মাঝে অর্থনৈতিক ব্যবধান দিয়েছেন। যে ব্যবধানের উপর ভিত্তি করে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা হয়। এ অর্থনৈতিক ব্যবধানের কারণে মানুষ একে অন্যের প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে মানবিকতায় উজ্জীবিত মানবসভ্যতাকে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করছে। এজন্য ইসলামী জীবনবিধান সর্বকাল ও সর্বস্তরের চেয়ে আধুনিক ও অগ্রগামী, যা মানবজাতির সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য প্রেরিত।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ায় এর মধ্যে মানবজাতির সকল বিষয়ে সঠিকভাবে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী জীবনব্যবস্থায় পূর্ণ জবাবদিহিতামূলক অর্থনৈতিক জীবনদর্শন ও অর্থনীতির মৌলিক নীতিমালা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন।[৬৯৩] যে নীতিমালার উপর ভিত্তি করে মানুষ তার প্রয়োজন মতো যুগোপযোগী অর্থব্যবস্থা নির্ধারণ করতে পারে। কারণ ইসলামী অর্থব্যবস্থার একমাত্র মৌলিক উৎস হলো আল-কুর'আন ও আস-সুন্নাহ। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা সেই নীতিমালার ভিত্তিতে যুগে যুগে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে।[৬৯৪] এক্ষেত্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে মানুষের মাঝে অনেকটা সাম্য প্রতিষ্ঠা করা।[৬৯৫] এখানে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মতো ব্যক্তির

---

৬৯০ আল কুর'আন, সূরা আল ইমরান: ১৯

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

৬৯১ ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৬৯২ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৬৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

৬৯৪ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা-২০০০, পৃ. ১৬

৬৯৫ সাইয়েদ কুতুব, *ইসলামের স্বর্ণ যুগে সামাজিক ন্যায়-নীতি*, স্মৃতি প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, ঢাকা-২০০৫, পৃ. ৯৩

অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয় নি। আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মতো সকল কিছুই রাষ্ট্রিক করে বঞ্চিত মানুষদের শোষণের শিকারে পরিণত করা হয় নি। এখানে ব্যক্তির জবাবদিহিতামূলক উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এজন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থা পৃথিবীতে বিরাজমান বৈষম্য দূরীভূত করে সকল প্রকার শোষণ, জুলুম ও বঞ্চনা মুক্ত সামঞ্জস্যশীল কল্যাণময় একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।[৬৯৬] যেখানে সকল মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষিত হবে এবং মানবিক বিভাজন ও বৈষম্য দূর হবে। তাছাড়া আর কোনো অর্থব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক জীবনদর্শন মানুষের মাঝে বৈষম্য দূর করতে পারে না। এক্ষেত্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক দর্শন হচ্ছে, ধনীদের সম্পদে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত যাকাতব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যাকাতব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগ ছাড়া বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়। এজন্য সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই যাকাতব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগ করতে হবে। আর যাকাতব্যবস্থার পরিপূর্ণ প্রয়োগের জন্য যাকাত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই। কারণ যাকাত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

প্রথম অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংক স্থাপনের প্রস্তাবনা

যাকাত ব্যাংক

(সুবিধাবঞ্চিতদের ব্যাংক)

- **ভূমিকা**

বাংলাদেশ মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এ দেশের জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ দারিদ্রের মধ্যে নিপতিত রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে লাখ লাখ শিশু। সুবিধাবঞ্চিত এসব (প্রান্তিক দরিদ্র) মানুষ দরিদ্রতার নির্মম কাষাঘাতে জর্জরিত। তারা প্রয়োজনীয় খাবারের অভাবে অর্ধভুখ ও অভুক্ত হয়ে জীবনযাপন করে। অথচ দরিদ্র-সুবিধাবঞ্চিত এ মানুষগুলো এই সমাজ ও সভ্যতার অংশ। তাদের কোনো অধিকার নেই, নিরাপত্তা নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কেবল কষ্ট দুঃখ তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এ সকল জনগোষ্ঠী জীর্ণ বস্ত্র ও শীর্ণ শরীর নিয়ে বসবাস করে। এখানকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুরাও পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও ক্ষতিকর পরিবেশে কাজ করে,

[৬৯৬] বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, *ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা-২০০৩, পৃ. ১৩০

কিন্তু বাংলাদেশে এ সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য নির্মোহ কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেই। এমনকি তাদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নির্ধারিত কোনো প্রতিষ্ঠানও নেই। যেহেতু তারা আমাদের সমাজের একটি বিশেষ অবস্থানে বাসবাস করে যেটা সমাজের স্বাভাবিক গতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, সেহেতু তাদের জন্য অবশ্যই বিশেষ কিছু থাকা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে তাদের প্রয়োজন পূরণ হতে পারে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হতে পারে। একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের জন্য স্বাভাবিক মৌলিক চাহিদা পূরণ একান্ত প্রয়োজন। এমনকি যদি তারা রাষ্ট্রের নাগরিক নাও হয় তবুও তাদের জন্য স্বাভাবিক মৌলিক চাহিদা পূরণ করা মানবীয় দাবি। এটি একটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জন্য যেমন আবশ্যিক দায়িত্ব, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রে অবস্থানরত স্বচ্ছল প্রতিটি মানুষের জন্যও আবশ্যিক দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সেই প্রতিষ্ঠানটিই হলো যাকাত ব্যাংক। এজন্য যাকাত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- **যাকাত ব্যাংকের লক্ষ্য**

আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদের নির্ধারিত খাতের সমন্বিত ও বহুমাত্রিক প্রয়োগের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত থেকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখা।

- **যাকাত ব্যাংকের উদ্দেশ্য**

আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অধিকার বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট খাতসমূহ নির্ধারণ করেছেন। সেই খাতসমূহ থেকে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আদায় করে তা অধিকার প্রাপ্তদের মাঝে বণ্টন করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করার মাধ্যমে যোগ্য, দক্ষ ও নৈতিক মানসম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে তোলা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

- **যাকাত ব্যাংকের কর্মসূচি**

১) সুবিধাবঞ্চিত হতদরিদ্র মানুষের অর্থ সহায়তা করার মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাস করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

২) সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র, অসহায় ও আশ্রয়হীন মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণমূলক নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

৩) রোগাগ্রস্ত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সেবাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।

৪) মানুষদের যাকাত সম্পর্কে সচেতন করা ও যাকাত আদায়ে সচেষ্ট রাখা।

৫) সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মানবিক সাহায্যমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা এবং দেশের ভবিষ্যৎ এ প্রজন্মকে মানসম্পন্ন উন্নত শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আগামীর বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৭) দেশব্যাপী যাকাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮) সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

৯) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নীতি-নৈতিকতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষাদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।

১০) সুবিধাবঞ্চিত ও হতদরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচির আওতায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা।

১১) বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সুপেয় পানির চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলবর্তী লবণাক্ত এলাকাগুলোতে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করা।

১২) জনসাধারণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা বিশেষত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের চিকিৎসা সেবা প্রদান কারার জন্য শহরের পাশাপাশি প্রান্তিক অঞ্চলেও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

১৩) পরিবেশের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং পরিবেশের ক্ষতিকর কার্যক্রম থেকে জনসাধারণকে বিরত রাখার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১৪) প্রাকৃতিক দূর্যোগে আক্রান্তদের জন্য দুর্যোগসহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রাক দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী করণীয় বিষয়ে গণসচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১৫) যেকোনো মানবিক ও কল্যাণমূলক কাজ করা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা

সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাত ব্যাংকের প্রয়োজনীয় রয়েছে। অন্য ব্যাংকের মতো যাকাত ব্যাংক শুধু একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়। এমনকি যে সমস্ত বিশেষায়িত ব্যাংক রয়েছে সেগুলোর মতোও নয়। "যাকাত ব্যাংক এমন একটি সমন্বিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে উৎপাদনমুখী করার সাথে সাথে তা বাজার ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় করে চলমান আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে

নিরাপত্তা দিবে এবং মানবসম্পদের সুরক্ষায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করবে।"[৬৯৭] যাকাত ব্যাংক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে এবং এর মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করবে। এটি একাধারে একটি আর্থিক সহায়তা প্রতিষ্ঠান, মানবিক সহায়তাকেন্দ্র, শিক্ষা সহায়তাকেন্দ্র, প্রশিক্ষণ সহায়তাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবা সহায়তাকেন্দ্র, উন্নয়নসহযোগী প্রতিষ্ঠান, অবকাঠামোগত সহায়তাকেন্দ্র ও ব্যবসা সহায়তাকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাত ব্যাংক একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এতে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা থেকে শুরু করে তাদের উপযোগী প্রতিটি পদক্ষেপে এই ব্যাংক কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। এই ব্যাংক এ সকল সক্ষম জনগোষ্ঠীকে নিজ মালিকানায় উৎপাদনব্যবস্থায় নিয়োজিত করে তাদেরকে বাজারব্যবস্থাপনায় যুক্ত করবে, যাতে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পেতে পারে এবং একই সাথে নিজেদের সামাজিক অবস্থান উন্নতর পর্যায়ে নিতে পারে। এছাড়াও যাকাত ব্যাংক তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবা বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিবে। এর ফলে একদিকে এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে এবং অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতি গতিশীল হয়ে সমৃদ্ধ হতে থাকবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের কার্যক্রম

যাকাত ব্যাংক সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নে সর্বদা তৎপর হবে। বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ব্যাংক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করে দেশের অর্থনীতিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে গড়ে তুলবে। যাকাত ব্যাংকের আয়ের উৎসগুলো হবে, যাকাত, 'উশর, ওয়াক্ফ, হিবা ও দান ইত্যাদি। যাকাত ব্যাংক তাদের কার্যক্রম সূচারুরূপে পরিচালনার জন্য এই ব্যাংকের নীতিমালা ও কার্যক্রমের আলোকে একটি আধুনিক সফটওয়্যার ডেভলপ করবে। এই ব্যাংকের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা অধিকার হিসেবে প্রাপ্য হবে। এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য এই ব্যাংক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

যাকাত ব্যাংক দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার পর তাদেরকে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে যাকাত ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সক্ষমতা পরীক্ষা গ্রহণ

[৬৯৭] গবেষক

করবে। এর ফলাফলের ভিত্তিতে যাকাত ব্যাংক তাদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদান করবে। এই বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালা কঠোরভাবে পরিপালন করা হবে। যাকাত ব্যাংক যাকাতের অর্থ-সম্পদ এবং দানের অর্থ-সম্পদ কোনোভাবেই কাউকে বা অন্য কোথাও বিনিয়োগ করতে পারবে না। এই খাত থেকে আয়কৃত সম্পদ সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় করা হবে। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় যে, যাকাত ব্যাংক বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কীভাবে করবে। এক্ষেত্রে যাকাত ব্যাংক ওয়াক্ফ থেকে আসা অর্থ-সম্পদকে ওয়াক্ফ এর নীতিমালার আলোকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পগুলোতে বিনিয়োগ করবে। এর ফলে প্রকল্প অধিভুক্ত সুবিধাপ্রত্যাশীরা ওয়াক্ফ এর অর্থ-সম্পদ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা পাবে। এছাড়াও দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দানের অর্থ-সম্পদ থেকে আর্থিক বরাদ্দসহ বিভিন্ন সহায়তা পাবে। নিম্নে যাকাত ব্যাংকের অর্গানোগ্রামসহ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেয়া হলো:-

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের অর্গানোগ্রাম

যাকাত ব্যাংক

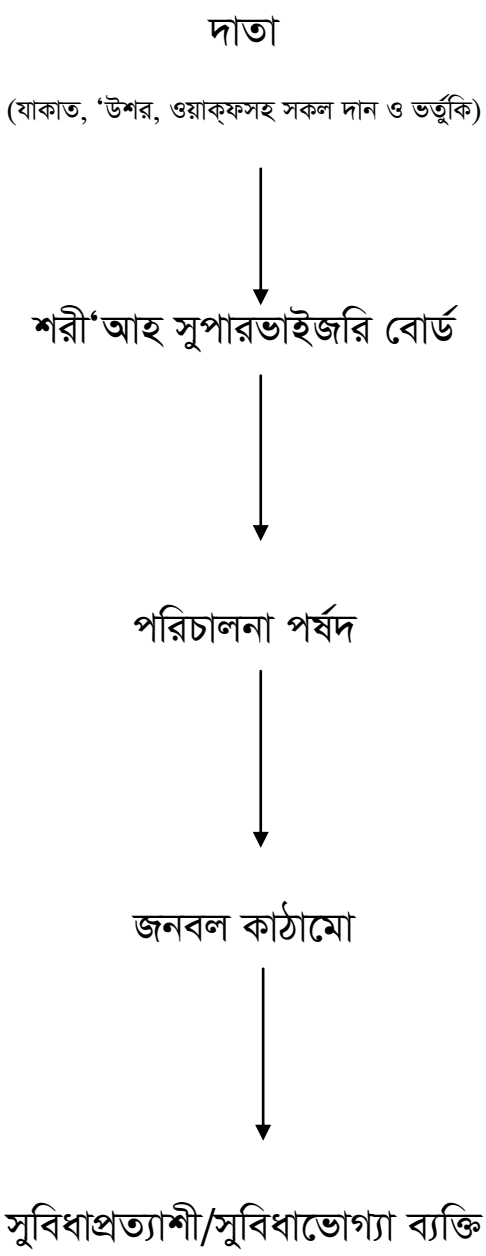

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের আয়ের উৎস

যাকাত ব্যাংকের আয়ের উৎস হবে শরী'আহ মোতাবেক নির্ধারিত আর্থিক খাতসমূহ যেমন– যাকাত, হিবা, ওয়াক্ফ ও অন্যান্য দান।

১) যাকাতযোগ্য সম্পদ

সকল সম্পদের উপর যাকাত ফরয নয়। ইসলামী শরী'আতে কিছু কিছু সম্পদের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে, আবার কিছু কিছু সম্পদকে যাকাতের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। ইসলামী শরী'আতে যে সকল সম্পদকে যাকাতযোগ্য করা হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপঃ-

- স্বর্ণ ও স্বর্ণ দ্বারা তৈরি দ্রব্য ও অলংকার
- রৌপ্য ও স্বর্ণ দ্বারা তৈরি দ্রব্য ও অলংকার
- নগদ, সঞ্চিত বা জমাকৃত অর্থ
- ব্যবসায়ের পুঁজি ও পণ্য সামগ্রী
- উৎপন্ন ফল-ফসল
- গবাদি পশু
- উত্তোলিত খনিজ সম্পদ
- জলজ সম্পদ
- স্থাবর সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয়

- **স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা তৈরি দ্রব্য ও অলংকার, নগদ, জমাকৃত অর্থ এবং ব্যবসায়ের পুঁজি ও পণ্য সামগ্রী এর যাকাত**

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে সম্পদ দিয়েছেন সে সম্পদ মানুষ জমা করে রাখে। আল্লাহ্ মানুষের মাঝে সম্পদের প্রতি মোহ করে দিয়েছেন। আর সেজন্য মানুষ সম্পদ অর্জনের জন্য নিরন্তর ছুটে চলছে। কেউ সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করছে আবার কেউ সম্পদ জমিয়ে রাখছে। মানুষের প্রয়োজন পূরণের পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্থাৎ ৭.৫ (সাড়ে সাত) তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫ (সাড়ে বায়ান্ন) তোলা রুপা অথবা এগুলোর সমপরিমাণ নগদ অর্থ-সম্পদ কারো নিকট পূর্ণ এক বছর গচ্ছিত থাকলে তার উপর ২.৫ (আড়াই) শতাংশ হারে যাকাত ফরয করা হয়েছে। এজন্য উল্লিখিত নিসাবের অধিকারী সম্পদশালীকে উল্লিখিত হারে যাকাত দিতে হবে। আর মানুষের দেয়া যাকাতই যাকাত ব্যাংকের আয়ের উৎস হবে।

- **খনিজ সম্পদের যাকাত**

পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের নিচে মূল্যবান যে সম্পদ রয়েছে সেগুলোকে খনিজ সম্পদ বলে। খনিজ সম্পদগুলো মূলত মহান আল্লাহ্ ভূগর্ভে পুঞ্জীভূত করে রেখেছেন। যেমন, স্বর্ণ, রৌপ্য,

তামা, লোহা, তেল, গ্যাস, পেট্রল, চুনা পাথর, নুড়ি পাথর, শিলা পাথর, কয়লা ইত্যাদি। ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ উত্তোলনের পর উত্তোলন খরচ বাদ দিয়ে যে নীট সম্পদ পাওয়া যাবে তার খুমূস তথা এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ২০ শতাংশ হারে যাকাত দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খনিজদ্রব্যের যাকাত হলো খুমূস তথা এক-পঞ্চমাংশ।"[৬৯৮] এটিও যাকাত ব্যাংকের আয়ের একটি খাত হিসেবে পরিগণিত হবে।

২) হিবা

হিবা ইসলামী শরী'আতে একটি দান করার পদ্ধতি। যেকোনো ব্যক্তি তার নিজের সম্পদ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে দিলে তা হিবা হবে। হিবা অর্থ: "উপহার, দান, দায়মুক্তি, বখশিস, উপঢৌকন, ব্যবহার প্রদত্ত বস্তু ইত্যাদি।"[৬৯৯] অন্যখানে বলা হয়েছে, "হিবা হলো এমন একটি চুক্তি, যার বিষয়বস্তু হলো- কোনো ব্যক্তির সম্পদকে তার জীবদ্দশায় কোনোরূপ বিনিময় ব্যতীত অন্য কাউকে মালিক করে দেয়া।"[৭০০] হিবার ব্যাপারে আরো বলা হয়েছে, "হিবা হলো এমন একটি চুক্তি, যা কারো জীবদ্দশায় কোনোরূপ বিনিময় ছাড়া স্বেচ্ছায় অন্য কাউকে সম্পদের মালিক করে দেয়ার অর্থ বুঝায়।"[৭০১] এ হিবা পদ্ধতির মাধ্যমে যাকাত ব্যাংক সমৃদ্ধ হতে পারে।

৩) ওয়াক্ফ

ওয়াক্ফ আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো, আটকে রাখা, ঠেকানো, বাধা দেয়া ইত্যাদি।[৭০২] ওয়াক্ফ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "ওয়াক্ফ হলো মূল সম্পদকে আটকে রাখা এবং এর উৎপন্ন ফসলকে কাজে লাগানো। অর্থাৎ মূল সম্পদকে অক্ষত রেখে এর লভ্যাংশ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা।"[৭০৩] অন্যখানে বলা হয়েছে "ওয়াক্ফ হলো এমন সম্পদ, যার মূল সম্পদ অক্ষত রাখা এবং যার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব, যা ওয়াক্ফকারীর অথবা অন্য কারো তত্ত্বাবধানে বিদ্যমান বৈধ খাতে ব্যয় করা হবে অথবা উক্ত সম্পদ ব্যবহার করে প্রাপ্ত লভ্যাংশ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন পুণ্য ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হবে, আর এর

---

[৬৯৮] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ৪র্থ খণ্ড, (অনু: ইফাবা) কিতাবুল মুসাকাহ, বাবু মান হাফারা বিরান ফী মিলকিহি লাম ইয়াদমানু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وفي الركاز الخمس"

[৬৯৯] মুহাম্মাদ ইবন মুকারআম আল মিসরী ইবন মানযূর, *লিসান আল 'আরব*, ১ম খণ্ড, দার সাদির, বৈরুত-১৯৯৬, পৃ. ৮০৩

[৭০০] আস সাইয়্যিদ আস সাবিক, *ফিকহ আস সুন্নাহ*, ৩য় খণ্ড, দার আর রাইয়্যান লিত তুরাছ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো-১৯৯০, পৃ. ৫৩৪

[৭০১] ড. ওয়াহ্বাহ আয যুহায়লী, *আল ফিকহ আল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪০

[৭০২] ইবনে মানযূর, *লিসান আল 'আরব*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

[৭০৩] আস সাইয়্যিদ আস সাবিক, *ফিকহ আস সুন্নাহ*, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫

ভিত্তিতেই উক্ত সম্পদ ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানার হুকুমে আবদ্ধ হয়ে যাবে।"[৭০৪]

ইসলামে ওয়াক্‌ফের যেমন ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি রয়েছে এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব। ওয়াক্‌ফ মূলত বিশেষ এক ধরনের দান। ইসলাম ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে। যিনি সম্পত্তি দান করবেন, তাকে ওয়াক্‌ফি তথা ওয়াক্‌ফকারী বলা হয়। তাকে সম্পত্তি দান করার উপযুক্ত হতে হবে, যেমন- প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন হওয়া, যে সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা হবে তার নিরঙ্কুশ মালিক হওয়া, স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ওয়াক্‌ফ করা ইত্যাদি। আর যে সম্পত্তি দান করা হবে, তাকে মওকুফ বলা হয়, তা যেকোনো ধরনের সম্পদই হতে পারে। তবে উক্ত সম্পদ ওয়াক্‌ফকারীর নিরঙ্কুশ মালিকানাধীন থাকতে হবে। এছড়াও যিনি সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করবেন তিনি স্পষ্টভাবে ওয়াক্‌ফ করার ঘোষণা দিবেন, তা মৌখিক হোক বা লিখিত হোক। উক্ত ঘোষণায় তিনি ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্য, সম্পত্তির পরিমাণ, কার বরাবর ওয়াক্‌ফ করবেন, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তিকে তত্ত্বাবধান করবেন, ওয়াক্‌ফের কোনো শর্ত থাকবে কি না ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করবেন। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে মৌখিক ওয়াক্‌ফের চেয়ে লিখিত ওয়াক্‌ফই বেশি শ্রেয়। তবে এই পদ্ধতিগুলো বেশি সম্পদ ওয়াক্‌ফের জন্য প্রযোজ্য হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওয়াক্‌ফের জন্য এটি মানা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

- **ওয়াক্‌ফ দুই প্রকার**
  - ❖ **ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ**

ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পরকালে শান্তির আশায় ইহকালে জনগণের কল্যাণে যে ওয়াক্‌ফ করা হয়, তাকে ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ বলা হয়।

  - ❖ **ওয়াক্‌ফ 'আলাল আওলাদ**

কোনো ব্যক্তি তার সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করে এর আয় হতে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে তার বংশধর বা পরিবারের সদস্যদের অথবা তার নিজের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারেন। এরূপ ওয়াক্‌ফকে ওয়াক্‌ফ 'আলাল আওলাদ বলা হয়।

৪) **দান-সাদকা**

দান-সাদকা হলো দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য মানুষের ঐচ্ছিক দান। এই দান-সাদকা মানুষ যেকোনো সময় যেকোনো অবস্থায় করতে পারে। এই সাদকা বা দানের

[৭০৪] ড. ওয়াহ্‌বাহ আযযুহায়লী, *আল ফিকহ আল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, ১০ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অনেক সাওয়াব রেখেছেন এবং এটি এমন মূল্যবান সাওয়াব যে, দানকারী ব্যক্তি কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ্র আরশের ছায়ায় থাকবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে দিন আল্লাহ্র (রহমতের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। (এর মধ্যে একজন হলেন), সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না।"[৭০৫]

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের গঠন ও কার্যক্রম

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাতের বহুমুখী কল্যাণকর দিক রয়েছে। তন্মধ্যে যাকাতের মৌলিক দর্শন হচ্ছে দারিদ্র্য থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা। সমাজে যারা বঞ্চিত ও দরিদ্র তাদের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের ব্যবস্থা করেছেন। সেই যাকাতলব্ধ সম্পদকে যাকাত ব্যাংকের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্রদের জন্য কল্যাণকর বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যয় করা হবে। এই কাজ করতে গেলে তা অবশ্যই একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে মূলত যাকাত আদায় ও বণ্টনের দায়িত্ব সরকারের। ইসলামের বিধান অনুযায়ী সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ যথাযথভাবে হিসাব করে ধনী ও বিত্তশালীদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে। এরপর তা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান মোতাবেক প্রকৃত প্রাপকের নিকট পৌঁছে দেয়। এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র নেই বা কোন রাষ্ট্র যাকাত আদায় করে না এবং সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চাহিদা, রুচি ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে সেহেতু যাকাত আদায় ও বণ্টন করার বিষয়ে শরী'আতের বিধি-বিধান ঠিক রেখে সরকারের তত্ত্বাবধানে যাকাত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যাকাত ব্যাংকের মাধ্যমে যাকাতের অর্থ সুবিধাবঞ্চিত ও অভাবীদের মাঝে বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক এবং বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে চাহিদা ও উপযোগিতার ভিত্তিতে নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।

- **মৌলিক চাহিদা পূরণ**

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোকে মৌলিক চাহিদা বলে। এই মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ না হলে মানুষ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে এবং পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে না। এজন্য যাকাত ব্যাংকের

[৭০৫] ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ২য় খণ্ড, (অনু: ইফাবা), কিতাবুল আযান, বাবু মান জালাসা ফিল মাসজিদি ইয়ানতাযিরুস সালাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله... ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.

মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো:-

১) খাদ্যের ব্যবস্থা: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য অভাব সবথেকে বড় অভাব। খাদ্য ব্যতীত মানুষের জীবন বাঁচে না। জীবন বাঁচানোর জন্য দরিদ্ররা খাদ্যের সন্ধানে নিরন্তর ছুটে চলে। তারা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য জোগাড় করতে গিয়েই হিমশিম খায়। অনেক ক্ষেত্রে খাদ্য জোগাড় করতে না পেরে অনেক পরিবারের দিন কাটে অনাহারে-অর্ধাহারে। এসব কারণে যে পরিমাণ ক্যালোরি প্রতিদিন প্রয়োজন তা তারা পায় না। ফলে তারা বেশিরভাগই অপুষ্টিতে ভোগে আর এজন্য তারা নানা রোগ-ব্যাধিতেও আক্রান্ত হয়। তারা শীর্ণ শরীর নিয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করে। বিশেষত এখানকার শিশুরা আরো বেশি খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠে। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হওয়ার জন্য যে ভালো পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় ক্যালোরি প্রয়োজন তা না পাওয়ায় তাদের ভবিষ্যৎ ঠিকমতো বিকাশ হয় না। এই জনগোষ্ঠীটি শুধু প্রয়োজনীয় ক্যালোরি যেমন পাচ্ছে না ঠিক তেমনি তারা নিরাপদ পানি পান করা থেকেও বঞ্চিত। বাংলাদেশের দরিদ্র জনপদে, গ্রামেগঞ্জে, বস্তিতে, রেল স্টেশনে, রাস্তার ধারে, বেড়িবাঁধে কিংবা রেললাইনের পাশে বসবাসরত অসংখ্য সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা নেই। তারা বিভিন্ন নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ডোবা, কূপ, ওয়াসার লাইন প্রভৃতির পানি পান করে থাকে, যা অধিকাংশ সময় নোংরা, ময়লাযুক্ত, রোগ-জীবাণুযুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকে। এমনকি গ্রাম-গঞ্জে কিছু অগভীর নলকূপ থেকে যে পানি পান করে তাও নিরাপদ নয়। এসব দূষিত ও অনিরাপদ পানি পান করার ফলে তারা নানা রকম পানিবাহিত কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। তাই যাকাত ব্যাংকের এই প্রকল্প থেকে এ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

২) বস্ত্রের চাহিদা: মানুষের শরীর ঢাকার জন্য পোশাক প্রয়োজন। এটি সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ। পোশাক পরিধান করে লজ্জাস্থান ও শরীর ঢেকে রাখায় মানবজাতি সৃষ্টিকূলের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্ত। অন্য প্রাণিরা কেউ পোশাক পরিধান করে না। মানুষ এবং প্রাণির মধ্যে এটি একটি অন্যতম পার্থক্য। আর মানুষের মাঝে লজ্জাশীলতা ও জ্ঞান থাকার কারণে পৃথিবীর কর্তৃত্ব ও রাজত্ব আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। পোশাক পরে থাকাটা মানুষের মৌলিক সংস্কৃতি ও এটি তার সভ্যতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ। সমাজের মধ্যে যারা পোশাক পরে থাকে না তাদেরকে সবাই পাগল বলে অর্থাৎ মানসিক ভারসাম্যহীনরাই কেবল উলঙ্গ হয়ে থাকে। দরিদ্র মানুষদের মানুষ হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ প্রয়োজন হয়, কিন্তু দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে অনেক সময় তারা তাদের প্রয়োজনীয় পোশাকের

ব্যবস্থা করতে পারে না। এজন্য যাকাত ব্যাংকের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক প্রদান করতে হবে।

৩) বাসস্থানের চাহিদাঃ বাংলাদেশের অসংখ্য দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের তেমন ভালো কোনো আবাসনের ব্যবস্থা নেই। এমনকি তাদের অনেকের মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই নেই। ঢাকা শহরে কিছু মানুষ খোলা আকাশের নিচে বসবাস করে। তাদের নেই কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা। তারা উন্মুক্ত স্থানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটায়, যে কারণে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়। দেশে দরিদ্রতা, অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, নদীভাঙন ইত্যাদির কারণে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েই চলেছে। এ সকল সুবিধাবঞ্চিত মানুষ বস্তিতে, রেল স্টেশনে, রাস্তার পাশে, বেড়িবাঁধে কিংবা রেললাইনের পাশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনেক কষ্টে পরিবার পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করে। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাদের দুর্দশা ও দুর্ভোগের কোনো অন্ত থাকে না। তাই তাদের নিরাপদ বাসস্থানের জন্য যাকাত ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঢাকা শহরে বস্তি এলাকার সরকারি জমিতে একাধিক বহুতল ভবন নির্মাণ করে তাদের আদর্শ আবাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়াও গ্রামগঞ্জে সরকারি জমি অথবা জমি ক্রয় করে আদর্শ গ্রাম তৈরি করে খুবই পরিকল্পিতভাবে সেখানে ১০০-২০০ পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে যতগুলো প্রয়োজন ততগুলো আদর্শ গ্রাম তৈরি করে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৪) স্বাস্থ্যসেবার চাহিদাঃ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত এই মানুষগুলোর স্বাস্থ্যের অবস্থা খুবই শোচনীয়। পর্যাপ্ত খাবার না পওয়ায় অপুষ্টিতে ভোগার কারণে অসুস্থতা তাদের ঘিরে রাখে। এছাড়াও এখানকার শিশু, গর্ভবতী নারী ও বৃদ্ধদের চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য কোনো চিকিৎসা সেবা নেই বললেই চলে। কারণ বর্তমানে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হয় যথেষ্ট অর্থের। সরকরি যে হাসপাতালগুলো রয়েছে সেখানে তারা পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। আর বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা নেয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতিও তাদের নেই। এজন্য যাকাত ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য শহরকেন্দ্রিক যেসব আদর্শ ভবন নির্মাণ করা হবে এবং গ্রামকেন্দ্রিক আদর্শ গ্রাম তৈরি করা হবে সেখানে শুধু দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য হাসপাতাল, কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নত চিকিৎসাসামগ্রী ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও উন্নত চিকিৎসার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের তত্ত্বাবধানে সুবিধাবঞ্চিতদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে।

৫) শিক্ষা গ্রহণের চাহিদাঃ শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। শিক্ষা ছাড়া একজন মানুষ বিকশিত হতে পারে না। শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত একজন মানুষের পক্ষে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। এজন্য

প্রতিটি মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিশেষত বস্তি এলাকার শিশুদের পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও সরকারি উদ্যোগেও তাদের জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। তারা দারিদ্র্যের কবলে পড়ে শিশু বয়স থেকেই জীবিকা উপার্জনের জন্য কাজ করা শুরু করে। অনেক শিশুর আয়ের উপর নির্ভর করে পিতামাতাসহ একটি পরিবারের সংসার ব্যয় নির্বাহ হয়। ফলে তাদের পড়ালেখা করা হয়ে উঠে না। অথচ যদি যাকাত ব্যাংকের নির্দিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে উপযুক্ত স্থানে আবাসিকের ব্যবস্থা করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ভাতা প্রদান করে কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তবে তারা পড়ালেখা শিখে দেশের জন্য বোঝা না হয়ে বরং সম্পদে পরিণত হবে। এছাড়াও এ সকল এলাকাতে বয়স্কদের জন্যও পড়ালেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে সেখানকার বয়স্ক লোকেরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেতে পারে। যদি তা করা সম্ভব হয় তবে তাদের মধ্যে ভালো গুণের সমাবেশ ঘটবে, যা সমাজব্যবস্থাকে সুন্দর রাখতে সহায়ক হবে এবং তারা শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন হবে। এর ফলে তাদের সন্তানদের পড়ালেখা বঞ্চিত রাখতে চাইবে না বরং তাদের পড়ালেখা করানোর ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবে। এজন্য যাকাত ব্যাংকের মাধ্যমে বস্তি এলাকায় এবং গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা যেতে পারে।

- **সাধারণ শিক্ষাবৃত্তি**

বাংলাদেশের প্রান্তিক দরিদ্র পরিবারের অনেক সন্তান প্রখর মেধাবী হয়। যারা পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে তাদের মেধা বিকাশে অগ্রগণ্য হতে পারে, কিন্তু দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে তাদের মেধা থাকা সত্ত্বেও পড়ালেখা করতে পারে না। আবার কিছুটা পড়ালেখা করতে পারলেও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় তারা তাদের মেধা অনুযায়ী ফলাফল পায় না। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা একেবারেই পিছিয়ে রয়েছে। এজন্য যারা দরিদ্র মেধাবী তাদের বাছাই করে যাকাত ব্যাংকের এ প্রকল্প থেকে শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করে তাদের স্বাভাবিক পড়ালেখার ব্যবস্থা করা এবং দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদান করা যেতে পারে।

- **কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও কারিগরি বৃত্তি**

অর্ধ শিক্ষিত ও কম শিক্ষিত দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত তরুণ ও যুবকদের কারিগরি শিক্ষা প্রদানের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এছাড়াও যুব উন্নয়নের কেন্দ্রগুলোকে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্তদের বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা প্রদান করতে হবে এবং প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়াও শিক্ষা

গ্রহণকারীদের সংশ্লিষ্ট কোর্স সম্পন্ন করার সাথে সাথে ভাষার উপর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা শিক্ষা কোর্স করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর ফলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের জন্য দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন স্থানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সহজ হবে এবং পর্যায়ক্রমে তারা সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। তাছাড়াও এদের মধ্যে অনেকেই আত্মকর্মসংস্থানে নিজেরা উদ্যোক্তা হয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র উদ্ভাবন করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে। এজন্য যাকাত ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এ প্রকল্পের আলোকে বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

- **সামাজিক সহায়তা**

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসাবাস করে। কিন্তু সমাজে সকল মানুষই সমান অবস্থানে থাকে না। কেউ হতদরিদ্র, কেউ দরিদ্র, কেউ নিম্নমধ্যবিত্ত, কেউ মধ্যবিত্ত এবং কেউ ধনী। এদের মধ্যে যারা হতদরিদ্র তারা সর্বদা খুবই সমস্যার মধ্যে থাকে। এজন্য সমাজে সম্পদশালীদের কর্তব্য হলো বঞ্চিত এ দরিদ্রদের জন্য সহায়তা প্রদান করা। আর এ সহায়তা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হলে তা হয়ে উঠবে কল্যাণময়।

১) বিবাহ সহায়তা প্রকল্পঃ নারী ও পুরুষ বয়সপ্রাপ্ত হলে বিয়ে দিতে হয়। এটাই ধর্মীয় বিধান ও সামাজিক নিয়ম। বর্তমানে দরিদ্র পরিবারগুলো অর্থের অভাবে ভালোভাবে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন করাতে পারে না। এক্ষেত্রে অতি অভাবী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ঘরের মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরো অনেক বেশি প্রকট। বর্তমানে সমাজে যৌতুক প্রথাকে সহনশীল করে ফেলা হয়েছে। এখন মেয়ে পক্ষকে যৌতুক না দিলেও মেয়েকে এমনভাবে সাজিয়ে দিতে হয় এবং এমন বড় অনুষ্ঠান করতে হয় যে, মেয়ের দরিদ্র পিতার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠে না। এর ফলে অনেক স্থানে বিয়ে ভেঙে যায়। মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে পিতা বেঁচে না থাকলে বিধবা মায়ের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে বিয়ের বয়স হওয়া সত্ত্বেও অনেক মেয়েকে বিয়ে দিতে না পারার কারণে এ সকল দরিদ্র পরিবার কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। এজন্য যাকাত ব্যাংকের সামাজিক খাত থেকে এ ধরনের দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য বিবাহ সহায়তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ প্রকল্পে পাত্রকে অথবা পাত্রীকে যাকাত ব্যাংকের মাধ্যেম বিয়ের ব্যবস্থা করে তাদের সংসার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য তাদের উপযোগী আয় বর্ধনমূলক কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২) ঋণ পরিশোধ প্রকল্পঃ দরিদ্র মানুষগুলো তাদের জীবন ব্যয় পরিচালনার জন্য নিজেদের আয় দিয়ে সংসার ব্যয় নির্বাহ করতে পারে না। এমনকি সচ্ছল ব্যক্তিও অনেক সময় তাদের আয় দিয়ে প্রয়োজন মিটাতে পারে না। এজন্য কখনো কখনো তাদের জীবন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ঋণগ্রস্ত হতে হয়। কখনো কখনো স্বচ্ছল ব্যক্তিও বিপদে পড়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তবে যদি অবস্থা এমন

হয় যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তারা তাদের ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারছে না এবং ঋণ পরিশোধের আপাতত কোনো সক্ষমতাও নেই। এ রকম পরিস্থিতিতে অথবা কোন মৃত্যু ব্যক্তির যদি ঋণ পরিশোধের মতো কোনো সম্পদ না থাকে, কিংবা তার উত্তরাধিকারীগণের উক্ত ঋণ পরিশোধের অবস্থা না থাকে, তাহলে যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে ঋণের দায় থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩) শরণার্থী সহায়তা প্রকল্পঃ বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা নানাভাবে সন্ত্রাসের শিকার। তার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে স্বদেশ ছেড়ে এদেশে আশ্রয় গ্রহণ করছে অগণিত অসহায় নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, যার ধারাবাহিকতা এখনো চলমান। জীবন বাঁচাবার জন্য তারা সহায়-সম্বল ফেলে শুধু জীবন নিয়েই এদেশে এসেছে। তাদের বর্তমান অবস্থা নিদারুণ বিভীষিকাময় এবং ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এ অবস্থায় তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা প্রতিটি মুসলিমের একান্ত দায়িত্ব। এভাবে যখন কোনো শরণার্থী এদেশে আশ্রয়ের জন্য আসবে তাদেরকে যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে হবে। এছাড়াও তাদেরকে শুধু অলস ও বেকার বসিয়ে না রেখে স্বল্প পরিসরে উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে। তারা যে এলাকাতে অবস্থান করছে সেখানে তাদেরকে কীভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়োজিত করা যায় সে ব্যাপারে সমন্বিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এতে করে তারা যেমন আয় বর্ধনমূলক কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নিজেরা উপকৃত হবে, তেমনি তাদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ বহুলাংশে কমে যাবে। আবার এদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের কর্মক্ষমতাকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৪) নৈতিকতা প্রশিক্ষণ ও সামাজিক অবক্ষয় রোধ প্রকল্পঃ মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বিবেককে জাগ্রত করা, এর জন্য প্রয়োজন মানুষের ব্যক্তিসত্তা থেকে পশুত্ব দূর করা। পশুত্বকে দূর করার জন্য প্রয়োজন হয় প্রশিক্ষণের। কারণ প্রশিক্ষণ ব্যতীত কেউ কিছু অর্জন করতে পারে না। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ভালো প্রশিক্ষণের। তাই এ বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ্য উত্তম চরিত্রবান প্রশিক্ষক নিয়োগ দিয়ে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ধর্মীয় শিক্ষা যেহেতু নৈতিকতার প্রধান ভিত্তি, তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের জন্য নৈতিকতাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তাদেরকে যথাযথ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নয়ন সাধন করা যেতে পারে।

নৈতিক প্রশিক্ষণের পর মানুষের জন্য প্রয়োজন হয় শারীরিক ও মানসিক বিকাশের। কারণ কোনো মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ না হলে মানুষ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরে

মানুষের কল্যাণে কোনো অবদান রাখতে পারে না। তাই শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ক্রীড়া, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর এ ধরনের নির্মল বিনোদনের কোনো ভালো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। এক্ষেত্রে যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে এ জনগোষ্ঠীর যথাযথ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাশাপাশি তাদের জন্য বিভিন্ন ইসলামী সংস্কৃতিভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচিরও আয়োজন করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে এ জনগোষ্ঠী নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও মাদকের ভয়াবহ থাবা। যার কারণে তরুণ ও যুব সমাজ ধ্বংসের প্রান্ত সীমায় চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে এ আগ্রাসনে সবথেকে আক্রান্ত হয় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী। এ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাদকের প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ এদেরকে ব্যবহার করে সুযোগ সন্ধানীরা সহজেই তাদের কার্যসিদ্ধি করতে পারে। সুবিধাবঞ্চিত তরুণ ও যুব সমাজ এসব বাজে কাজে জড়িয়ে বিপথগামী হয়ে চরিত্রহীন ও নষ্ট হয়ে যায়। তারা জড়িয়ে পড়ে নানাবিধ অপরাধ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডে। ধীরে ধীরে তারা ধাবিত হয় ধ্বংসের দিকে। এজন্য যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে অপসংস্কৃতি ও মাদকের মারাত্মক পরিণতির ভয়াবহতা এবং কুফল সর্ম্পকে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি মাদকাসক্তি নিরাময়কেন্দ্র স্থাপন করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাদকাসক্ত লোকদের বিনামূল্যে যথাযথ চিকিৎসা, পরিচর্যা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যাতে পারে।

- **পুনর্বাসন কার্যক্রম**

সামাজে এতিম শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও নও-মুসলিমরা মূলত অবহেলিত হয়ে পড়ে। অথচ তাদেরই সবথেকে বেশি সহায়তার প্রয়োজন হয়। কেননা, তারা সকল দিক থেকে অসহায় থাকে। এজন্য এতিম, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও নও-মুসলিমদের পুনর্বাসন করা প্রয়োজন। নিম্নে এ সকল মানুষদের পুনর্বাসনের আলোচনা করা হলো:-

১) এতিম পুনর্বাসনঃ কোনো ব্যক্তির মৃত্যুতে তার শিশু সন্তানরা এতিম হয়ে পড়ে। তখন তাদের তত্ত্বাবধান করে ভরণ-পোষণের জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, তাদের জন্য সাহায্যকারী হিসেবে তেমন কাউকে পাওয়া যায় না। বেড়ে উঠার জন্য এবং পড়ালেখা করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা না পাওয়ায় তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে, পৃথিবী তাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। যে কারণে তারা ঠিকমত পড়ালেখা করতে পারে না। এজন্য যাকাত ব্যাংকের শিশু আশ্রয় কেন্দ্রে এ অসহায় এতিমদের ভরণ-পোষণ ও

পড়ালেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যতদিন না তারা পড়ালেখা শেষ করতে পারে। এছাড়াও যে এতিমদের নিজেদের আত্মীয়ের বাড়িতে সুযোগ-সুবিধাসহ নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা আছে সঠিক তত্ত্বাবধানের জন্য তাদেরকে নিয়মিত বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২) বয়স্ক পুনর্বাসনঃ বাংলাদেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য রয়েছে। এদেশে এ সকল মানুষের দুনিয়া দিন দিন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। তাদের যে মানের সেবা পাওয়া প্রয়োজন, সে মানের সেবাপ্রাপ্তি থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। বয়স্ক মানুষের সমস্যার যেন কোনো অন্ত নেই। তারা জীবনের সকল ঘাম, রক্ত ও মেধা দিয়ে উপার্জন করে সন্তানদের বড় করে, কিন্তু তাদের সন্তানরা এসব ভুলে গিয়ে বয়স্ক অসহায় পিতামাতাকে সেবা না করে তারা অবহেলা করে, ঘরের বাইরে ফেলে দেয়, অত্যাচার করে। অথচ তারা জীবনকে তাদের সন্তানদের জন্যই ব্যয় করে। শেষ বয়েসে তাদের আর কিছুই করারও থাকে না। তখন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। এ সময় তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। এজন্য যাকাত ব্যাংক এ সকল বয়স্ক অসহায় মানুষকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে আমৃত্যু ভাতা প্রদান করার ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাদের উপযোগী সেল্টার হোমস তৈরি করে সেখানে তাদের আমৃত্যু সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়াও এ ব্যাপারে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রাখা যেতে পারে।

৩) বিধবা পুনর্বাসনঃ স্বাভাবিকভাবে কোনো সচ্ছল ঘরের মহিলার যদি স্বামী মারা যায় তবে ঐ মহিলা খুবই কষ্টকর অবস্থার নিপতিত হয়। সে অসহায় হয়ে পড়ে এবং নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রে যদি কোনো দরিদ্র পরিবারের মহিলার স্বামী মারা যায় তবে তার দুর্দশার কোনো অন্ত থাকে না। তাই তাদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য যদি সুযোগ থাকে তাদের বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যদি বিয়ে দেয়া সম্ভব না হয়, তবে সুযোগ হলে তাদেরকে কর্মমুখী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং সুযোগ না থাকলে আমৃত্যু সময়ের জন্য বিধবা ভাতার ব্যবস্থা থাকবে। আর যারা নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করবে সেল্টার হাউসে তাদের উপযোগী বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করে তাদের পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা থাকবে।

৪) প্রতিবন্ধী পুনর্বাসনঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে কেউ সুস্থ, কেউ একটু অসুস্থ আবার কেউ প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এখানে কারো কোনো কিছু করার কোনো ক্ষমতা নেই। প্রতিবন্ধিতা আল্লাহ্র দেয়া একটি বিশেষ পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। সেরকম একটি কঠিন পরীক্ষা হলো এই প্রতিবন্ধিতা। সমাজে নানা রকম প্রতিবন্ধী মানুষ থাকে। প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে কেউ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, কেউ শ্রবণ প্রতিবন্ধী, কেউ বাক প্রতিবন্ধী, কেউ মানসিক

প্রতিবন্ধী, কেউ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, কেউ বা আবার বিকলাঙ্গ। বিভিন্ন কারণে মানুষ প্রতিবন্ধী হয়। কেউ জন্মগত, আবার কেউ রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনার কারণে প্রতিবন্ধী হয়। এসব মানুষ সবক্ষেত্রে অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। তাদের সেবা করাও অনেকটা কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে সচ্ছল, শিক্ষিত ও দায়িত্বসচেতন পরিবারের প্রতিবন্ধীরা আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং পরিবারের সদস্যরা প্রতিবন্ধীদের প্রতি যত্নসহকারে দয়িত্ব পালনেরও চেষ্টা করে, কিন্তু যেসব প্রতিবন্ধীর পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনরা দরিদ্র, অশিক্ষিত ও দায়িত্ব অসচেতন, তাদের কষ্টের কোনো সীমা থাকে না। এমন অবস্থায় এ প্রতিবন্ধীরা ভিক্ষাবৃত্তির মতো ঝুঁকিপূর্ণ ও অবমাননাকর কাজে জড়িয়ে পড়ে, কখনো স্বেচ্ছায় আবার কখনো বাধ্য হয়ে, যা অত্যন্তই অমানবিক এক জীবনচক্র। প্রতিবন্ধীদের এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে সুপরিকল্পিতভাবে এ প্রতিবন্ধীদের জন্য সেল্টার হোম তৈরি করে তাদের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে পুনর্বাসন করা যেতে পারে। পাশাপাশি যারা কাজ করতে সক্ষম তাদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাতে তারা দেশ উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।

৫) নও-মুসলিমদের পুনর্বাসনঃ ইসলাম আবির্ভাবের সাথে সাথে মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। যারা তাদের ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে ইসলামকে নিজেদের ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছে তারাই নও-মুসলিম। এই নও-মুসলিমদের প্রতি সদয় হওয়ার তাকিদ রয়েছে। তাদেরকে সাহায্য করার নির্দেশ এসেছে। কারণ তারা তাদের সকল বন্ধন ছিন্ন করে, সকল প্রাপ্যকে পায়ে ঠেলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এজন্য সর্বদা তাদের সকল বিষয়ে খেয়াল করতে হবে, যেন তারা কোনোভাবেই অসহায় বোধ না করে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছরই অনেক ব্যক্তি ও পরিবার ইসলাম গ্রহণ করছে। বাংলাদেশেও এর ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। যখন কোনো ভাই ইসলাম গ্রহণ করে তখন ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তারা পারিবারিক সম্পদ ও সহযোগিতা হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। ঐ সময় তারা খুবই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে তাদেরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সেবা প্রদান করা, যোগ্যতা অনুসারে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজন হলে আবাসনের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

- **ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন**

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। এদেশে বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘুর্ণিঝড়, নদীভাঙন, খরা, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো দুর্ভিক্ষের কবলেও পড়ে। এর ফলে অনেক মানুষ অপুষ্টি,

পেটের পীড়া ও ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এছাড়াও দুর্যোগের কারণে অনেকেই আহতও হয়ে পড়ে। তখন তাদের চিকিৎসা করা জরুরি হয়ে পড়ে। কখনো কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এমন দ্রুততার সাথে ভয়ঙ্কর রূপে আসে যে, তার তাণ্ডবে ভুক্তভোগীরা সহায় সম্বল কিছুই নিতে পারে না। সবকিছু দুর্যোগের তাণ্ডবে বিলীন হয়ে যায়। তারা সম্পদহীন, বাস্তহারা ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এ সকল বিপদগ্রস্ত লোকজন তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করে। এ সময় তাদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা অতীব জরুরি হয়ে পড়ে। এ সকল ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্যের জন্য যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যেমে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা, বাড়ি-ঘর নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করা যেতে পারে। আর যদি তাদের বাড়ি ঘর, যায়গা, জমি সব নদীগর্ভে বিলীন হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পুনর্বাসন করা যেতে পারে।

সপ্তম অনুচ্ছেদঃ জীবনমান উন্নয়নে যাকাত ব্যাংকের (স্বাবলম্বী) প্রকল্প

জীবনমান উন্নয়নে যাকাত ব্যাংকের (স্বাবলম্বী) প্রকল্পটি একটি জীবিকাভিত্তিক বহুমুখী প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সক্ষম সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক কাজে নিয়োজিত করে তাদের স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কারণ যাকাতের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে অভাবীদের সচ্ছল ও স্বাবলম্বী করে তোলা। অভাবীদেরকে যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে বেশি করে অর্থ-সম্পদ প্রদান করার প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.) বলেন, "যখন তোমরা ফকির-মিসকিনকে কিছু দিবে তখন তাকে ধনী বানিয়ে দিবে।"[৭০৬] ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, "ফকির ও মিসকিনকে এতটুকু পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তারা অভাবের গ্লানি থেকে মুক্তি পায় এবং ধনী ব্যক্তির পর্যায়ে এসে উপনীত হয়।" ইমাম শাফেয়ী (র.) এ মত সমর্থন করেন।[৭০৭] ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.)সহ অন্যান্য ফকীহগণের মত হলো যে, প্রার্থিত ফকির-মিসকিনকে নিজেসহ পরিবার-পরিজনের এক বছরের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় যাকাত দিতে হবে। যাকাতভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলে দারিদ্র্য নির্মূল করার জন্য ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন যে, যাকাত প্রাপ্ত অভাবীদেরকে যেন দ্বিতীয়বার যাকাতের অর্থের মুখাপেক্ষী হতে না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান করা একান্ত প্রয়োজন।[৭০৮] কারণ যাকাত অভাবী মানুষকে এমনভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে চায় যে, যাকাত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে যেন দ্বিতীয়বার যাকাতের দারস্থ হতে না হয়। এজন্য যাকাতের অর্থ-সম্পদ এমন এক পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দিতে হবে, যেন যাকাত গ্রহীতা

---

[৭০৬] ড. মাহমুদ আহমাদ, *অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, তা.বি., পৃ. ৪

[৭০৭] ড. মাহমুদ আহমাদ, *অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৭০৮] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সেমিনার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১৯৯৮, পৃ. ৩০

স্বনির্ভরতা অর্জনের সক্ষম হয়। এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা হলো- নিজের অর্থ-সম্পদ শুধু দান করে দিলেই সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন হয় না; বরং দান করার ক্ষেত্রে অভাবগ্রস্তদের প্রকৃত প্রয়োজন সম্পর্কে জেনে যাকাতের অর্থ-সম্পদ তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।[৭০৯] সুতরাং ইসলামিক স্কলারদের মতামত অনুসারে যাকাতকে যাকাতের মৌলিক দাবি অনুযায়ী আদায় করতে হবে। আর তা করতে পারলে আশা করা যায় যে এদেশে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।[৭১০]

যাকাত ব্যাংকের স্বাবলম্বী প্রকল্পকে অনেকগুলো ছোট ছোট প্রকল্পে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্পকে সাজানো হয়েছে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এক একটি সফল প্রকল্প হিসেবে। এগুলো এমনভাবে করা হয়েছে যে, এর সুবিধাভোগীরা তাদের সুবিধা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী যাকাত ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্য থেকে যেকোনো প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত সুভিধাভোগীদের সঠিক নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত করলে আশা করা যায় তাদের জীবনমানের প্রভূত উন্নতি হবে ইনশাআল্লাহ্। প্রকল্পগুলোর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে পর্যায়ক্রমে দেয়া হলো:-

- **ব্রোঞ্জ প্রকল্প:** এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র অর্থ ৫০,০০০.০০ - ১০০,০০০.০০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারিত ব্যক্তিকে যাকাতের হকদার হিসেবে টাকা এককালীন প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন করা যেতে পারে। এছাড়াও যদি যাকাত প্রাপ্ত সুবিধাভোগীরা এ প্রকল্পে অংশীদার হওয়ার পূর্বে ঋণগ্রস্ত থাকে তাহলে তা যাচাই সাপেক্ষে যাকাতের অর্থ থেকে সর্বপ্রথম তাদের ঋণ পরিশোধ করে এ প্রকল্পে সংযুক্ত করা যেতে পারে। এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যদি তাদের ব্যবসা বর্ধিত করতে চায় তবে যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সম্ভাব্যতা ও সক্ষমতা যাচাই সাপেক্ষে ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। এ ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ বিভাগ সম্ভাব্যতা যাচাই করে চলমান প্রকল্পের মূল্যমান নির্ধারণ করে প্রকল্প উপযোগী ঋণ অনুমোদন দিবে। এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ প্রকল্পের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পাবে। তবে যাকাত ব্যাংকের এ প্রকল্প থেকে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সুবিধাভোগীরা সুবিধাপ্রাপ্ত হবে। এজন্য প্রকল্পযুক্ত ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তিগণ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে না। যদি কেউ তা করে বা করার চেষ্টা করে তবে তাদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং তাদের জন্য যাকাত ব্যাংকের চলমান সকল সুবিধা স্থগিত করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করলে আশা করা যায় সুবিধাভোগীরা প্রায়

---

[৭০৯] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[৭১০] ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, *ভিক্ষাবৃত্তি ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪৫বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ১১৭

পাঁচ বছরের মধ্যে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ্। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী কোনো ব্যক্তি সম্ভব হলে একই সাথে একাধিক প্রকল্পে যুক্ত হতে পারবে। যেমন-

১) ভ্যান ও রিকশাঃ এ প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত সুস্থ ও শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা দিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অধীনে ভ্যান, অটো ভ্যান, রিকশা ও অটো রিকশা প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দেয়া হবে। আর এর মাধ্যমে তারা দৈনিক আয় করে নিয়মিত সংসার ব্যয় পরিচালনা করবে এবং আয় থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ সঞ্চয় করবে। এক্ষেত্রে তাদের আয় থেকে ঋণ পরিশোধ করার কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় ধীরে ধীরে তাদের আয় ও সঞ্চয় বৃদ্ধি হবে। ফলে তারা একপর্যায়ে স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের টাকা সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে, সেক্ষেত্রে দিনভিত্তিক অথবা সাপ্তাহিক অথবা মাসভিত্তিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করা বাধ্যতামূলক করা হবে।

২) ভ্রাম্যমাণ ভ্যানগাড়ির মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসাঃ এ প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি ও প্রযুক্তির সহায়তায় সংশ্লিষ্টগণ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য গ্রামীণ ও শহরে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিবে। এর ফলে ক্রেতার সময় যেমন বাঁচবে তেমনি অর্থেরও সাশ্রয় হবে। অন্যদিকে এ ব্যবসা থেকে আয় হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত হবে। এ প্রকল্প বাজারমুখী এককেন্দ্রীক ক্ষুদ্র ব্যবসাকে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে ব্যবসার বিকেন্দ্রীকরণ করার মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ব্যবসাকে বিস্তৃত করবে। এ পদ্ধতির ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই গ্রামের ফসল সেই গ্রামেই বিক্রয় করা যাবে। ফলে গ্রামীণ প্রান্তিক অর্থনীতির চাকা অনেক বেশি সচল হবে এবং গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যাবে। আর ক্ষুদ্র ব্যবসাগুলো একমুখী ব্যবসার পরিবর্তে বহুমুখী ব্যবসায় পরিণত হবে। ফলে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী ব্যক্তিকে টাকা সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং দিনভিত্তিক অথবা সপ্তাহিক অথবা মাসভিত্তিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

৩) ক্ষুদ্র কৃষি খামারঃ এ প্রকল্পের আওতায় কৃষক তার নিজের জমি অথবা জমি বর্গা বা লিজ নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে যুক্ত হতে পারবে। এ প্রকল্পে কৃষক তার দক্ষতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ফসল ফলাবে এবং ফসল চাষের প্রয়োজনীয় খরচ যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প থেকে প্রদান করা হবে, যা প্রকল্প গ্রহীতাকে যাকাত হিসেবে দেয়া হবে। এছাড়াও ফসল চাষ করতে যদি আরো অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হয় যাকাত ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ দিয়ে তা ঋণ হিসেবে দেয়া হবে। প্রকল্পে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করার পর যা অতিরিক্ত থাকবে তা যাকাত ব্যাংকে

তাদের নিজস্ব হিসাব নম্বরে জমা করবে। এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী ব্যক্তিকে টাকা সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং সেক্ষেত্রে মাসভিত্তিক অথবা ষান্মাসিক ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

৪) সমন্বিত ক্ষুদ্র মৎস্য খামার: যদি কারোর নিজের পুকুর অথবা এক খণ্ড জমি থাকে সেখানে ঘেরা দেয়ার মাধ্যমে সমন্বিতভাবে মাছ, হাঁস, মুরগি ও সবজি চাষ করা যায়। এর মাধ্যমে সুবিধাভোগী একজন মানুষ তার নিজের কাজের পাশাপাশি এ খামার করে মাছ চাষ ও হাঁস-মুরগি পালনসহ সবজি চাষ করতে পারবে। এক্ষেত্রে অর্থ প্রদান করবে যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, যা যাকাত গ্রহীতাকে যাকাত হিসেবে দেয়া হবে। এছাড়াও এ কাজে যদি আরো অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হয় তবে যাকাত ব্যাংক সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করবে, যা ব্যাংকিং নীতিমালার আওতায় পরিশোধ করবে। আর এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কৃষক নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অতিরিক্ত আয়ও করতে পারবে ও আবার বিনিয়োগের যে ঋণ তাও পরিশোধ করতে পারবে। এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী ব্যক্তিকে টাকা সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং মাসভিত্তিক অথবা ষান্মাসিক ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

৫) **ক্ষুদ্র পরিসরে সমন্বিত ছাগল, হাঁস ও মুরগি পালন:** এ প্রকল্পের আওতায় একজন সুবিধাভোগী তার নিজের বাড়িতে বসতবাড়ির সাথে একচালা ঘর দিয়ে কয়েকটি ছাগল ও হাঁস-মুরগি দিয়ে এ প্রকল্প পরিচালনা করতে পারবে। এ প্রকল্পে নিয়োজিত পুরুষ ও মহিলারা তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম শেষে নিজেদের বাড়িতে এ কাজ পরিচালনা করবে। এ ক্ষুদ্র প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যাকাত ব্যাংক যাকাত (গ্রহীতা) হিসেবে তাদেরকে প্রদান করবে। এর সুবিধাভোগীরা ছোট পরিসরে ছাগল, হাঁস ও মুরগি চাষ করে স্বাবলম্বী হতে পারে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা ষান্মাসিক অথবা বার্ষিক ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তাদের নিজস্ব একাউন্টে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখবে।

৬) **ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপন:** এ প্রকল্পের আওতায় হস্তশিল্প কুটির শিল্প যেমন- নকশী কাঁথা, মোমবাতি, টুপি, সালোয়ার-ব্লাউজসহ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হবে এবং সেগুলোকে পরবর্তীতে বাজারজাত করা হবে। এ কাজের সাথে জড়িতরা তাদের নিজেদের স্বাভাবিক কাজকর্মের মাঝেও এগুলো করতে পারবে। বিশেষ করে গ্রামের মহিলাদের বাড়ির কাজের ফাঁকে অনেক বেশি সময় থাকে, সেই অবসর সময়টিতে এ সকল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। এছাড়াও বস্তির মহিলাও এ প্রকল্পে সুবিধাভোগী হয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে। এ কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ যাকাত ব্যাংক যাকাত (গ্রহীতা) হিসেবে

তাদেরকে প্রদান করবে। এছাড়াও এ প্রকল্পটি এগিয়ে নিতে যদি আরো অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হয় তবে যাকাত ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ করা হবে যা ঋণ হিসেবে দেয়া হবে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা ষান্মাসিক ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তাদের নিজস্ব একাউন্টে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখবে।

৭) **ক্ষুদ্র ব্যবসাঃ** এ প্রকল্পে ছোট ছোট ব্যবসা করা যেতে পারে। পাইকার থেকে কাঁচামাল (তরকারি, মুদি মাল, মাছ, গোস্ত ইত্যাদি) কিনে এনে অথবা নিজে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হয়ে গ্রামগঞ্জে, শহর, মহল্লাসহ বিভিন্ন বস্তিতে খুচরা বিক্রি করা। এর মাধ্যমে একটি পরিবার স্বাবলম্বী হতে পারে। এ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ যাকাত ব্যাংক যাকাত (গ্রহীতা) হিসেবে তাদেরকে প্রদান করবে। এছাড়াও এ কাজে যদি আরো অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হয় তবে যাকাত ব্যাংক সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করবে, যা ব্যাংকিং নীতিমালার আওতায় পরিশোধ করবে। এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের টাকা সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং দিনভিত্তিক অথবা সপ্তাহিক অথবা মাসভিত্তিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

৮) **ক্ষুদ্র কাপড় বা দর্জি ব্যবস্যাঃ** প্রতিটি মানুষের বসবাস করার জন্য পোশাক ও কাপড়ের প্রয়োজন হয়। তাই এ প্রকল্পে কিছু মানুষকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে সেলাই মেশিন ক্রয় করে এ ব্যবসায়ে নিয়োজিত করা হবে। কাপড়ের ব্যবসাটি ভ্যানগাড়ি বা ছোট পরিবহনে ক্ষুদ্র ব্যবসা হিসেবে পরিচালিত হবে। আর দর্জি ব্যবসাটি একটি ঘর ভাড়া নিয়ে অথবা নিজ বাড়িতে অর্ডার নিয়ে এসেও করা যেতে পারে। এ কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ যাকাত ব্যাংক যাকাত (গ্রহীতা) হিসেবে তাদেরকে প্রদান করবে। এছাড়াও এ কাজে যদি আরো অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হয় তবে যাকাত ব্যাংক সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করবে, যা ব্যাংকিং নীতিমালার আওতায় পরিশোধ করবে। এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের টাকা সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

৯) পেশাগত উপকরণ প্রদানঃ অনেক দরিদ্র পেশাজীবী প্রয়োজনীয় পেশাগত উপকরণের অভাবে তাদের কাজ সঠিকভাবে করতে পারে না। এ দরিদ্র পেশাজীবীদের জন্য যাকাতের অর্থ দ্বারা প্রয়োজনীয় পেশাগত উপকরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমনঃ জেলেদের জন্য জাল, মাছ ধরার জন্য নৌকা; অনুরূপভাবে কামার, কুমার, তাতী কাঠমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি। এ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ যাকাত ব্যাংক যাকাত হিসেবে প্রদান করবে। এছাড়াও দরিদ্র এ পেশাজীবীদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত উপকরণ সরবরাহ করার সাথে সাথে আরো অন্যান্য মানবিক সহায়তা করা যেতে পারে। এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী

ব্যক্তিদের টাকা সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে এবং দিনভিত্তিক অথবা সপ্তাহিক অথবা মাসভিত্তিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করার জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

- **সিলভার প্রকল্পঃ** এ প্রকল্পে যোগ্যতাভিত্তিক (২০০,০০০.০০ থেকে ৫০০,০০০.০০) টাকা পর্যন্ত সুবিধাবঞ্চিত এক বা একাধিক ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে স্বাবলম্বী করা হবে। এছাড়াও যদি সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীরা এ প্রকল্পে অংশীদার হওয়ার পূর্বে ঋণগ্রস্ত থাকে তা হলে সর্বপ্রথম তাদের ঋণ পরিশোধ করে এ প্রকল্পে যুক্ত করা হবে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত অর্থ যাকাত হিসেবে প্রাপ্য হবে। এরপর এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যদি তাদের কার্যক্রম বা ব্যবসা বর্ধিত করতে চায় তবে যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বাস্তবতা যাচাই সাপেক্ষে ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। এ ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ নির্ধারণে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ বিভাগ সম্ভাব্যতা যাচাই করে চলমান প্রকল্পের মূল্যমান নির্ধারণ করবে এবং সে অনুযায়ী প্রকল্প উপযোগী ঋণ অনুমোদন দিবে। এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ প্রকল্প বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পাবে। তবে যাকাত ব্যাংকের এ প্রকল্প থেকে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সুবিধাভোগীরা সুবিধাপ্রাপ্ত হবে। এজন্য প্রকল্পযুক্ত ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তিগণ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে না। যদি কেউ তা করে বা করার চেষ্টা করে তবে তাদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং তাদের জন্য যাকাত ব্যাংকের চলমান সকল সুবিধা স্থগিত করা হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করলে আশা করা যায় সুবিধাভোগীরা প্রায় তিন বছরের মধ্যে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ্। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষি উৎপাদনমূলক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে। যেমন-

  ১) **কৃষি প্রযুক্তিঃ** এ প্রকল্পে সুবিধাভোগীরা কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে নিজদেরকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করবে। তারা এ প্রকল্প থেকে কৃষি কাজ করার প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি গ্রহণ করবে। যেমনঃ পাওয়ার টিলার, সেলো মেশিন, ধান বপন ও কাটা মেশিনসহ অন্যান্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি। যা একটি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে নিজ জমি থাকলে নিজ জমি চাষ করে এবং কিছু জমি বর্গা নিয়ে বা লিজ নিয়ে তারা ফসল উৎপন্ন করবে। আবার অন্য কৃষকদের জমিতে এগুলো ব্যবহার করে সেখান থেকে আয় করতে পারবে। এক্ষেত্রে তাদের আয় থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ যাকাত ব্যাংকে তাদের নিজস্ব হিসাবে জমা রাখবে।

  ২) **সমন্বিত কৃষি খামারঃ** এ খামারে একজন কৃষক তার নিজের কিছু জমি থাকলে নিজ জমিতে আর না থাকলে কমপক্ষে ৪-৫ বিঘা জমি লিজ অথবা বর্গা নিয়ে কমপক্ষে ৫-৬ বছর

মেয়াদী একটি খামার করবে। এ খামারে শ্যালো মেশিন বসিয়ে ঋতু ও বাজার অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের সবজি চাষসহ ধান, গম, ছোলা, সরিষা ইত্যাদি চাষ করতে পারবে। এ খামারে কমপক্ষে ১৫ শতাংশের উপর ৫ থকে ৬ ফিট গভীর করে পুকুর খনন করে সেখানে ক্ষুদ্র পরিসরে মাছের চাষ করা যেতে পারে এবং এ পুকুর সংলগ্ন ঘর করে সেখানে ছাগল, হাঁস ও মুরগির চাষও করা যেতে পারে। এছাড়াও খামারে ঘাস চাষ করাসহ ক্ষেতের চার পাশে কলা, পেঁপে চাষ, মাচা করে লাউ, কুমড়া, করল্লাসহ ইত্যাদি সবজি চাষ করা যেতে পারে এবং পুকুরের চার পাশে অল্প সময়ে ফলন হয় এরকম আম চাষও করা যেতে পারে, যেমন: আম্রপলি। এর ফলে চাষীর নিজের প্রয়োজনও মিটবে আবার ফসল বিক্রয় করে লাভবান হবে। লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ যাকাত ব্যাংকে নিজস্ব হিসাব নম্বরে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখবে।

৩) **সমন্বিত মৎস্য খামার:** এ খামারে একজন সুবিধাভোগী কিছু পুকুর লিজ নিয়ে বা বর্গা নিয়ে অথবা কিছু নিচু জমি লিজ বা বর্গা নিয়ে চারপাশ ঘিরে মাছ চাষের উপযুক্ত করে সেখানে কমপক্ষে ৫-৬ বছর মেয়াদী চুক্তিতে মাছ চাষের জন্য মৎস্য খামার করতে পারে। এ মৎস্য খামারের মাধ্যমে খুব সহজেই একটি পরিবারের সচ্ছলতা আনা যাবে। এ খামারের মধ্যে চার পাশে মাচা করে লাউ, কুমড়া, করল্লা, বরবটি, পটল, চিচিংগাসহ ইত্যাদি সবজি চাষ করা যেতে পারে। এর ফলে চাষীর নিজের প্রয়োজনও মিটবে আবার মাছ ও ফসল বিক্রয় করে লাভবান হবে। লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ ব্যাংকে তার নিজস্ব হিসাব নম্বরে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখবে।

৪) **সমন্বিত পশু খামার:** এ প্রকল্প ন্যূনতম ৩-৪ বিঘা উঁচু জমিতে করা যেতে পারে। নিজের কিছু জমি থাকলে ভালো হয়, জমি না থাকলে জমি লিজ নিয়ে অথবা বর্গা নিয়ে এ খামার করতে হবে। এ খামারে গাভী পালন, গরু মোটাতাজা করণ ও ছাগল পালন এবং অন্যান্য ফসল উৎপন্ন করা যাবে। যার মাধ্যমে এক বা একাধিক পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। এ জমিতে ৭-৮ শতাংশ জমিতে ছোট পুকুর খনন করে সেখানে অল্প পরিসরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করা যেতে পারে। এখানে একটি ছোট পানির পাম্প বসাতে হবে, যার মাধ্যমে গরু ও ছাগলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করাসহ ছোট ছোট প্রয়োজনে কাজে লাগবে। আর সেই ব্যবহৃত পানি দিয়ে পুকুরের মাছ চাষের জন্য মাছের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এছাড়াও খামারে ঘাস চাষ করাসহ খামারের চার পাশে কলা, পেঁপে চাষ, মাচা করে লাউ, কুমড়া, করল্লাসহ ইত্যাদি সবজি চাষ করা যেতে পারে এবং অল্প সময়ে ফলন হয় এরকম আম চাষও করা যেতে পারে, যেমন: আম্রপলি। এর ফলে চাষীর নিজের প্রয়োজনও মিটবে

আবার ফসল বিক্রয় করে লাভবান হবে। লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ যাকাত ব্যাংকের নিজস্ব হিসাব নম্বরে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখবে।

৫) **ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান:** এ প্রকল্পের আওতায় (মুদি দোকান, চালের দোকান, ছোট কাপড়ের দোকান ইত্যাদি) ছোট ব্যবসায় অর্থ সাহায্য প্রদান করা যাবে। একটি দোকান ভাড়া নিয়ে সুবিধাভোগী আগ্রহী ও যোগ্যদেরকে এমন ব্যবসায়ে সহায়তা করা যেতে পারে। এ ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ যাকাত ব্যাংকের নিজস্ব হিসাব নম্বরে সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখবে।

- **গোল্ডেন প্রকল্প:** এ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি প্রকল্পের ১০ থেকে ১০০ জন ব্যক্তিকে একসাথে একটি সমিতি করে তাদের উপযোগী ব্যবসা, মাছের খামার, কৃষি খামার, গরু মোটাতাজা করণ, দুগ্ধ খামার এবং ছোট শিল্প স্থাপন করে সেখানে দরিদ্র মানুষকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে কাজ প্রদান করা যেতে পারে। এ প্রকল্পের সমিতি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্গানোগ্রামের আলোকে সমিতির সভাপতি, সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হবে, যা এ সমিতির সদস্যদের ভোটে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে হবে। এতদসত্ত্বেও এ প্রকল্পের মালিকানা এখানে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ সমানুপাতে ভোগ করবে। শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজের দায়িত্ব বণ্টন হবে এবং তাদের কাজের মর্যাদার উপর ভিত্তি করে তাদের মজুরি নির্ধারণ হবে। এ প্রজেক্টের বাজেট নির্ধারণ হবে প্রকল্পের ধরনের উপর। এখানেও সুবিধাভোগীরা তিন মাস পরপর সঞ্চয় করবে। এছাড়াও যদি সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীরা এ প্রকল্পে অংশীভূত হওয়ার পূর্বে ঋণগ্রস্ত থাকে তা যাচাই বাছাই করে যাকাতের অর্থ থেকে পর্যায়ক্রমে তাদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য ঋণ পরিশোধে সহায়তা করা হবে। এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাপ্রাপ্তদের ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধি করতে যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সম্ভাব্যতা ও সক্ষমতা যাচাই সাপেক্ষে ইসলামী ব্যাংকিং বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। এ ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ বিভাগ সম্ভাব্যতা যাচাই করে চলমান প্রকল্পের মূল্যমান নির্ধারণ করে বিনিয়োগযোগ্য হলে তবে ঋণ অনুমোদন দিবে। এক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ নির্ধারণে ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। তবে যাকাত ব্যাংকের এ প্রকল্প থেকে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সুবিধাভোগীরা সুবিধাপ্রাপ্ত হবে। এজন্য প্রকল্পযুক্ত ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তিগণ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে না। যদি কেউ তা করে বা করার চেষ্টা করে তবে তাদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং তাদের জন্য যাকাত ব্যাংকের চলমান সকল সুবিধা স্থগিত করা হবে।

  ১) সমন্বিত কৃষি খামার: এ খামার একটি সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হবে। এ সমিতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে এক বছর মেয়াদী একটি পরিচালনা কমিটি

করবে। প্রতি এক বছর পরপর এ সমিতির সদস্যদের ভোটে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচিত কামটি গঠন হবে। এ সমিতি কমপক্ষে ২০-৩০ বিঘা এবং সর্বোচ্চ ১৫০ বিঘা জমি কমপক্ষে ১০ বছর দীর্ঘ মেয়াদী লিজ নিয়ে একটি খামার করবে। এ খামারে সম্ভব হলে এক বা একাধিক সেচ যন্ত্র বসিয়ে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের সবজি চাষ থেকে শুরু করে ধান, গম, ছোলা, সরিষা ইত্যাদি চাষ করতে পারবে। এ খামারে কমপক্ষে ২-৫ বিঘা জমির উপর ৫ থকে ৬ ফিট গভীর করে একাধিক পুকুর খনন করে সেখানে মাছের চাষ করা যেতে পারে এবং এ পুকুরের পাড়ে ঘর তৈরি করে হাঁস ও মুরগি পালন করা যেতে পারে। এছাড়াও ক্ষেতের চার পাশে কলা, পেঁপে চাষ, মাচা করে লাউ, কুমড়া, করল্লাসহ ইত্যাদি সবজি চাষ করা যেতে পারে এবং পুকুরের চার পাশে অল্প সময়ে ফলন হয় এরকম আম চাষও করা যেতে পারে, যেমন: আম্রপলি ইত্যাদি। এর ফলে সমিতির সদস্যরা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এখানে উৎপাদিত পণ্য বাজার দামে ক্রয় করবে। প্রয়োজনও মিটবে আবার ফসল বিক্রয় করে লাভবান হবে। লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ যাকাত ব্যাংকে তাদের নিজস্ব হিসাবে সঞ্চয় হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখবে। এর ফলে দুই-তিন বছরের মধ্যে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ্।

২) সমন্বিত মৎস্য খামার: এ খামার একটি সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হবে। এ সমিতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা জন্য সমিতির সদস্যদের মধ্যে চার সদস্য বিশিষ্ট এক বছর মেয়াদী একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে। এই পরিচালনা কমিটি এই সমিতিকে তত্ত্বাবধান করবে। এ সমিতি কমপক্ষে ৫০-৬০ বিঘা সর্বোচ্চ ২৫০ বিঘা জমি কমপক্ষে ১০ বছরের দীর্ঘ মেয়াদী লিজ নিয়ে ঘের করবে অথবা কমপক্ষে ২০-২৫ টি পুকর লিজ নিয়ে পুকুরভিত্তিক বিভিন্ন খামার করবে। বিভিন্ন খামারের পাশাপাশি মাছের খামারও করা যেতে পারে। এ মাছের খামারের মাধ্যমে খুব সহজেই সমিতির সদস্যদের মধ্যে সচ্ছলতা আনা যাবে। এছাড়াও মাছের খামারের চার পাশটা এমনভাবে করতে হবে যেন সেখানে কলা, পেঁপে চাষ, মাচা করে লাউ, কুমড়া, করল্লাসহ ইত্যাদি সবজি চাষ করা যেতে পারে। সমিতির সদস্যরা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এখানে উৎপাদিত পণ্য বাজার দামে ক্রয় করবে। এতে তাদের প্রয়োজনও মিটবে আবার ফসল বিক্রয় করে লাভবান হবে। লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ যাকাত ব্যাংকে তাদের নিজস্ব হিসাবে সঞ্চয় হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখবে। এর ফলে দুই-তিন বছরের মধ্যে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে এবং জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে ইনশাআল্লাহ্।

৩) সমন্বিত পশু পালন ও দুগ্ধ খামার : এ সমন্বিত খামারটি একটি সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হবে। এ সমিতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা জন্য সমিতির সদস্যদের মধ্যে চার সদস্য বিশিষ্ট এক

বছর মেয়াদী একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হবে। এই পরিচালনা কমিটি এই সমিতিকে তত্ত্বাবধান করবে। কমপক্ষে ১০ বিঘা থেকে সর্বোচ্চ ৬০ বিঘা উচু জমি কমপক্ষে ১০ বছরের দীর্ঘ মেয়াদী লিজ নিয়ে এ প্রকল্প করা যেতে পারে। এ খামারে গাভী পালন, গরু মোটাতাজা করণ ও ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা হবে এবং এ খামারে পশুদের খাদ্য তৈরির জন্য পশু পালনে উপযোগী ঘাস চাষ করা হবে। এছাড়াও প্রকল্পের মধ্যে সবজিসহ অন্যান্য ফসলও উৎপন্ন করা যাবে। এ জমিতে ১ বিঘা জমিতে ৫-৬ ফুট গভীর পুকুর খনন করে সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষ করা যেতে পারে। এখানে এক বা একাধিক পানির পাম্প বসাতে হবে। যার মাধ্যমে গরু ছাগলের গোসল করানোসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজে লাগবে। আর সেই পানি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুকুরে মাছের জন্য খাবারের যোগান দিবে। এছাড়াও খামারের চার পাশে কলা, পেঁপে চাষ, মাচা করে লাউ, কুমড়া, করল্লাসহ ইত্যাদি সবজি চাষ করা যেতে পারে এবং অল্প সময়ে ফলন হয় এরকম আম চাষও করা যেতে পারে, যেমন: আম্রপলি। এর ফলে সমিতির সদস্যরা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এখানে উৎপাদিন পণ্য বাজার দামে ক্রয় করবে। এতে তাদের প্রয়োজনও মিটবে আবার ফসল বিক্রয় করে লাভবান হবে। লাভের একটি নির্দিষ্ট অংশ যাকাত ব্যাংকে তাদের নিজস্ব হিসাবে সঞ্চয় হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে জমা রাখবে। এর ফলে দুই-তিন বছরের মধ্যে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ্।

৩) ছোট বা মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান: এ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি একটি সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হবে। এ সমিতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে ৫ জন সদস্যের দুই বছর মেয়াদী একটি পরিচালনা কমিটি গঠিত হবে। প্রতি দুই বছর পর পর এ সমিতির সদস্যদের দ্বারা কমিটির নির্বাচিত পাঁচ সদস্য এ দায়িত্ব পালনে কোনো অতিরিক্ত অর্থ পাবেন না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ছোট বা মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ প্রতিষ্ঠানের সমিতির সদস্যগণ সমানুপাতিক হারে মালিকানা ভোগ করবেন এবং তাদের দক্ষতা অনুসারে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। যেমন: ক্ষুদ্র পোশাক শিল্প স্থাপন। এ সমিতির সদস্যগণ এ শিল্পের মালিক আবার তারাই তাদের দক্ষতা অনুসারে এ পোশাক শিল্পে বেতনভুক্ত শ্রমিক হিসেবে কাজ করবেন। বছর শেষে এ শিল্প থেকে অর্জিত লভ্যাংশ সমিতির সদস্যগণের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করতে হবে। এ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি তত্ত্বাবধান করার জন্য যাকাত ব্যাংকের পক্ষ থেকে যোগ্য কর্মকর্তা ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হবে। এ প্রকল্প পরিচালনার জন্য যদি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রয়োজন হয়, তবে যাকাত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় এই প্রকল্পের জন্য উপযোগী পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান করবে। যে ঋণের টাকা লভ্যাংশসহ সহনশীল পদ্ধতিতে পরিশোধের ব্যবস্থা

থাকবে। এ প্রকল্পে সবার নামে ব্যাংক হিসাব থাকবে যেখানে সংশ্লিষ্টদের বেতন, ভাতাদি দেয়া হবে এবং সেখান থেকে প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে সঞ্চয় হিসেবে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংক কেটে রাখবে। এর ফলে ৫ বছরের মধ্যে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ্।

- **ডায়মন্ড প্রজেক্টঃ** এ প্রকল্পের মাধ্যমে শত শত বা হাজার হাজার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে একটি বৃহৎ সমিতির সদস্য করা হবে এবং এ সমিতির মাধ্যমে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন প্রকল্প স্থাপন করা হবে। সেখানে সমিতির সদস্যদেরকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে কাজ প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের মালিকানা এখানে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সমানুপাতিক হবে। এ প্রকল্পে শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের কাজের দায়িত্ব বণ্টন করা হবে। এ প্রকল্পের বাজেট নির্ধারণ হবে প্রকল্পের ধরনের উপর। তা শতকোটি থেকে হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা মাসের ভিত্তিতে একটা নির্ধারিত অংশ বাধ্যতামূলক তাদের নিজস্ব হিসাবে সঞ্চয় করবে। এ প্রকল্প সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ দেয়া হবে, প্রয়োজন হলে বাহির থেকেও প্রয়োজনীয় বেতন দিয়ে নিয়োগ দেয়া যাবে, যে বা যারা কোনোভাবেই এ প্রকল্পের কোনো পর্যায়ে মালিকানায় যুক্ত থাকবে না। তারা শুধু বেতনভোগী কর্মচারী অথবা কর্মকর্তা হিসেবে থাকবে। এ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাপ্রাপ্তরা যদি তাদের ব্যবসা বর্ধিত করতে চায় তবে যাকাত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং এর বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় এই প্রকল্পের উপযোগী পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান করবে। যে ঋণের টাকা লভ্যাংশসহ সহনশীল পদ্ধতিতে পরিশোধের ব্যবস্থা থাকবে। নিম্নে এ প্রকল্প আলোচিত হলো:-

  শিল্প নগরী স্থাপনঃ এ প্রকল্পটি একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দেশের সরকার ও বৃহৎ শিল্প পরিবারকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ এ বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত ও সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যাকাত ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে সরকারের অনুমোদন নিয়ে সরকারি জমিতে অথবা ক্রয় করা জমিতে একটি শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ শিল্প নগরীকে যাকাত ব্যাংকের একটি বিশেষ শাখা কর্তৃক সরাসরি তত্ত্বাবধান করা হবে। এ শিল্প নগরীতে বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকবে যা আন্তর্জাতিক মানসম্মন্ন পণ্য উৎপাদন করবে। এখানকার উৎপাদিত পণ্য দেশীয় প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হবে। শিল্প কারখানাগুলো গার্মেন্টস শিল্প, সুতা শিল্প, লেদার শিল্প, প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্প ইত্যাদি হতে পারে। এছাড়াও লাভজনক যেকোনো পণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান করা হবে। এ শিল্প নগরীর সুবিধাভোগীদের অন্যান্য মানবিক সুবিধা প্রধানের জন্য এ শিল্প নগরী সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে নিম্নোক্ত উপ-প্রকল্পগুলো প্রতিষ্ঠা করা হবে।

- **আবাসন নগরী প্রতিষ্ঠা:** উল্লিখিত শিল্প নগরীর সুবিধাভোগীদের থাকার জন্য শিল্প নগরী সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যাকাত ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এক বা একাধিক আবাসিক নগরী স্থাপন করা হবে। যেখানে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসন সুবিধা থাকবে। সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণ করে প্রতিটি পরিবারকে ৬০০-৭০০ স্কয়ার ফিটের একটি করে ফ্লাট বরাদ্দ দেয়া যাবে। ফ্ল্যাটের নির্মাণ খরচ ২৫-৩০ বছরের কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থাপত্র দেয়া হবে। এভাবে সেখানে একটি আধুনিক আদর্শ আবাসন নগরী স্থাপন করা হবে।
- **বাজার প্রতিষ্ঠা:** উল্লিখিত আবাসন নগরীতে বসবাসরত মানুষের জীবনধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দরকার হয়। এজন্য ডায়মন্ড প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে এ আবাসন প্রকল্প সংলগ্ন একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করা হবে। যেখানে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল পণ্য ও দ্রবাদি থাকবে। যাকাত ব্যাংকের ব্রোঞ্জ ও সিলভার প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা এ বাজার প্রতিষ্ঠায় অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখবে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারাই এই বাজারে ব্যবসা করার অনুমতি পাবে। এছাড়াও যাকাত ব্যাংকের সুবিধাভোগী যে কেউ যাকাত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অনুমোদন নিয়ে এ বাজারে ব্যবসা করতে পারবে।
- **হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা:** উল্লিখিত আবাসন নগরীর মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেয়ার জন্য যাকাত ব্যাংকের অর্থায়নে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে। আদর্শ আবাসন নগরী ও শিল্প নগরীতে অবস্থান করা নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে এ হাসপাতাল। তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও সংশ্লিষ্ট সকল সেবা বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে প্রদান করা হবে। তবে কোনো সুবিধাভোগী যদি যাকাত দানে সক্ষম হয়ে উঠে তাহলে তাকে এই হাসাপাতালে প্রয়োজনীয় সেবা পেতে হলে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এ হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার থেকে ক্লিনার পর্যন্ত সকলেই যাকাত ব্যাংক কৃর্তক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং সেখান থেকে তারা বেতন ভাতাদি পাবেন।
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা:** এখানে বসবাসরত শিশুদের আগামীর সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নৈতিকতাভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ না করলে কেউ প্রকৃত অর্থে মানুষ হিসেবে ও দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। তাই দেশের সম্পদ হিসেবে তাদেরকে গড়ে তোলার জন্য যাকাত ব্যাংকের অর্থায়নে ও তত্ত্বাবধানে অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে নৈতিকতাভিত্তিক সিলেবাস অনুযায়ী তাদেরকে পাঠদান করা হবে। এর মাধ্যমে তাদের আগামীর বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হবে। তবে কোনো শিক্ষার্থীর বাবা যদি বিভিন্ন প্রকল্পে সুবিধাভোগী হয়ে সচ্ছল হয়ে যায় এবং যাকাত দানের যোগ্য হয় তবে ঐ সকল শিক্ষার্থী নির্ধারিত বেতন প্রদান করত: পড়ালেখা করতে পারবে।

- **খেলার মাঠ ও বিনোদন পার্ক নির্মাণঃ** এখানে মানুষের বিনোদনের জন্য এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য খেলার মাঠ ও পার্কের প্রয়োজন। সেজন্য আদর্শ আবাসন নগরীতে যাকাত ব্যাংকের অর্থায়নে খেলার মাঠ ও পার্ক স্থাপন করা হবে। বিশেষ করে এখানকার শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য এবং তাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য এগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- **মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার নির্মাণঃ** উক্ত আদর্শ আবাসন প্রকল্পে বসবাসরত মানুষদের আল্লাহ্‌র ইবাদাত করার জন্য এবং মানুষের মাঝে ইসলামী জ্ঞান বিতরণের জন্য আধুনিক নির্মাণ শিল্পের শৈল্পিক কাঠামোয় যাকাত ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক মসজিদভিত্তিক এক বা একাধিক ইসলামিক সেন্টার নির্মাণ করা হবে। যেখান থেকে মানুষের জীবনকে সুন্দর করে গঠন করার জন্য ইসলামের দাওয়াত প্রদান করতে হবে এবং ইসলামের সমাজব্যবস্থাকে মানুষের মাঝে কল্যাণময় ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

○ **বিশেষ প্রকল্প**

এ প্রকল্পটি যাকাত ব্যাংকের একটি বিশেষ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশু, কিশোর ও তরুণদের শিক্ষা ব্যয় প্রদান করা হবে এবং যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও তাদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।

১) যুব উন্নয়নঃ এ প্রকল্পে সুবিধাবভোগীদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এদের মধ্যে কৃষিভিত্তিক, শিল্পভিত্তিক ও ব্যবসাভিত্তিকসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকল্পে তাদেরকে সহায়তা করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত যুবকদের কর্মক্ষমতা অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের জন্য উপযোগী প্রকল্পে অর্থ সহায়তা করা হবে।

২) শিক্ষা উন্নয়নঃ এ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র শিশু, কিশোর ও তরুণদের লেখা পড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাদের মেধা ও যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে পরিণত হয়ে পড়ালেখা শেষ করার পর চাকরি অথবা ব্যবাসায়ে নিয়োজিত হওয়া পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

৩) রেমিটেন্স প্রকল্পঃ এ প্রকল্পটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাবঞ্চিত যুব সম্প্রদায়কে একটি মানসম্পন্ন বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ১ বছর মেয়াদী প্রয়োজনীয় কর্মমুখী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে তাদেরকে বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে প্রেরণ করা হবে। সেখানে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম যাকাত ব্যাংকের ফরেন রেমিটেন্স শাখা সম্পাদন করবে। তারপর উক্ত সুবিধাভোগীরা বিদেশে

যাওয়ার পর তাদের আয় যাকাত ব্যাংকে তাদের নিজস্ব হিসাবের মাধ্যমে দেশে পাঠাতে পারবে এবং সেখান থেকে একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা প্রতি মাসে সঞ্চয় হিসেবে কেটে রাখা হবে। এভাবে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। এছাড়াও তারা দেশে ফেরত আসার পর তারা যাকাত ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্পে সংযুক্ত হতে পারবে।

অষ্টম অনুচ্ছেদঃ বাংলাদেশে যাকাত ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্য আয়

আমাদের দেশে পূর্ব থেকে চলে আসা যাকাত আদায় ও যাকাত প্রদানের যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণ কুর'আন-সুন্নাহ ভিত্তিক নয়। এজন্য যাকাতের যে ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে তা আমাদের দেশে প্রকাশিত হয় না। আর এ কারণেই যাকাতের সুফল প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পায় না। অথচ যাকাত দরিদ্র, অভাবী ও সুবিধাবঞ্চিতদের সার্বিক কল্যাণের জন্যই নির্ধারিত। যেহেতু এদেশে যাকাতব্যবস্থার সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ হয় না সেহেতু যাকাতের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নও সেভাবে হয় না। এদেশে যার যার যাকাত তিনিই ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করেন। এখানে যাকাত খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে প্রদান করা হয়। কেউ শাড়ি, লুঙ্গি বা অল্প কিছু টাকা করে দিয়ে যাকাত আদায় করেন। ফলে যাকাতের মৌলিক উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যাহত হয়। এজন্য যাকাত রাষ্ট্রীয়ভাবে আদায় করা উচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় করে।[৭১১] বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান দেশ এবং এদেশের মানুষের ধনী-দরিদ্রের অনুপাত সরকারি হিসাব অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রায় ২০ শতাংশ। বাকি প্রায় ৮০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার উপরে বাস করে। এর মধ্যে যাকাত প্রদানের সক্ষমতার দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশের অনেকেই যাকাত দানে সক্ষম। এখন বাংলাদেশে ঠিক কত শতাংশ মানুষ যাকাত দানের উপযোগী তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবুও বর্তমান মানুষের জীবন-যাপনের ধরনের উপর ভিত্তি করে ধারণা করা যেতে পারে যে, বর্তমানে উপার্জনকারী জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ কোন না কোনভাবে নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী। তথ্যমতে বাংলাদেশে ২০১৬ সালে ১ লাখ ১৪ হাজার ২৬৫ জন কোটিপতি ছিল।[৭১২] এই সংখ্যা ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল ১ লাখ ৬৬ হাজার ৭২৮ জন এবং ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত ছিল ১ লাখ ৭৬ হাজার জনের বেশি।[৭১৩] এভাবে প্রতি বছর এদেশে কোটিপতির সংখ্যা খুব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা এদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থানকে সুসংহত করতে ভূমিকা রাখছে। অর্থনৈতিক অবস্থার এই উর্ধ্বগতির সাথে যদি এদেশে সম্পদের সুষম বণ্টন হয় এবং সঠিকভাবে যাকাত আদায় করা সম্ভব হয়, তবে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ

---

[৭১১] ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, *ভিক্ষাবৃত্তি ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ১১৭

[৭১২] banglanews24.com/cat/news/bd/491466.details, ০৪. ১২. ২০২০

[৭১৩] দৈনিক কালেরকণ্ঠ, নভেম্বর ০৩, ২০১৯

যাকাত হিসেবে আদায় হবে। সার্বিক বিষয় আলোচনায় দেয়া যায় যে, সুষ্ঠুভাবে যাকাত সংগ্রহনীতির আওতায় যাকাত আদায় করলে কী পরিমাণ যাকাত প্রতি বছর আদায় হতে পারে, সে সম্পর্কে একটি ধারণা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

বাংলাদেশে যাকাত আদায়ের সম্ভাব্য পরিমাণের কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। তবুও ১৯৯১ সালের তথ্য অনুযায়ী সম্ভাব্য যাকাত আদায় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ৬৬৮.৫২ কোটি টাকা।[৭১৪] যাকাতের নিম্নোক্ত খাতগুলো থেকে ১৯৯২ সালের তথ্য মোতাবেক চারটি খাত (খাদ্য শস্য, নগদ অর্থ, অন্যান্য শস্য, শিল্প থেকে, স্বর্ণ বা স্বর্ণালঙ্কার) থেকে মোট আয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ২,০৬৬.৮৪ কোটি টাকা এবং এর মধ্য থেকে অমুসলিম ১৩ শতাংশ গড় হিসাব করে মোট অর্থ থেকে বাদ দিলে সম্ভাব্য মোট যাকাতের পরিমাণ হয় ১,৭৯৮.১৪ কোটি টাকা। এছাড়াও আরো অন্যান্য খাত রয়েছে যা থেকে যাকাত আয় হতে পারত।[৭১৫] বিগত কয়েক বছর ধরে যাকাত আদায়ের সম্ভাব্য পরিমাণ হিসাব করলে দেখা যায়, যে পরিমাণ যাকাত আদায় করা যাবে তাতে বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিতদের দারিদ্র্য বিমোচন করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)-এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে যাকাতযোগ্য সম্পদের পরিমাণ ১০ লাখ কোটি টাকা। এর থেকে যাকাতের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর যাকাত আদায় হবে ২৫,০০০ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও যাকাতযোগ্য আরো কয়েকটি খাত থেকে যাকাত আদায় হতে পারে, যেমন- প্রতিবছর ফসলি জমির থেকে 'উশর ১০০০ কোটি টাকা, গচ্ছিত স্বার্ণ ও রৌপ্য অলংকার থেকে ১০০ কোটি টাকা, ব্যাংকিং খাতে ১২৪০ কোটি টাকা, শিল্প-কারখানা থেকে ১,০০০ কোটি টাকা। সঞ্চয়পত্র ও বন্ড থেকে বছরে ৩,০০০ কোটি টাকা।[৭১৬] গত ২০১৯ সালের মে মাস পর্যন্ত দেশের আর্থিক খাত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সময় পর্যন্ত ব্যাংকগুলো ঋণ বিতরণ করেছে ১১ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা।[৭১৭] নিশ্চয়ই উল্লিখিত টাকার চেয়েও আরো বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে আমানত রয়েছে। তা না হলে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ ঋণ দেয়া সম্ভব হতো না। আর এই টাকাগুলো অবশ্যই মানুষের জীবনযাপন ব্যয় নির্বাহ করার পর উদ্বৃত্ত, যা ব্যাংকে আমানত রাখা হয়েছে। ব্যাংকে টাকা আমানত রাখা ছাড়াও আরো অনেক উদ্বৃত্ত টাকা হিসাবের বাহিরে রয়েছে।

গ্রামীণ জনপদে অনেকেই ব্যাংকে টাকা আমানত রাখার চেয়ে অতিরিক্ত লাভের জন্য মহাজনী প্রথার ভিত্তিতে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান করে সুদভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ করে থাকে। তথাপি উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী যাকাতের অর্থ পরিমাপ করার জন্য নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতির আলোকে

---

[৭১৪] ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, *ভিক্ষাবৃত্তি ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

[৭১৫] ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

[৭১৬] banglanews24.com/cat/news/bd/491466.details, ০৪. ১২. ২০২০

[৭১৭] banglatribune.com, জুলাই ১৩, ২০১৯

হিসাব করা যেতে পারে। ২০১৯ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে ৮৮ শতাংশের বেশি মুসলিম জনগোষ্ঠী রয়েছে, বাকি প্রায় ১২ শতাংশ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। এক্ষেত্রে যাকাতের প্রকৃত তথ্য পেতে গেলে ব্যাংকে আমানতকৃত মোট অর্থ থেকে ১২ শতাংশ বাদ দিলে যাকাতযোগ্য সম্পদের একটা পরিমাণ পাওয়া যাবে। তাই হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, ব্যাংকে আমানতকৃ মোট ১১ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার মধ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর আমানতকৃত অর্থ প্রায় ১০ লাখ ১ হাজার ৫ শত কোটি টাকা। সেই হিসাবে নগদ টাকার যাকাতের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫০৩৭.৫ কোটি টাকা। আর শেয়ার মার্কেটের অবস্থান পর্যালোচনা করলে সেখান থেকেও অনেক টাকা যাকাত আদায় হতে পারে। যেমন, ২০১৮ সালের জুন মাসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের হিসাব অনুয়ায়ী ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৪,৬৩৪.৫৩ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ৬৮,২১৪.১৩ কোটি টাকা।[৭১৮] তাহলে এই দুই প্রতিষ্ঠানের ইস্যুকৃত মূলধনের হিসাব হয় ১৯২,৮৪৮.৬৬ কোটি টাকা এবং এই টাকা থেকে যাকাত হিসাব করলে দেখা যায় যে, ৪৮২১.২১ কোটি টাকা যাকাত হিসেবে আদায় করা যাবে। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ২০১৯ সালের মে পর্যন্ত ব্যাংকগুলো প্রদানকৃত ঋণ ও ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত পুঁজিবাজরে বিনিয়োগকৃত অর্থের হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক যাকাত আদায় করা সম্ভব হবে (২৫,০৩৭.৫+৪,৮২১.২১) = ২৯,৮৫৮.৭১ কোটি টাকা। এছাড়াও দেশের খনিজ সম্পদের যাকাত, ফসলের 'উশর, অন্যান্য আর্থিক সঞ্চয়ের যাকাত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত, পশুর যাকাত ও অন্যান্য যাকাতযোগ্য উৎস থেকে যাকাত আদায় করলে হয়তো আরো উল্লিখিত বা ততধিক পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসেবে পাওয়া যেতে পারে, যা সঠিকভাবে প্রয়োগ করে এদেশে বিরজমান দারিদ্র্য খুব সহজেই বিমোচন করে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। দেশের অর্থ-সম্পদের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় বলা যায় যে, যদি ইসলামী শরী'আ অনুযায়ী যাকাতের সকল খাত থেকে সঠিকভাবে যাকাত আদায় করা যায় তবে বার্ষিক প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা যাকাত আদায় সম্ভব, যা দিয়ে এদেশের সুবিধাবঞ্চিতদের সামগ্রিক জীবনমানের উন্নয়ন করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

নবম অনুচ্ছেদঃ যাকাত ব্যাংকের প্রচার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

যাকাত ব্যাংক একটি কল্যাণমুখী সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংকের অর্থের সংস্থান যাকাত, দান-সাদকা, ওয়াক্ফসহ শরী'আহ অনুযায়ী অন্যান্য খাতসমূহ থেকে হবে। এই খাতসমূহ থেকে অর্থের সংস্থান হওয়ার জন্য এই ব্যাংকের সাথে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রাণের সম্পর্ক হতে হবে।

[৭১৮] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

তবেই এই প্রতিষ্ঠানে মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ দান করবেন। যার মধ্যমে অভাবী, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কল্যাণে এই ব্যাংক কাজ করতে পারবে। এজন্য প্রয়োজন রয়েছে এই ব্যাংকের ব্যাপক প্রচারের। আর সকলের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে যাকাত ব্যাংকের কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় এনে ব্যাপক প্রচার করতে পারলে যাকাতদাতা মুসলিম জনগোষ্ঠী নিঃসংকোচে যাকাত ব্যাংকে তাদের যাকাত প্রদান করতে কুণ্ঠিত হবে না। এছাড়াও যারা যাকাত ব্যাংক থেকে সেবা গ্রহণ করতে চায় তারাও এর কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন হবে।

যাকাত ব্যাংকের প্রচারে করণীয়ঃ যাকাত ব্যাংকের প্রচারের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা ব্যাপক প্রচার প্রচারণা করতে হবে। যেমন,

আলিমদের মাধ্যমে : আলিমগণ যাকাতের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও সমাজে এর প্রভাব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এ ব্যাপারে সচেতন করবেন। সেক্ষেত্রে যাকাত ব্যাংকের কার্যক্রমে তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করবেন এবং যাকাতের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রে কীভাবে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ে সে ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার করবেন।

পত্রিকার মাধ্যমেঃ যাকাত ব্যাংকের প্রচার ও প্রসারে জন্য পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। যাকাত ব্যাংকের কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন খবর, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, বিভিন্ন ক্রোড়পত্র ও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে হবে। যাকাতকে সঠিকভাবে আদায় করে তা যাকাত ব্যাংকের নির্দিষ্ট প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে দরিদ্র, অভাবীদের মাঝে প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন করার যে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে তা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে।

অনলাইনের মাধ্যমেঃ বর্তমান সময়ে সমগ্র দুনিয়াতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ অনলাইন ভিত্তিক অন্যান্য যোগাযোগ ও প্রচারব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে এবং মানুষের মাঝে এর প্রভাব সবথেকে বেশি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে যাকাত ব্যাংকের পরিচিতি এর কার্যক্রম প্রচার করতে হবে। যাকাত ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের উপর খুবই স্বল্প দৈর্ঘ্যের হৃদয়গ্রাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করে প্রচার করতে হবে, যাতে মুসলিম জনগোষ্ঠী যাকাত ব্যাংকের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে।

টেলিভিশনের মাধ্যমেঃ টেলিভিশনের মাধ্যমে যাকাত ব্যাংকের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করতে হবে। এর মাধ্যমে যাকাত ব্যাংকের বিভিন্ন দিক উপস্থাপনের করে এর কার্যক্রমের উপর সচিত্র প্রতিবেদন, আলোচনা অনুষ্ঠান ও যাকাতভিত্তিক অনুষ্ঠানসহ ব্যাংকের বড় বড় প্রোগ্রাম সকল টেলিভিশনে একযোগে সরাসরি সম্প্রচার করতে হবে।

মসজিদভিত্তিক প্রচারঃ যাকাত ইসলামের তৃতীয় মৌলিক রুকন হওয়ায় এর প্রচারের জন্য সবথেকে উত্তম স্থান হলো আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদ। বাংলাদেশের প্রতিটি মসজিদের ইমাম ও খতীবগণ তাদের প্রতিটি আলোচনা, দারস্ ও খুতবায় যাকাতের আলোচনা করবেন। বিশেষত গ্রাম বা মফস্বলের মাসজিদের ইমাম ও খতীবগণ অর্থ-সম্পদের যাকাত ছাড়াও, ফসলের 'উশর, পশুপাখি ও অন্যান্য যা যাকাতযোগ্য ও যাকাত বহির্ভূত সম্পদ (যেমন, দান, সদাকা, ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি) রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে যাকাত ব্যাংকে তা জমা দিতে উৎসাহিত করবেন। এছাড়াও মসজিদ কমিটিও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করাঃ যাকাত যেহেতু ইসলামের মৌলিক বিষয়ের তৃতীয় রুকন, সেহেতু ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সর্বোপরি ব্যক্তির জীবনে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক। তাই যাকাতকে স্কুল পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর ফলে শিশুরা স্কুলজীবন থেকে যাকাতের বিভিন্ন ধর্মীয় ও ব্যবহারিক দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে ব্যাপকভাবে জানতে পারবে।

সামাজিক আন্দোলন করাঃ যাকাত ব্যাংকের প্রচারের জন্য যাকাত কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। যাতে মুসলিম জনগোষ্ঠী যাকাতের ব্যাপারে সচেতন হয়। অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে যেমন মুসলিম জনগোষ্ঠী সাধারণত আগ্রহ ও তৎপর থাকে, যাকাতের ক্ষেত্রে তেমন থাকে না। এজন্য যাকাত ব্যাংকের উদ্যোগে যাকাত প্রদানের বিষয়টিকে সামাজিক আন্দোলনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ওয়েবসাইটঃ যাকাত ব্যাংকের উন্নতমানে একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকেব, যার মাধ্যমে যাকাতের কার্যক্রমগুলো রিপোর্ট আকারে নিয়মিত আপডেট করা হবে। যেখানে কোনো ব্যতিক্রম না থাকলে যাকাত দাতা ও গ্রহীতার তালিকা দেয়া

থাকবে। যাকাত গ্রহীতা কোন কোন প্রকল্পে যাকাত প্রাপ্য হলো তাসহ ওয়েবসাইটে রিপোর্ট আকারে দেয়া থাকবে। এছাড়াও যাকাত ব্যাংক থেকে সুবিধাভোগীদের বর্তমান আর্থিক অবস্থার বিবরণও দেয়া থাকবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: যাকাত ব্যাংক যেহেতু একটি জনকল্যাণমুখী সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সেহেতু এর স্বচ্ছতা ও এর জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা রক্ষা করতে হবে এবং তা জনগণের মাঝে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করতে হবে, যাতে জনগণ (যাকাত দাতা ও গ্রহীতা উভয়) এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারে। নিম্নে এই প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

শরী'আহ কাউন্সিল গঠন: যাকাত ব্যাংক সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন। এজন্য যাকাত ব্যাংকের কার্যক্রম শরী'আহভিত্তিক করার জন্য ও সে আলোকে তদারকি করার জন্য শরী'আহ কাউন্সিল গঠন করা আবশ্যক। যে কাউন্সিলটি ব্যাংকের সর্বোচ্চ জাবাবদিহিতার স্থান হবে। শরী'আহ কাউন্সিলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ হবে। যেমন, সেন্ট্রাল শরী'আহ, বিভাগভিত্তিক শরী'আহ এবং জেলাভিত্তিক শরী'আহ কাউন্সিল। বিভাগ ও জেলা শরী'আহ কাউন্সিল মাঠপর্যায়ে সরাসরি কাজের মূল্যায়ন করবে এবং তাদের সকল কাজের রিপোর্ট সেন্ট্রাল শরী'আহতে পেশ করবে।

তত্ত্বাবধান সেল: যাকাত ব্যাংকের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিচালনার সুবিধার্থে প্রতিটি ইউনিয়নকে একটি ইউনিট এবং পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডকে একটি ইউনিট করা হবে। এখানে প্রতিটি ইউনিটে অবৈতনিকভাবে একজন করে জনপ্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, উপজেলা অথবা জেলা পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধি, শরী'আহ কাউন্সিল প্রতিনিধি এবং যাকাত দাতা ও যাকাত গ্রহীতাদের মধ্য থেকে পৃথকভাবে কমপক্ষে ৩ জন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। যারা যাকাত ব্যাংকের স্থানীয় কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সহযোগিতা করবেন তারা কার্যক্রমে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতার জন্য ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ ও সেন্ট্রাল শরী'আহকে রিপোর্ট করতে পারবেন। আর যাকাত ব্যাংক তাদের প্রকল্প কার্যক্রমে এই কমিটির রিপোর্টকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিবেন, যাতে ব্যাংকের কার্যক্রম প্রান্তিক পর্যায়ে স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয়।

যাকাত দাতাদের মূল্যায়ণঃ সাধারণত যাকাত ব্যাংকের যাকাত দাতাগণ তাদের নিজ নিজ এলাকাতে অবস্থিত যাকাত ব্যাংকের শাখায় যাকাতের অর্থ-সম্পদ জমা দিবেন। যে অর্থ-সম্পদ সংশ্লিষ্ট এলাকার যাকাত ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে গ্রহণ করবেন, যাতে করে যে এলাকার যাকাত সে এলাকাতে প্রদান করা যায়। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতি গতিশীল থাকবে। যাকাতের অর্থ-সম্পদ যাকাত ব্যাংকে জমা দেয়ার সময় যাকাত দাতাগণ সুপারিশসহ তাদের পছন্দমতো যাকাত গ্রহীতার নাম যাকাত ব্যাংকে জমা দিতে পারবেন, যা কোনো ব্যতিক্রম না থাকলে যাকাত ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। ফলে পরবর্তীতে যাকাত দাতারা তাদের সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের যাকাত প্রাপ্তির বিষয় যাচাই করে নিতে পারবেন। আর এই পদ্ধতি অনুসরণ করে যাকাত দাতারা নিশ্চিত হতে পারবেন যে, প্রকৃতঅর্থে যাকাতের হকদাদের নিকট যাকাত পৌঁছাচ্ছে কি না, এর মাধ্যমে একজন যাকাত গ্রহীতা যাকাত ব্যাংকের মূল্যায়ন করতে পারবেন। যাকাতদাতারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করে যাকাত ব্যাংকের মাধ্যমে যাকাত প্রদান করলে যাকাতদাতার সুপারিশকৃত গ্রহীতারা আরো বেশি সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

সফ্টওয়্যারের ব্যবহারঃ যাকাত ব্যাংকের সকল কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার জন্য উন্নতমানের একটি সফ্টওয়্যার ব্যবহার করতে হবে। এখানে যাকাত দাতা ও গ্রহীতার সকল তথ্য সংরক্ষণ থাকবে। এর ফলে যাকাত দাতারা কোনো আস্থাহীনতার মধ্যে থাকবে না বরং তারা যেকোনো তথ্য যেকোনো সময়ে নিতে পারবেন। ফলে যাকাত ব্যাংকের বিশ্বাসযোগ্যতা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীতে "সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যদিও কোনো বিষয়ে গবেষণার কাজ প্রকৃত অর্থে শেষ হয় না, বরং সময়ের ধারাবাহিকতায় তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে এবং বৃহত্তর গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এছাড়া উক্ত বিষয়ে আরো বেশি উন্নত গবেষণার জন্য গবেষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। সেজন্য এ গবেষণাকর্মের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আরো বেশি বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা সময়ের ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নিবে। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে বিষয় সংশ্লিষ্ট মৌলিক গ্রন্থাবলি, বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, পরিসংখ্যান ও দলীল-দস্তাবেজ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দেশি-বিদেশি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন রিপোর্ট ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন উৎস থেকে গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাকৃত বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠতা ও বাস্তব অবস্থা যাচায়ের জন্য মাঠপর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অনেক এলাকাতে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ও কর্মসূচি পর্যালোচনা এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন রিপোর্ট ও সুপারিশমালা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিতদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রচলিত সুদভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণব্যবস্থাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেই সাথে ইসলামী অর্থব্যবস্থা ও সামাজব্যবস্থার বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ ব্যবস্থাসমূহের ভূমিকা পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইসলামহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থা কার্যকর থাকার ফলে মানুষের মাঝে বৈষম্য বেড়েই চলেছে। যে কারণে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমানের কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচেছ না বরং দারিদ্র্য বিমোচনের নামে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো মহাজনী সুদভিত্তিক ব্যবসা প্রথাকে নতুন করে আইনি কাঠমোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছে। যে কারণে ক্ষুদ্রঋণের জালে আটকে পড়া সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যের বেষ্টনি থেকে বের হওয়ার পরিবর্তে বেশি করে দারিদ্র্যের মধ্যে নিপতিত হচেছ। আর এভাবে নিয়ন্ত্রণহীন পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থা সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এক শ্রেণির সুবিধাভোগী, ক্ষমতাধর ও স্বার্থান্বেষীরা দিন দিন অর্থবিত্তের পাহাড় গড়ে তুলছে। অপরদিকে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী দিন দিন দারিদ্র্যের প্রান্তসীমায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। অথচ সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাত

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পরিত্রাণ হওয়া প্রয়োজন। কারণ দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ ব্যতীত কোনোভাবেই সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক। কেননা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া ছাড়া সামাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এজন্য একটি কল্যাণময় রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, যার উপর ভিত্তি করে ভারসাম্যপূর্ণ কল্যাণময় সমাজকাঠামো তৈরি করা যায়। যেখানে ধনী-দরিদ্রের মাঝে কোনো বৈষম্য ও শ্রেণি বিভাজন থাকবে না। থাকবে না ধনী ও দরিদ্রের মাঝে কোনো দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হিংসা কিংবা বিদ্বেষ। যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে বঞ্চিত মানুষের অধিকার এবং ধনী-দরিদ্র একসাথে হাতে হাত রেখে কাজ করবে সমাজ ও দেশ বিনির্মাণে, কিন্তু বর্তমানে যে সমাজব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে সেখানে ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে সমাজে মানুষের মাঝে বিভাজন ও বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে সুবিধাবঞ্চিতরা অবহেলিত ও বঞ্চিত থেকেই যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় আদর্শ অর্থব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যাকাত, ফিতরা, সাদাকাহসহ বিভিন্ন বিধান রেখেছেন, আবার সমাজব্যবস্থায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য কল্যাণময় সকল সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার প্রদান করেছেন, যা পরিপালন করা বা না করার উপর পরকালে শান্তি বা শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে ইসলাম দুনিয়া ও পরকালের জীবনকে অঙ্গাঙ্গিভাবে একই সূত্রে গেঁথেছে। এজন্য কোনোভাবেই দুনিয়ার জীবনকে একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া যাবে না বরং দুনিয়ার সকল কার্যক্রমের লক্ষ্য হবে আখিরাত। কারণ দুনিয়াতে আল্লাহ্র দেয়া বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিশীলিত জীবনযাপনকারী ব্যক্তিরাই আখিরাতে বেশি পুরস্কৃত হবে। আল্লাহ্র বিধি-বিধান পরিপালনের মাধ্যমে যেমন একদিকে আল্লাহ্র সাথে তাঁর বান্দার গভীর সম্পর্ক তৈরি হয় ঠিক তেমনি অন্যদিকে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক আরো বেশি গভীর ও সুদৃঢ় হয়। আর এর ফলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি হয়ে সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়। এজন্য সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত ব্যবস্থাপনাসমূহ সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের নিয়ে বাণিজ্য না করে প্রকৃত অর্থে তাদের কল্যাণে কাজ করার আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে আরো বেশি তদারকি ও মূল্যায়ন পদ্ধতি কঠোর করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিকে আরো বেশি বাস্তবমুখী করতে হবে। সরকারকে সুবিধাভোগীর সংখ্যার দিকে নজর না দিয়ে মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে এবং সর্বোপরি, সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকাঠামোর সকল ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যে সুপারিশমালা প্রদান করছে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আলোচনা, পর্যালোচনা করে ও সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করে যাকাত ব্যাংকের প্রস্তাব করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য ব্যক্তিভেদে ও সমষ্টিভেদে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত ব্যাংকের সাধারণ কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে সবথেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষাবৃত্তির আওতায় সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে বৃত্তির ব্যবস্থা করে কম শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিতদের জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রদান করার সাথে সাথে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করার কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে তাদেরকে দেশে ও বিদেশে ভালো কর্মস্থানে নিয়োজিত করা যায়। সামাজিক সহায়তা প্রকল্পের আওতায় সমাজের অসহায় মানুষের প্রয়োজনে বিবাহ সহায়তা, ঋণ পরিশোধ, শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদান ও নৈতিকতা প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য খুবই যুগোপযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। পুনর্বাসন প্রকাল্পের আওতায় সমাজের অসহায় এতিম, বয়স্ক মানুষ, বিধবা, প্রতিবন্ধী, নও-মুসলিমদের পুনর্বাসন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষে জন্য বিশেষ সহায়তা কার্যক্রম এবং ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খুবই সুপরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিতদের সচ্ছলতার জন্য যাকাত ব্যাংকের জীবনমান উন্নয়ন (স্বাবলম্বী) প্রকল্পের আওতায় ব্রোঞ্জ, সিলভার, গোল্ডেন ও ডায়মন্ড প্রকল্পে ভাগ করে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, যেসব প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করলে দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এসব প্রকল্পের সুবিধাভোগী হয়ে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করতে পারবে। তারা দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাত থেকে মুক্ত হয়ে সচ্ছল হয়ে উঠবে এবং তাদের জীবনমানের প্রভূত উন্নয়ন ঘটবে। এর ফলে তারা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে। আর এভাবেই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। যদিও এদেশের সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অস্বচ্ছতার কারণে যাকাত ব্যাংকের মতো জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করা খুবই দুরূহ, তথাপি এই প্রতিষ্ঠান গঠন করে যদি এর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায় এবং একে রাজনৈতিক দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত রাখা যায়, তবেই এটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রকে সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশ দুর্নীতির গভীর খাদে নিমজ্জিত হওয়ায় দুর্নীতির সকল ছিদ্রগুলোকে বন্ধ করতে হবে। দেশের সুবিধাবঞ্চিত বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে এবং যোগ্যতা ও দক্ষতাভিত্তিক ছোট ছোট উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। এতে বেকারত্ব ঘুচবে এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতি খুব দ্রুত উর্দ্ধমুখী হবে। সর্বোপরি যাকাত ব্যাংককে গতিশীল রাখতে ও শক্তিশালী করতে অপরিকল্পিত ও অপরিণত যাকাতব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে। যাকাত বোর্ড ও বোর্ডের সকল সম্পদকে যাকাত ব্যাংকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেজন্য রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে যাকাত ব্যাংকের মাধ্যমে এদেশের সকল যাকাত বাধ্যতামূলভাবে আদায় করতে হবে এবং সেটি সফলভাবে করার জন্য অত্র অভিসন্দর্ভে যেসব সুস্পষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে সামগ্রিকভাবে দেশের সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা এ অভিসন্দর্ভে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে সংশ্লিষ্ট সকলকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি প্রণয়ন করে কার্যক্রম গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

কুর'আনুল কারীম

১. হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, *কোরআন শরীফ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ,* আল কোরআন একাডেমী পাবলিকেশন্স, ৩২তম প্রকাশ, ঢাকা-২০১৫

২. বাদশাহ্ ফাহ্দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স প্রকাশিক, *কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর)*

হাদীস গ্রন্থ

৩. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, দারু তুওকীন নাজাত, বৈরুত-১৪২২ হি.

৪. ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, দার ইবন কাছীর, বৈরুত-১৯৮৭

৫. ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, মাকতাবা ইসলামিয়া, ঢাকা, তা.বি.

৬. ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৩

৭. ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০১২

৮. আবূ আল হুসাইন বিন আল হাজ্জাজ মুসলিম, *আস্ সহীহ*, দারু ইহয়াউত তুরাস আল 'আরাবী, বৈরুত-১৪২২ হি.

৯. ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, মাকতাবাতুর রুশদি, রিয়াদ-২০০১

১০. ইমাম মুসলিম, *আস্ সহীহ*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-২০০০

১১. আবূ দাউদ সুলাইমান ইব্ন আমর আল আযদী, *আস্ সুনান*, আল মাকতাবাতু আসরিয়্যাহ, বৈরুত- তা.বি.

১২. আবূ দাউদ, *আস্ সুনান*, দারুল ফিকরি লিততাবাঈ ওয়াল ইসর ওয়াত তাওঈ', বৈরুত, তা.বি

১৩. আবূ দাউদ, *আস্ সুনান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৬

১৪. আহমাদ বিন শু'আইব আন নাসাঈ, *আস্ সুনান আল কুবরা*, দার আল কুতুব আল'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-১৯৯১

১৫. মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ, *আস্ সুনান*, দার আল ফিক্র, বৈরুত-১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

১৬. ইবনে মাজাহ্, *আস্ সুনান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০২

১৭. ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ আত্-তিরমিযী, *সহীহ আত্-তিরমিযী*, দারুল ফিক্র লিততাবা' ওয়াননশ্র, তা.বি.

১৮. ইমাম তিরমিযী, *সহীহ আত্-তিরমিযী*, হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ঢাকা-২০১০ ও ২০১১

১৯. মুহাম্মাদ বিন আহমদ আত্ তামীমী ইবনু হিব্বান, *আস্ সহীহ*, বাবু যিকবুল আন বায়ান বিআন্না আসদাকাতা, মুআস্সাসাহ আর রিসালাহ, বৈরুত-১৯৯৩

২০. আবূ বকর আহমাদ বিন আল হুসাইন আল বায়হাকী, *আস সুনান আল কুবরা*, মাকতাবাতু দার আলবায, মক্কা আল মুকাররামা-১৯৯৪

২১. আল বায়হাকী, *আস সুনান আল কুবরা*, মাকতাবতু দারিল মা'আরিফ আন নিযামিয়্যাহ..., হায়দ্রাবাদ- ১৩৪৪ হি.

আরবি গ্রন্থ

২২. আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল জাযায়রী, *আল ফিক্হ 'আলা আল মাযাহিব আল আরবা'আহ*, দার আর রাইয়্যান, বৈরুত-১৯৯১

২৩. আবূ 'আব্দুল্লাহ আল হাকিম আন নিশাপুরী, *আল মুসতাদরাক আস সাহীহাইন*, বাব ফা আম্মা হাদীসু আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমাইর, দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-১৪১১ হি.

২৪. আব্দুর রাহমান আলজাযায়রী, *আলফিকহু, 'আলা আল মাযাহিব আল আরবা'আহ*, তা.বি.

২৫. আবূ নায়ীম আহমদ ইব্ন আব্দুল্লাহ, *মা'রিফাতুস সাহাবাহ*, দারুল ওয়াতানি লিন নাশর, রিয়াদ-১৯৯৮

২৬. আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল জুরযানী, *কিতাবুত তা'রীফাত*, দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, বৈরুত-১৯৮৩

২৭. আহমাদ বিন ইবরাহীম আল মুসাল্লী, *ফাতহ আলকাদীর*, দার আররাশাদ, বৈরুত-১৯৯০

২৮. ড. আহমদ মুখতার, *মু'জামু লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ আল মা'আছিরাহ*, 'আলিমুল কুতুব, বৈরুত-২০০৮

২৯. আলী ইব্ন আবূ বাকর আল ফারগানী আল মারগীনানী আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন, *আলহিদায়াহ ফী শারহ বিদায়াহ আল মুবতাদী*, দার ইহইয়া আত তুরাছ আল 'আরাবী, বৈরুত-১৯৯১

৩০. আবূ মানসুর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ, *তাহযীবুল লুগাহ*, দারু ইহয়াউত তুরাছ আল আরাবী, বৈরুত-২০০১

Dhaka University Institutional Repository

৩১. ড. ইব্রাহীম আনীস ও অন্যান্য, *আল মু'জাম আল ওয়াসীত*, মুজাম্মা' আল লুগাহ আল 'আরাবিয়্যাহ, বৈরুত-১৯৭২

৩২. ড. ওয়াহ্বাহ আযযুহায়লী, *আল ফিকহ আল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*, দার আল ফিক্‌র, দামেশক-১৯৮৪

৩৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুকাররাম আল মিসরী ইবনে মানযূর, *লিসান আল 'আরাব*, দার ছাদির, বৈরুত-১৯৯৬

৩৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ, *আল ইসলামু উসূলুহু ওয়া মাবাদি'উহু*, ওযারাতিশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাতি ওয়াল আওক্বাফি ওয়াদ দা'ওয়াতি ওয়াল ইরশাদ, সৌদী 'আরব-১৪২১ হি.

৩৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আল খামীস, *উসূলুদ দীন 'ইনদা আবূ হানীফা*, দারুস সামা'ঈ, সৌদী আরব-তা.বি.

৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াকুব আল ফায়রূয আবাদী, *আলকামূস আলমুহীত*, দার আলফিক্‌র, বৈরুত-১৯৮৯

৩৭. মুহাম্মাদ ইবন মুকাররাম আল মিসরী ইবন মানযূর, *লিসান আল 'আরব*, দার সাদির, বৈরুত-১৯৯৬

৩৮. লুয়াইস মা'লূফ, *আল মুনজিদ ফী আল লুগাহ ওয়াল আ'লাম*, দার আল মাশ্‌রিক, বৈরুত-১৯৯২

৩৯. শামসুদ্দীন আবূ বাকার আসসারুখসী, *আল মাবসূত*, দার আলফিকর, বৈরুত, ২০০০

৪০. আস সাইয়্যিদ আস সাবিক, *ফিকহ আস সুন্নাহ*, দার আর রাইয়্যান লিত তুরাছ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কায়রো-১৯৯০

বাংলা গ্রন্থ

৪১. ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া, *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবকল্যাণে যাকাত সিজেডএম-এর ব্যবস্থাপনা কৌশল*, সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম), তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০১৮

৪২. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত গুরুত্ব ও প্রয়োগ*, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ঝিনাইদহ-২০০৯

৪৩. ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০০৯

৪৪. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, খায়রুন প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ঢাকা-২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, খায়রুন প্রকাশনী, সপ্তম প্রকাশ, ঢাকা-২০০৫

৪৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, খায়রুন প্রকাশনী, (১৫ প্রকাশ) ঢাকা-২০১২

৪৭. আবুল আসাদ, *একশ' বছরের রাজনীতি*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ৭ম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা-২০১৯

৪৮. ড. মুঃ আঃ হামিদ, *পল্লী উন্নয়ন বাংলাদেশ*, মুহাম্মাদ ব্রাদার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১৯৮৮

৪৯. আবদুল মান্নান তালিব. *বাংলাদেশে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০০২

৫০. মুহাম্মাদ আবূ তালিব, *বাংলা সনের জন্মকথা*, বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা-১৯৯৩

৫১. মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, *পলাসী থেকে বাংলাদেশ*, সিঁড়ি প্রকাশন, ঢাকা-২০১১

৫২. মোঃ আবদুল কাইউম ঠাকুর, *পলাশি থেকে বাংলাদেশ*, সিঁড়ি প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা-২০১২

৫৩. আনু মুহাম্মাদ, *বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ সম্রাজ্যবাদ ও ভারত প্রশ্ন*, নবরাগ প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৪

৫৪. আনু মাহ্মুদ, *বাংলাদেশে এনজিও*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা-২০১১

৫৫. আনু মাহ্মুদ, *এনজিও দরিদ্রতা : উন্নয়ন*, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা-২০১১

৫৬. আনু মুহাম্মাদ, *বাংলাদেশ এনজিও : দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়ন*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৯৮

৫৭. ড. মুহাম্মাদ আলী আল হাশেমী, *আদর্শ মুসলিম*, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ঢাকা-২০০৯

৫৮. আতিকুর রহমান, *বাংলাদেশে এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, অনার্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা-২০০৫

৫৯. আসাদ বিন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা-২০০১

৬০. আসাদুজ্জামান আসাদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৪

৬১. মুহাম্মাদ ইউনূস, *গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন*, মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ, ঢাকা-২০০৪

৬২. মুহাম্মাদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা-২০০৯

৬৩. মুফতি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, দারুল কিতাব, ঢাকা-২০০০

Dhaka University Institutional Repository

৬৪. ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী, *ইসলামে হালাল হারামের বিধান*, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৮

৬৫. ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৮

৬৬. ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী, *ইসলামে যাকাত বিধান*, ১ম খণ্ড, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৭

৬৭. ড. ইউসুফ আল-কারাদাভী, *ইসলামে যাকাত বিধান*, ২য় খণ্ড, খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৮

৬৮. মুফতি মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, *কুর'আন সংকলনের ইতিহাস*, দারুল কিতাব, ঢাকা-২০০০

৬৯. মোঃ কামরুল হোদা, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উৎস অনুসন্ধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০১২

৭০. সাইয়েদ কুতুব, *ইসলামের স্বর্ণ যুগে সামাজিক ন্যায়-নীতি*, স্মৃতি প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, ঢাকা-২০০৫

৭১. অধ্যাপক কে. আলী, *বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস*, আলী পাবলিকেশন্স, (পুনর্মুদ্রণ), ঢাকা-১৯৯৬

৭২. এস. এম. খাবীরুজ্জামান, *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান*, পালক পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৮

৭৩. গোলাম মোর্তোজা, *ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা-২০০৬

৭৪. গোলাপ হালদার, *বাঙালি সংস্কৃতির রূপ*, মুক্তধারা ২১৯১, ঢাকা-২০১১

৭৫. মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার (সম্পাদক), *আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট, ঢাকা-২০০১

৭৬. আল্লামা তাকী উসমানী, *ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা*, আল-কাউসার প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৩

৭৭. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *স্বেচ্ছাসেবিতা ও বাংলাদেশের এনজিও*, তাসমিয়া পাবলিকেশন্স (পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ), ঢাকা-২০১৮

৭৮. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামী অর্থনীতি*, জমজম প্রকাশনী, ঢাকা-২০১২

৭৯. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *মাইক্রো ফাইন্যান্স ও ইসলাম*, জমজম প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৩

৮০. মুহাম্মাদ নূরুল আমিন, *গ্রামীণ ব্যাংক : একটি পর্যালোচনা*, সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৭, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা-২০০৭

৮১. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

৮২. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের পক্ষে, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৮০

৮৩. ফারুক চৌধুরী, সুবলকুমার বণিক, সাজেদুর রহমান, *ব্র্যাক উন্নয়নের একটি উপাখ্যান*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা-২০০৯

৮৪. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তুর্য প্রকাশনী, ঢাকা-২০১৩

৮৫. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, *বাংলাদেশে এনজিও'র গঠন পরিচালক ও বিকাশ*, সেবা প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৬

৮৬. মাহমুদ নূরুল হুদা, *হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কাছ থেকে দেখা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৩

৮৭. ড. মাহমুদ আহমাদ, *অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, তা.বি.

৮৮. অধ্যাপক ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস (মুঘল যুগ: ১৫২৬-১৮৫৭)*, আধুনা প্রকাশ, ঢাকা-২০০৬

৮৯. ড. মুস্তফা সুবায়ী, *ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন* [ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির সোনালী অধ্যায়], বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০০৪

৯০. মুনতাসীর মামুন, মো: মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা-২০১৭

৯১. মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নো'মানী (রহ.), *ইসলাম কি ও কেন*, মাকতাবাতুল আশরাফ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা-২০০৮

৯২. মোয়াজ্জেম হোসাইন চৌধুরী, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, আঞ্চলিক ও মানবিক ভূগোল*, ঢাকা-১৯৯৪

৯৩. ড. মুহাম্মাদ রফীকুর রহমান মাদানী, *ইসলামী আকীদাহ তাওহীদ শির্‌ক বিদ'আত*, সবুজপত্র পাবলিকেশন, ঢাকা-২০১৮

৯৪. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ সেবা কার্যক্রম*, রোহেল পাবলিকেশনস্, চতুর্থ প্রকাশ, ঢাকা-২০০৮

৯৫. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ*, রোহেল পাবলিকেশনস্, ঢাকা-২০০৪

৯৬. ড. সৈয়দ শাহ এমরান, *ইসলামী পরিভাষা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

৯৭. ডঃ মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *'উলূমু'ল-কুর'আন*, প্রথম খণ্ড, আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া (তৃতীয় মুদ্রণ), ঢাকা-২০০৮

৯৮. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি শরী'আহ্র নীতিমালা*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা-২০১১

৯৯. শিরীন হাসান ওসমানী, *বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ*, রূপান্তর: আখ্তার-উল্-আলম, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০৪

১০০. জেড. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী প্রবন্ধমালা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৮

১০১. শামসুদ্দোহা চৌধুরী, *ঈসা খা'র সোনারগাঁও*, সুবর্ণ গ্রাম প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৫

১০২. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাক্-পলাশি বাংলা*, কে পি বাগচী এ্যণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-১৯৮২

১০৩. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, অধ্যাপিকা বেগম ফিরোজা ফাউন্ডেশন, ঢাকা-২০১৪

১০৪. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ৩য় খণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩

১০৫. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, দ্বিতীয় খণ্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩

১০৬. মেজর জেনারেল কে. এম. সফিউল্লাহ্ বীর উত্তম, *মুক্তযুদ্ধে বাংলাদশে*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৫

১০৭. মুহাম্মাদ সালাউদ্দীন, *ইসলামে মানবাধিকার*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-২০০৫

১০৮. ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ্, *দি ইমারজেন্স অব ইসলাম*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা-২০১২

১০৯. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা-২০০০

গবেষণা পত্রিকা

১১০. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সেমিনার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

১১১. ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, *ভিক্ষাবৃত্তি ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫

সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ

১১২. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইটি), *ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা-২০০৩

১১৩. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশনা বিভাগ, ঢাকা-২০০০

১১৪. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশনা বিভাগ, সপ্তম সংস্করণ, ঢাকা-২০০৮

১১৫. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা- ১৯৮৮

১১৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩

১১৭. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩

১১৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৬

১১৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-২০০৫

১২০. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২৫তম খণ্ড, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩

১২১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৬

১২২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী শরীয়ত ও বিচারব্যবস্থা বৈশিষ্ট্য*, বাংলাদেশ ইসলামিক ল'রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা-২০১২

ইংরেজি গ্রন্থ

১২৩. Md. Abdul Hamid Miah, *Islamic Microfinance*, Principal Publishers Ltd. Dhaka-2018

Dhaka University Institutional Repository

১২৪. Afzalur Rahman, *Islam Ideology and the Way of Life*, Publishid in Malaysia by, A.S. Noordeen, Kuala Lumpur

১২৫. Amartya Sen, *Poverty and Famines,* Oxford University Press, 17th impression, New-York-2011

১২৬. Dr. David Gordon, *Indicators of Poverty & Hunger,* United Nations Head Quarters, New York-2005

১২৭. Hasnat Abdul Hye, *Below the line: Rural Poverty in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka-1996

১২৮. Hammudah Abdalati, *Islam in Focus*, Islamic Teaching Center, N.b.

১২৯. Hossain Zillur Rahman, *Poverty Graduation Through Zakat-Based Programs, Center for Zakat Management (CZM)*, Dhaka -2018

১৩০. Edited by Kenneth W. Morgan, *Islam the Straight Path*, Motilal Banarsidass, Delhi-1958

১৩১. Qazi Kholiquzzaman Ahmad, *Empowerment is key to Poverty Eradication and Human Dignity (A New Holictc PKSF Approach: ENRICH)*, Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), Dhaka-2015

১৩২. Maulana Muhammad ‘Ali, *The Religion of Islam A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles and Practices of Islam*, The Ahmadiyya Anjuman Isha‘at Islam, Lahore-1973

১৩৩. M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice,* The Islamic Academy, Cambridge-1986

১৩৪. Mohammad Rafi-ud-Din, *The Manifesto of Islam*, Islamic Book Service, 1st Edition, New Dellhi-1993

১৩৫. Muhamad Younus, *Grameen Bank at a Glance,* Grameen Bank Book, Dhaka-2004

১৩৬. Sayed Sajjad Husain, *Civilization and Society*, Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT) (2nd Print), Dhaka-2002

Dhaka University Institutional Repository

১৩৭. M. Zohurul Islam FCA, *Al-Zakah, A Hand Book of Zakah Administration*, Bangladesh Institution of Islamic Thought, Dhaka-1999

অভিধান

১৩৮. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও সহযোগীবৃন্দ, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, দশম পুনর্মুদ্রণ-২০০৯

১৩৯. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৭

১৪০. A.T. Dev, *Students Favorite Dictionary*, New Modern Art Press, Dhaka, New Addition- 2000

১৪১. জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-২০১৬

বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রণালয় ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশনা

১৪২. আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, ঢাকা-২০১১

১৪৩. অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৯*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০০০

১৪৪. অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ অর্থমন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৫

১৪৫. অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৬

১৪৬. অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৮

১৪৭. অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

১৪৮. অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০২০

১৪৯. অর্থ মন্ত্রণালয়, *অগ্রযাত্রার দশ বছর ২০০৯-২০১৮*, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১৮

১৫০. কৃষি মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯*, ঢাকা-২০১৯

১৫১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়: পাঁচ বছরের সাফল্য চিত্র (২০০৯-২০১৩)*, ঢাকা-২০১৪

১৫২. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, ঢাকা-২০১৮

১৫৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯*, ঢাকা-২০১৯

১৫৪. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬*, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, তা.বি.

১৫৫. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, *এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর ২০ বছর*, প্রকাশনা বিভাগ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা-২০১১

১৫৬. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-২০১৭*, ঢাকা-২০১৮

১৫৭. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬*, তা.বি.

১৫৮. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *ব্রুসিয়ার*, জুলাই-২০০১

১৫৯. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা-২০১০

১৬০. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর দু'দশক*, ঢাকা-২০১০

১৬১. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *সমৃদ্ধি*, ঢাকা-২০১০

১৬২. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *একুশ পূর্তিতে পিকেএসএফ*, ঢাকা-২০১১

১৬৩. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *সমৃদ্ধির পথে ২য় বছর, ঢাকা-২০১১*

১৬৪. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ*, ঢাকা-২০১১

Dhaka University Institutional Repository

১৬৫. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), *দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) একটি মানবকেন্দ্রিক কর্মসূচি, প্রথম সংস্করণ*, ঢাকা-২০১৭

১৬৬. Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), *ENRICH A Holistic Approach to Household-focused Poverty Eradication*, A new initiative of PKSF, Dhaka-2014

১৬৭. Bangladesh Bureau of Statistics(BBS), *Statistical Pocketbook of Bangladesh 2013*, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka-2014

১৬৮. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Preliminary Report On Census of Slum Areas and Flouting Population 2014*, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka-2015

১৬৯. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Census of Slum Areas and Flouting Population 2014*, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka-2015

১৭০. Bangladesh Bureau of Statistics, *Statistical Pocketbook of Bangladesh 2017*, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka,, Dhaka-2018

১৭১. Bangladesh Bureau of Statistics, *Statistical Pocket Book 2018*, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

১৭২. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Final Report on Household Income and Expenditure Survey 2016*, Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka-2019

Dhaka University Institutional Repository

১৭৩. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), *Statistical Year Book Bangladesh 2018,* (38th Edition), Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka-2019

১৭৪. Bangladesh Bureau of Statistics, *Monthly Statistical Bulletin-Bangladesh*, August 2019, Dhaka-2019

এনজিও প্রকাশনা

১৭৫. আশা, *আশা ম্যানুয়াল*, দশম সংস্করণ, ঢাকা-২০১৩

১৭৬. ASA, *Annual Report 2016-2017*, Dhaka

১৭৭. আশা, *নিউ ভিশন*, জানুয়ারি-জুন ২০১৮

১৭৮. BRAC AT A GLANCE, November 2008, Public Affairs & Communications

১৭৯. Center for Zakat Management (CZM), *Annual Report 2014*, Dhaka - 2015

১৮০. Center for Zakat Management (CZM), *10 Years of CZM*

১৮১. Center for Zakat Management (CZM), *CZM Brochure*

আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রকাশনা

১৮২. UN statement, June-1998; signed by the Head of all UN Agencies

১৮৩. UNDP, HDI -2007-2008

ব্যাংক প্রকাশনা

১৮৪. আইবিবিএল জনসংগযোগ বিভাগ, *ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন বার্তা*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই সেপ্টেম্বর ২০০৫

১৮৫. Islami Bank, *Rural Development Scheme (RDS)*, Dhaka-2017

Dhaka University Institutional Repository

১৮৬. Islami Bank Bangladesh Limited, *Annual Report 2017*, Dhaka-2018

১৮৭. কর্মসংস্থান ব্যাংক, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-১৭, ঢাকা-২০১৮

১৮৮. কর্মসংস্থান ব্যাংকের সিটিজেন চার্টার (KAF-0077)

১৮৯. বাংলাদেশ ব্যাংক, *২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতমালা ও কর্মসূচি*, কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা-২০১৮

ক্রোড়পত্র

১৯০. ড. আতিউর রহমান, *"সমাজের গভীরে মুক্তি পিয়াসী আলোড়ন-গ্রামীণ ব্যাংকের এক দশক"*, সাপ্তাহিক অর্থনীতি, ২য় বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ঢাকা-১৯৮৭

ওয়েবসাইট

১৯১. www.abd.org

১৯২. www.banglapedia.org

১৯৩. www.bbs.gov.bd

১৯৪. www.banglanews24.com

১৯৫. www.banglatribune.com

১৯৬. www.compassion.com

১৯৭. www.dictionary.cambridge.org

১৯৮. www.jagonews24.com

১৯৯. www.bd-pratidin.com

২০০. www.investopedia.com

২০১. www.ngoab.gov.bd

২০২. www.unicef.org

২০৩. www.un.org

২০৪. www.worldbank.org

২০৫. en.wikipedia.org

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক পত্রিকা

২০৬. দৈনিক আমার দেশ

২০৭. দৈনিক ইনকিলাব

২০৮. দৈনিক কালেরকণ্ঠ

২০৯. দৈনিক জনকণ্ঠ

২১০. দৈনিক প্রথম আলো

২১১. দৈনিক নয়া দিগন্ত

২১২. দৈনিক সংবাদ